মৃগয়া

প্রথম খণ্ড

ভগীরথ মিশ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুধীর মৈত্র

শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত
বহু যুদ্ধের সেনাপতিকে

পীড়ন পর্ব

১.মুমূর্ষুর জবানবন্দী

আমি মর্যে যাচ্ছি। প্রতিদিন তিলতিল মর্যে যাচ্ছি।

এমনটাই ভাবলেন সুদর্শন সিংহবাবু। ভাবলেন, যৌবনকালে মরতে চায়না কেউ। আমিও চাই নাই। তবুও আমার এই আশি বছর বয়সে আমাকে চল্যে যেত্যে হচ্ছে ওপারে।

আশি বছর সুদর্শনের কাছে যৌবনই। চুয়ামসিনার সিংহবাবু-বংশে আশি বছরে বুড়ো হওয়া তো দূরের কথা, কেউ প্রৌঢ়ও হয়নি। সুদর্শনের ঠাকুরদা পরমেশ্বর সিংহবাবু একশ সাত বছর বয়েসে মরেছিলেন। মরার আগের দিন তিনি ছিপে একটা বারো সের রুই খেলিয়ে খেলিয়ে তুলেছিলেন ডাঙায়। মাছ ধরতে ভারি ভালবাসতেন পরমেশ্বর সিংহবাবু। সুদর্শনের বাবা দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবু তাঁর তৃতীয় পক্ষটিকে এনেছিলেন আটান্ন বছর বয়সে। শখ করে নয়। শখ মেটাবার 'মেয়া-ছেইলা' অনেক ছিল তাঁর। কেবল বংশরক্ষার তাগিদে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন তিনি। আর, তাঁর প্রথম সন্তান, শ্রী সুদর্শন সিংহবাবু, পায়ে পায়ে মৃত্যুর দোরগোড়ায় এগোচ্ছেন, মাত্র আশি বছর বয়েসে। অথচ, সুদর্শনের এই সাদা শনের মত চুল, ধবধবে দাড়ি, এসবই, তিনি মনে করেন, তাঁর জোয়ানীরই প্রতীক।

মরতে অবশ্য সুদর্শনের কোনও ভয় নেই। কোন কালেও ছিল না। ওঁর এই বিশাল গড়, লোহার ডজনখানেক সিন্দুক, গোটা বিশেক ধানের গোলা, এবং তৎসহ এই বিশাল তালুক, এসব ছেড়ে যেতেও কোন কষ্ট নেই, কারণ, এসবের প্রতি কস্মিনকালেও কোন মোহ ছিল না সুদর্শনের। এই যে, দোতলার একপ্রান্তের বিশাল ঘরখানাতে সারবন্দী সিন্দুক সাজিয়ে তিনি বসে আছেন, এই যে ওঁর বিছানার গদির তলায় ঘুমোচ্ছে নানারঙের, নানা সাইজের ডজনকয়েক চাবি, এই যে, মুহূর্তের তরেও ওগুলোকে হাতছাড়া করেন না, —এসব নেহাতই কর্তব্যবশে। সম্পত্তি অর্জন এবং রক্ষা করা ওঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তার বেশি কিছু নয়।

তবুও মরবার কথা মনে এলেই, সুদর্শনের বুক ভেঙে যায়। ভাঙে। ভেঙে যায়। তিনি যে একরাশ ধাঁধাঁ নিয়ে মরছেন। বুকভর্তি একরাশ সারবন্দী ধাঁধাঁ। ওরা দিনরাত ওঁকে কামড়ে কামড়ে খায়। ওদের তীক্ষ্ম হুলের খোঁচা ওঁকে জ্ঞানে-অজ্ঞানে অস্থির করে তোলে।

মনে পড়ে, সেই ছেলেবেলায় সুদর্শনের মায়ের ঘরে রাখা আয়নায় নিজের মুখখানাকে দেখতে চেয়েছিল এক চাষার ছেলে। নিশান বাউরি তার নাম। সুদর্শনের মা কঙ্কাবতীকে বিয়ের সময় একটা আয়না দিয়েছিলেন সুদর্শনের দাদামশাই। সারা তল্লাটে অমন আজব চিজ দেখে নি কেউ। বেলজিয়ান কাচের প্রমাণ সাইজের বেশ বাহারি আয়না। এক সিংহগড় ছাড়া এ তল্লাটে এমন আয়না আর দ্বিতীয়টি ছিল না। এমন কি রাধানগরের বাঁড়ুজ্জাদের বাখুলেও নয়।

মায়ের শোবার ঘরের দেয়াল জুড়ে শোভা পেত সেই মহার্ঘ আয়না। সেই ছেলেটা, নিশান বাউরি যার নাম, জীবনে কোনদিন আয়না-আরশি চোখেই দেখেনি, শুধু শুনেছে তার অপার মহিমার কথা সিংহগড়ের দাসী-বাঁদীদের মুখ থেকে। সে সব টুকরো টুকরো রহস্যে ভরা কথা। সম্পূর্ণ নিটোল ছবি ফোটে না তাতে। আসলে নিশান বাউরি তো ছিল সিংহগড়ের রাখাল-বাহিনীর কনিষ্ঠতম সদস্য, তার সঙ্গে দু'একটির বেশি কথা বলতেই চায় না ঐ অন্তঃপুরবাসিনী দাসী-বাঁদীর দল। নিশান বাউরির বয়েস তখন তের কি চোদ্দ। ঐ বয়েসটাই এমন, সব কিছুতেই দুর্বার, দুঃসাহসিক কৌতূহল। একদিন সেই দুঃসাহসী কিশোর সুদর্শনের কাছে ভয়ে ভয়ে নিবেদন করল

মনের বাসনাখানি। ঐ আজব আরশির মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে। দেখতে চায়, ঐ রহস্যময় মায়াবি আরশিতে, নিজের মুখ, সম্ভব হলে সম্পূর্ণ অবয়বখানি।

সুদর্শনের তখন বয়স কত? বড় জোর সতের। কিন্তু ঐ বয়সে বাউরিপুত্রের বেয়োড়া সাধখানা শুনেই রক্তে দাপন শুরু হল। বটে বটে। মায়ের শোবার ঘরে রয়েছে যে বস্তু, তাকে কাছের থেকে দেখতে চায়! নিজের কালো কুচ্ছিৎ শরীরের প্রতিবিম্ব ফেলতে চায় ওই মহার্ঘ বস্তুর গায়ে! এতসাহস! আয়নায় ছায়া দেখাবেন বলে নিশান বাউরিকে একদিন নিয়ে গেলেন হরিণমুড়ি নদীর পাড়ে। নিয়ে গেলেন মানে, যেতে বাধ্য করলেন। নদীর একেবারে কিনারে এক প্রাচীন অর্জুন গাছের তলায় একটা মাঝারি আকারের দ', সেখানে জল একেবারেই স্থির। স্থির, স্থির। জলের একেবারে গা ঘেঁসে নিশান বাউরিকে উবু হয়ে বসালেন সুদর্শন। বললেন, উই ভাল্, আরশি। জল-আরশি। দেইখ্তে পাচ্ছু মুখ? ভাল কইরে দ্যাখ্। বলতে বলতে নিশান বাউরির মুখখানি সজোরে চেপে ধরলেন জলের মধ্যে। নিশান বাউরি হকচকিয়ে, জল খেয়ে, হেঁচকি তুলে, হেঁচে-কেশে একাকার। সুদর্শন করলেন কি, ঠিক ঘোড়ায় চড়বার ভঙ্গিতে চেপে বসলেন নিশান বাউরির পিঠের ওপর। কেশরের মতো ঝাঁকড়া চুলগুলোকে দু'হাতে মুঠো করে ধরলেন। তারপর এক নাগাড়ে ওর মুখখানা চুবোতে লাগলেন জলে। মাঝে মাঝে মুখখানা তোলেন আর প্রশ্ন করেন, দেখত্যে পাচ্ছু জল-আরশিতে নিজের মুখ? দ্যাখ, ভাল কইরে দ্যাখ। নাকে-মুখে জল ঢুকে নিশান বাউরির সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা।

সেদিন আধা ঘন্টা কাল নিশান বাউরিকে হরিণমুড়ির জলে চুবিয়ে প্রায় আধমরা অবস্থায় রেহাই দিয়েছিলেন সুদর্শন।

'কি রে, আয়নায় আর মুখ দেখতে চাইবি?' সুদর্শন বহুদিনই প্রশ্নটা করতেন নিশান বাউরিকে। ওর মুখখানি আতঙ্কে নীল হয়ে যেত নিমেষে। নিজের মুখের প্রতিবিম্ব আর জীবনে দেখতে চায়নি, নিশান বাউরি। না, না। সুদর্শনও চান না। কোনও আয়নার মুখোমুখি হতে। তবুও, এক জাদু আয়নার হাত থেকে ইদানীং তিলমাত্র রেহাই পান না সুদর্শন। দোতলার ঘরখানিতে শুয়ে শুয়ে চারপাশে যেদিকেই তাকান, সার-সার প্রমাণ-সাইজের আরশি। দেয়ালে দেয়ালে পূর্ব পুরুষদের ছবি। ছবির মুখগুলো এক একটি আরশি। কাদম্বরীর আবক্ষ তৈলচিত্র, একটি আরশি। জানলাগুলোও এক একটি আরশি। চোখ ফেললেই ভেসে ওঠে কত কিছুর ছায়া। নিজের মুখ, কাদম্বরীর মুখ, নিশান বাউরি, পরীক্ষিত বাউরি, চন্দ্রকান্ত আচার্য, শঙ্করপ্রসাদ, প্রিয়ব্রত, প্রতাপলাল, হরবল্লভ, আরও কত কত মুখ... যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, করুণায়, প্রতিহিংসায় জীবন্ত মুখগুলি। আজকাল সুদর্শনের চোখের সামনে শুধু সারসার আয়না দোলে। আয়না, আয়না। আয়না যেন এক বিভীষিকা। সুদর্শন বেশিক্ষণ তাকাতে পারেন না ওদের দিকে।

নিশান বাউরিও বুঝি জীবনে আর কোন দিনও আয়নায় মুখ দেখতে চায় নি। আয়নায় মুখ দেখবার প্রাণান্তকর দম আটকানো অনুভূতি সে বুঝি ভুলতে পারে নি আজীবন কাল। কিন্তু সে যে কোনদিন এর শোধ নিতে পারে সুদর্শন স্বপ্নেও ভাবেননি। আজ জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে সুদর্শনের তিলমাত্র সন্দেহ নেই, নিশান বাউরি বড় নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে গেছে পুরো সিংহবাবু বংশের ওপর। কারণ, সে রেখে গেছে পরীক্ষিত বাউরি নামে এক আত্মজকে।

সুদর্শনের দাদু পরমেশ্বর সিংহবাবু তাঁর শেষ জীবনে একটা দেয়ালঘড়ি কিনেছিলেন। আজ তিন পুরুষ সেই ঘড়ি বেজে চলেছে নিয়ম মতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায়—শোকের এবং আনন্দের

দিনে—সে সমান নিরাসক্ত, আবেগহীন, কর্তব্যপরায়ণ। কৃপণ মানুষেরা যেমন একটি একটি করে খুচরো পয়সা শব্দ করে গুনে চলে, ঘড়িটাও তেমনি টিকটিক আওয়াজ তুলে গুনতি করে চলেছে অজস্র খুচরো সময়। সচেতন থাকলে বোঝা যায়, তার প্রতিটি 'টিক' শব্দ নির্মম হাতে ছিনিয়ে নেয় মানুষের জীবনের একটুকরো সময়। সময়, সময়।

সুদর্শনের বুকের মধ্যেও একটা ঘড়ি আছে। সারাক্ষণ টিকটিক করে বাজে ওটা। বাজতে বাজতে ওঁকে জানিয়ে দেয়, সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে, দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে। আরও একটা ঘড়ি অবিরাম বেজে চলেছে কানের কাছে, সেই শৈশব থেকে এই মুহূর্ত অবধি, বিরতিহীন। শ্রবণেন্দ্রিয় ভেদ করে সে ঘড়ির বেজে যাওয়ার শব্দ পৌঁছে যায় আরও কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে, কোন গূঢ় সুগভীর চেতনার দ্বারপ্রান্তে। সুদর্শনকে বিহ্বল, বিবশ করে সেই অতীন্দ্রিয় ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ ক্লান্তিহীন বেজে যায়... বেজে যায়...। হরিণমুড়ির বহতা স্রোত। তার অবিশ্রান্ত কাচের চুড়িভাঙা রুন-ঝুন আওয়াজ। কঠিন শিলার চাতালে ওই ঘড়িটাকেই আজীবনকাল সবচেয়ে বেশি সমীহ করে এসেছেন সুদর্শন। ওই ঘড়ির কাছ থেকেই জীবনে সবচেয়ে অপ্রস্তুত, বেইজ্জত হয়েছেন।

সরযূর আসার সময় হল। সুদর্শন ভাবলেন। এতক্ষণে সে পুজো সেরে বেরিয়েছে ঠাকুরঘর থেকে। প্রসাদী ফুলের থালা নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। হাঁটার ছন্দে, তার দু-হাত বোঝাই ভারি সোনার কঙ্কন-বলয় রিনিঝিনি আওয়াজ তুলেছে। সুদর্শন শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে যেন।

সরযূ এখন হেঁটে চলেছে...ঠাকুর-ঘর, লম্বা-বারান্দা, ভিতর-উঠান, ভিতর-বারান্দা, সিঁড়ি...। তার পায়ে পায়ে খরচ হয়ে যাচ্ছে, সুদর্শনের জীবনের কিছুটা সময়। সরযূ, তার নরম পায়ের ছোঁওয়ায় ওঁর জীবনের খানিকটা সময়কে দলে পিষে এক্ষুনি হাজির হবে। এভাবেই ভাবলেন সুদর্শন। সরযূ আসবে। মাথায় একরাশ সাদা-কালো চুলের ঢল। কপালে ডগোমগো সিঁদুরের টিপ। সারা অঙ্গে একরাশ জ্বলন্ত অলঙ্কার। দু'চোখে সীমাহীন ঔদাসীন্য নিয়ে সে পলকের তরে থমকে দাঁড়াবে দরজার সামনে। তার রুপোলি গরদের আঁচল মাটিতে লুটোবে। সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে তার চাঁপা ফুলের মতো হিম-শীতল আঙুল দিয়ে সুদর্শনের কপাল আলতো করে ছোঁবে। হাতে একখানা প্রসাদী ফুল তুলে নিয়ে ছোঁয়াবে ওঁর মাথায়। তারপর এক টুকরো মতিচুর ভেঙে এগিয়ে দেবে মুখের দিকে। সুদর্শন বাচ্চা ছেলের মতো হাঁ করবেন। ওঁর মুখে মিষ্টির টুকরোখানা ফেলে দিয়ে সরযূ গড় হয়ে প্রণাম করবে সুদর্শনকে। অভ্যাসবশে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে থতমত খাবে পলকের তরে। পরমুহূর্তে হাতখানা সরিয়ে নেবে সুদর্শনের হাঁটুর থেকে। রুপোলি গরদের আঁচল জড়াবে গলায়। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। তখন সুদর্শন বুঝি বা বসে বসে কেবলই ভাবতে থাকবেন একটা কথাই। সরযূ, তুমি কি সত্যিই মানসিক বিকারে ভুগছ? নাকি এটাও তোমার একটা প্রিয় ছলনা? ছলনা, ছলনা।

সংসারের হাজার প্রয়োজন মিটিয়ে লাবণ্যও কোন একসময় আসবে। বাবার আরাম-কেদারার পেছনে দাঁড়িয়ে পুতুলের মতো হাত বোলাবে তাঁর সাদা ধবধবে চুলে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে তার নিষ্পলক চোখদুটি বিঁধে যাবে হরিণমুড়ির ওপারে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের শেষপ্রান্তে রাধানগর গাঁয়ের মাথায় ঝুলতে থাকা দিগন্তের গায়ে। একসময় সেও চলে যাবে।

শঙ্করপ্রসাদ, সুদর্শনের একমাত্র জামাই, কিছুদিন আগে অবধি সেও আসত দিনে অন্তত একবার সময় সুযোগ করে। ওকে দেখলেই নিজের অজান্তে মাথায় রক্ত চড়ে যেত সুদর্শনের। কাছে ডেকে, ওর গালে ঠাস ঠাস চড় কষাতেন। নিঃশব্দে হজম করে ও বেরিয়ে যেত ঘর থেকে।

আজকাল অবশ্য শঙ্করপ্রসাদ আর আগের মতো আসে না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার হয়েছে সে। সুদর্শনের আনুকূল্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আকাশে উড়তে শিখেই সে এখন নিজেকে চিনে ফেলেছে। তার পাখনা শক্তপোক্ত হয়েছে। সে এখন সর্বক্ষণ নিজের খুশি মত উড়ছে। উড়ছে, উড়ছে।

কৃষ্ণদাস, সিংহগড় এস্টেটের পুরোনো গোমস্তা, সে অবশ্যি বেশি রাতের আগে আসবে না। এসেই সামনে মেলে ধরবে লাল বাঁধানো খাতা। হিসেবপত্তর বোঝাবে যত্ন করে। সুদর্শন বিছানার তলা থেকে এক গোছা চাবি বের করে ঝনাৎ করে ফেলে দেবেন ওর সামনে। কুড়িয়ে নিয়ে একখানা সিন্দুক খুলবে কৃষ্ণদাস। টাকা-পয়সা, কিংবা গয়নাগাটি, কিংবা কাগজপত্র বের করবে কিংবা ঢোকাবে। তারপর, মনিবের সামনে চাবিগোছা দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে। তারপর রাত গাঢ় হবে। এবং সুদর্শন সিংহবাবু অনেক রাত অবধি একাকী বসে থাকবেন দোতলার বারান্দার এক কোণে নিতান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে। হরিণমুড়ি খালের দিক থেকে ধেয়ে আসবে শীতল বাতাস। শালকাঁকির ডাঙায় আদিবাসী যুবকেরা মাদলে দ্রিমি দ্রিমি...বোল তুলবে। খুব সুরেলা গলায় গাইবে আদিবাসী যুবতীর দল। তুষু কিংবা ভাদুর গান।

ই-বন কাটি সি-বন কাটি, কাটি বনের শাল ঝাঁটি
বিষ্টুপুরের রাজার ব্যাটা খুঁজছে দাঁতন কাঠি।

অনেক রাতে ক্ষয়ে যাওয়া কাস্তের মতো চাঁদ উঠবে কাঁড়ঘসা জঙ্গলের মাথায়। শনশন হাওয়া বইবে। সুদর্শন সিংহবাবুর ঠিক তখনই মনে হবে, পাশের ঘরে সরযু নেই। সে কখন একফাঁকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে গেছে তেতলার ছাদে। তার মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, রোহিনী, বিশাখার সমাবেশ। চৌকো বিষ্টুপুরী লণ্ঠনখানি বাঁ-হাতে তুলে ধবে ঠিক সঙ্কেত জানাবার ভঙ্গিতে নাড়িয়ে চলেছে সরযু, ঠিক যে ভঙ্গি ও মুদ্রায় সে অতীতে বহুবার ধরা পড়ে গেছে সুদর্শনের সুমুখে। তখন অবশ্য সুদর্শনের দুটো পা'ই শক্তপোক্ত ক্রিয়াশীল ছিল, যখন খুশি পা টিপে টিপে তিনি চলে যেতে পারতেন তিনতলার ছাদে।

২. নিশান বাউরির কুঁড়েঘরে হোলির আগুন।

হরিণমুড়ি খাল। রাঢ় মুলুকে খালকে বলে 'জোড়'। সেই সুবাদে হরিণমুড়ি জোড়। আসলে কিন্তু নদী। স্রোতস্বিনী। তার উৎসে রয়েছে অবিরাম জলের অনন্ত 'কুম'। তার গতিপথের দু'ধারে রয়েছে অগুনতি ঝোরা। তার বহতা জলে নৃত্যশীল স্রোত রয়েছে। স্রোতে রয়েছে ছোট বড় নানান আকারের ঘুঙুর। সে ঘুঙুরে বোল রয়েছে। মরসুম ভেদে সেই বোলে সুর-তাল-লয়ভেদ ঘটে। নদী ছাড়া সে কী? চুয়ামসিনা মৌজাতেই জাংগিরপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সে নদী। হরিণমুড়ি। সেই নদীর একেবারে পাড় ঘেঁসে সুদর্শনের কোন পূর্বপুরুষ বানিয়েছিলেন সিংহগড়। তাঁরাও তো এসেছিলেন নদীপথ ধরে ধরে কোন্ সেই সুদূর অতীতে উড়িষ্যা মুলুক থেকে। তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জুড়ে ছিল ধারাবাহিক শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল। জলপথ ছিল অনেক নিশ্চিত ও নিরাপদ।

সিংহগড়ের পাশাপাশি এসে হরিণমুড়ির খাতের মধ্যে পড়েছে প্রায় একশ গজ জুড়ে কালো কুচকুচে ব্যাসল্ট পাথরের চাতাল। চাতাল, কিন্তু মসৃণ নয়। উঁচু উঁচু ব্যাসল্টের চাঙড় জেগে রয়েছে নদীর বুক জুড়ে। ঐ চাঙড়গুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে করে, বয়ে চলেছে হরিণমুড়ির জল। দূর থেকে মনে হয় বুঝি শ-দেড়শ মহিষ-কাঁড়া নদীর জলে শরীরের আধখানা ডুবিয়ে শুয়ে রয়েছে। যেন বা আরামে, আয়েসে, বুঁজে আসছে ওদের চোখের পাতা। নদীর জল ওই জায়গাতে পৌঁছুনো মাত্রই বেসামাল হয়ে পড়ে। অস্থির চরণে নৃত্য শুরু করে। ফলে নদীর দু'পায়ের ঘুঙুরের স্বাভাবিক বাজনা

সিংহগড়ের কাছাকাছি এসে পেয়ে যায় নতুন সুরঝংকার, জলদ তাল ও লয়। খুব ছেলেবেলা থেকেই সুদর্শন শুনেছেন সেই অস্থির লয়ের বাজনা। সিংহগড়ের যে-কোন ঘর থেকেই শোনা যায় সে বাজনা। নিশুত রাতে, যখন চারপাশ শুনশান হয়ে যায়, সেই বাজনা আরও তীব্র, মর্মভেদী হয়ে ওঠে। আর বর্ষাকালে, যখন হরিণমুড়ি থৈ-থৈ জলে দুকূলপ্লাবী হয়ে ওঠে, তখন এমন শোঁ-শোঁ গর্জন তুলে ছুটতে থাকে উথালপাথাল জল, মনে হয়, এক বিশালকায় প্রাচীন গোখরো সাপ বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে সবুজ ধানখেতের আলপথ ধরে।

সুদর্শনের শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের অনেকখানি সময় কেটে গিয়েছে হরিণমুড়ির পাড়ে। তাঁর জীবনের যাবতীয় বাঁকগুলি,-সবই সৃষ্টি হয়েছে হরিণমুড়ির বাঁকে বাঁকে। কাঁড়ঘসা কিংবা বত্রিশভাগীর জঙ্গলে, কানশিকড়ার শ্মশানে, অথবা শালকাঁকির ঘাটে।

রাঢ় মুলুকের মানুষ নয় সিংহবাবুরা। তাঁরা এই বাংলা মুলুকেই আগন্তুক। তাঁরা ছিলেন উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে মূলত পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে জমিদারী কিনে বেশ শক্তপোক্তভাবে থিতু হয়ে বসে যান এঁরা। তখন রাঢ় বাঁকুড়ার অর্ধেকের বেশি এলাকা জুড়ে ধারাবাহিক নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গল, জঙ্গল। টাঁড়-টিকর-ভুঁই। রুখা-শুখা-মাকড়া-পাথর আর কল্লাচ মাটির ডাঙা। আর, উত্তর ও পশ্চিম বরাবর ইতস্তত ছড়ানো ডিহি-ডুংরীর দল। জঙ্গলে ঢাকা এই রুখা মুলুকে তখন মূলত বাস করত নিশান বাউরি, রুদ্র শিকারি, মেথর লায়েকদের পূর্বপুরুষেরা। স্বভাবতই আভিজাত্যে, অর্থকৌলিন্যে বলীয়ান সিংহবাবুরা এই এলাকার সাধারণ মানুষজনকে কীটপতঙ্গের বেশি মর্যাদা দেওয়ার কথা ভাবতেই পারতেন না। তাঁরা কখনও কল্পনাও করেননি, অরণ্যচারী এই আদিম মানুষগুলোর বুকেও থাকতে পারে কোন আগুনের লেশ। পর পর ঘটে যাওয়া লায়েক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহকে নিতান্তই এক সাময়িক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবে নিয়েছিলেন সুদর্শনের পূর্বপুরুষরা। আদিবাসীদের সেই জ্বলে ওঠার দিনগুলো শুধু সুদর্শনদেরই নয়, তাদের নিজেদের স্মৃতি থেকেও বুঝি বেমালুম উধাও হয়ে গিয়েছে বহু যুগ আগে। অন্তত সুদর্শন সিংহবাবুর আশৈশব অভিজ্ঞতায় এক নিশান বাউরি ছাড়া, আর এ ধরনেব কোন ঘটনার সঞ্চয় নেই। কেবল ওই একমাত্র জন, নিশান বাউরি, শালকাঁকিব পুষ্কর বাউরির ব্যাটা, সিংহগড়ের রাখালবাহিনীর কনিষ্ঠতম সদস্য। ছেলেবেলায় যাকে এক ভয়ঙ্কর জল-আয়নায় রূদ্ধশ্বাসে নিজের শরীরের প্রতিবিম্ব দেখতে বাধ্য করেছিলেন সুদর্শন। সেই আতঙ্ক বুঝি সারাজীবন আর একতিল রেহাই দেয়নি নিশান বাউরিকে। সে এক প্রবল অসহ্য বিষ-যন্ত্রণায় বুঝি কেটেছে নিশান বাউরির কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব। মৃত্যুকালে বুঝি সেই যন্ত্রণার ভার উত্তরাধিকার সূত্রে সঁপে গিয়েছে ব্যাটা পরীক্ষিত বাউরির শরীরে। পরীক্ষিত বাউবিও সেই অন্ধ জ্বালায় জ্বলে চলেছে আজীবন কাল। এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তিতে বসল না লোকটা, একটুখানি শান্তিতে ঘুমুতে পারল না দু'দণ্ডের তরে। কেবল পায়ের তলায় মাষকলাই ছড়িয়ে দৌড়ে বেড়ালো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, হাতে নিয়ে জ্বলন্ত মশাল। তার লেলিহান শিখা দাউদাউ করে বারংবার ছুঁয়ে ফেলল মহাকালকে...।

এবং একদিন পরীক্ষিত বাউরি ঐ মশালের আগুন ছুঁইয়ে দিল সিংহগড়ে। ঝাঁ করে জ্বলে উঠল আগুন। এখনও জ্বলছে, কখনও ধিকিধিকি, কখনও দাউদাউ। সিংহগড়ের চুড়োয়। জ্বলছে, জ্বলছে।

আসলে, নিশান বাউরি মরণকালে কেবল তার যন্ত্রণাটাই দিয়ে যায়নি ব্যাটা পরীক্ষিত বাউরিকে, দিয়ে গেছে বুঝি তার যাবতীয় রোষান্ধ আগুন। যদি কোন প্রতিজ্ঞা সে করে থাকে সেই

ছেলেবেলায়, তাও। যদি কোন বিষ-গাছ পুঁতে থাকে বুকের গভীরে, তাও। চাপিয়ে দিয়ে গেছে প্রতিশোধসঞ্জাত যাবতীয় অনুভূতির বোঝা পরীক্ষিত বাউরির ঘাড়ে। এবং এত কাণ্ড ঘটে গেছে সুদর্শনের অজান্তে, দৃষ্টির আড়ালে। আসলে পরীক্ষিত বাউরি তো দূরের কথা, কোনও আগুন যে চারিয়েছে নিশান বাউরির বুকে, শৈশবে বোঝা যায়নি তা। সুদর্শন সে আগুন টের পেলেন অনেক অনেক পরে। আসলে, টের পাওয়ার কথাও নয়। নিশান বাউরি চিরকালই ছিল ধীরস্থির, মৃদুভাষী। তার ঠাণ্ডা দুটি চোখের মণিতে যে নরম ছায়াখানি ভাসত, তাকে নম্রতা ভেবে নেওয়া যায় অনায়াসে। সুদর্শন সিংহবাবু ওই নরম চোখের মণিতে চাপা আগুনের সন্ধান পেয়েছিলেন কেবল একটি মাত্র ঘটনায়।

নিশান বাউরির প্রথম পক্ষের বউটি ছিল বাঁজা। এবং রূপে-স্বাস্থ্যে, ঠমকে একটি আগুনের খাপরা। রূপসী বাঁজা মেয়ের বড়ই কদর রসিক মহলে। ভোগ করবার ধুম পড়ে যায়। তাতে আমোদ থাকে ষোল-আনা, ঝুঁকি নেই একতিল। সুদর্শন সিংহবাবুর একদিন নজর পড়ল সে মেয়ের ওপর।

নিশান বাউরি তখন গরু-বাগালি ছেড়ে সিংহগড়ের মাইন্দার। চাষে-বাসে খাটে। ফাই-ফরমাস, হুকুম তামিল করে। সুদর্শন একদিন প্রস্তাবটা দিলেন নিশানকে, খুব সুস্পষ্ট ভাষায় সরাসরি সে প্রস্তাব। চুয়ামসিনা থেকে জয়রামপুর মাইল দেড়েকের পথ। সুদর্শনের একখানা বাগানবাড়ি ছিল, দোতলা, শাল আর মহুল গাছের ঘেরাটোপে। তাকে 'লৈতন কাচারিঘর' বলে ডাকত সবাই। মাঝে মাঝে সুদর্শন সপারিষদ সেখানে আমোদ ফুর্তি করতেন। দাপানজুড়ির চণ্ডিদাস দত্ত, লোখেশোলের নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বৈদ্যার যশোদাজীবন তুঙ্ এরাই ছিল সুদর্শনের পারিষদ, রঙ্গ-তামাশার সহচর। সিংহগড়ের সমকক্ষ নয় কেউ তবে ছোট-মাঝারি জোতদার সবাই। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকবার সুবাদে নিজেদের এলাকায় এদেরও প্রতাপ কম নয়। সুদর্শন বললেন, তুয়ার বউটাকে আজ সাঁঝের বেলায় লৈতন কাছারিঘরে পাঠাস তো। নিশান বাউরি কোন জবাব দিল না। কিন্তু নিশানের বউ কাচারিঘরে এল না সে রাতে। সুদর্শন সিংহবাবুর স্মৃতিতেএমন অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। কিন্তু সে জন্য কোনও তর্জন-গর্জন করলেন না সুদর্শন। খুব অস্বাভাবিকভাবে গুম মেরে রইলেন শুধু।

পরের দিন নিশান বাউরি রোজকার মত কাজে এল সিংহগড়ে। তারও যেন কোন ভাবান্তর নেই। যেন কোনই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে। সুদর্শনও তাকে ডেকে কোনরূপ কৈফিয়ত তলব করলেন না, হুমকি দিলেন না, এমন কি নীরব রক্তচক্ষু হেনে শাসনও করলেন না।

হপ্তাটাক বাদে। সেদিনটা ছিল হোলি পূর্ণিমা। ফুরফুরে বসন্তের বিকেলে, নিশান বাউরির বউ গাছ-কোমরে শাড়ি পরে হরিণমুড়ি নদীতে দৈনন্দিন জল আনতে গেছে। সমবয়েসীদের সঙ্গে দিনান্তের রঙ্গরসে মশগুল সে। তখন হাওয়া বইছে আগল বাগল, আমে-জামে মুকুল এসেছে। বটপাতার রঙ গাঢ় হচ্ছে একটু একটু করে। চড়ুই, টিয়েরা বাসা বাঁধবার উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। আর, হরিণমুড়ির পাড়ে প্রাচীন শিমূল গাছটা লাল টকটকে ফুলে আগুনের মতো জ্বলছে। এমনি সময়ে রুদ্র শিকারির নেতৃত্বে নদীর ঘাটে হাজির হল জনা পাঁচ-ছয় লগদি-লেঠেল। কারোর সঙ্গে কোনই বাক্যালাপ করল না ওরা। রুদ্র শিকারি নিশান বাউরির বউকে তুলে নিল পাঁজাকোলা করে। তারপর তাকে এক ঝটকায় কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বেশ ছন্দোবদ্ধ পা ফেলে চলে গেল লৈতন কাচারিঘরের দিকে। সেই বসন্তের ফুরফুরে বিকেলে, যখন নিশান বাউরির বউ প্রকাশ্যে লুট হয়ে গেল শতজনের সুমুখে, নিশান বাউরি তখন হরিণমুড়ি খালের ধারে সিংহবাবুদের এগার বিঘার চাকের মধ্যে বসে বসে একমনে মুথাঘাস বেছে বেছে সাফ করছিল জমিন। তখন সূর্যের লাল চাকি

নেমে গিয়েছে দিগন্তে, গাছ-গাছালির ডালে পালায় ঘরমুখো পাখি-পাখাল তাদের চোখের মণিতে দিনান্তের যাবতীয় বিষণ্ণতা সঞ্চয় করে প্রস্তুত হচ্ছে ঘরে ফেরার জন্য, এবং এই সব কিছুর জটিল সমাবেশের মধ্যেই নিশান বাউরির ভরভরন্ত যুবতী বউ জমা পড়ে গেছে সুদর্শনের মুঠোতে। নিশান বাউরি জানতেই পারল না, কখন তার জীর্ণ কুঁড়েখানাকে হোলিঘর ভেবে বাবুরা আগুন ছুঁইয়ে দিয়েছে। আগুন, আগুন।

সে রাতে সুদর্শন সিংহবাবু অনেকখানি মদ খেয়েছিলেন। পারিষদদের বিদেয় করে দিয়েছিলেন সন্ধেপ্রহরে। সে রাতে হাওয়া বইছিল উদ্দাম। উদোম মাঠের মধ্যে ইতস্তত বানানো হোলিঘরগুলো একে একে জ্বলছিল। নৈতন কাচারিঘরের লাগোয়া ভুয়াশ গাছটার কোটরের মধ্যেকার পেঁচাটা বারবার ডেকে উঠছিল কর্কশ গলায়। দোতলার একটি কুঠরিতে নিঃশব্দে ক্ষণ গুনছিল নিশান বাউরির বউ। গভীর রাতে বেশ টলোমলো পায়ে সে ঘরে ঢুকেছিলেন সুদর্শন, ঝনাৎ শব্দে দরজার শেকল খুলেছিলেন। ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল নিশান বাউরির বউ। ঘরের মধ্যে জ্বলছিল ঢাউস বিষ্টুপুরী লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলো ছুরির ফলার মত পড়েছিল নিশান বাউরির বউয়ের মুখে।

সুদর্শন সিংহবাবু একেবারে কাছটিতে পৌঁছুবার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল নিশান বাউরির বউ। তার দু'চোখে ছিল ভীত খরগোশের চাহনি। তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল তিরতিরিয়ে। সে এক পা এক-পা করে পেছোচ্ছিল দু'দেয়ালের সঙ্গমস্থলের দিকে। দু-হাত দিয়ে আড়াল করেছিল বুক।

সুদর্শন সিংহবাবু যখন অভ্রান্ত নিশানায় জাপটে ধরলেন নিশান বাউরির বউকে, তখনও সব কিছু ঘটছিল প্রত্যাশিতভাবেই। আচমকা মেয়েটা এক ধাক্কায় টলিয়ে দিল সুদর্শনের দু'পায়ের ভর। টাল সামলাতে না পেরে সুদর্শন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মেঝের ওপর। এবং সেই ফাঁকে, নিশানের বউ হরিণীর ক্ষিপ্রতায় দৌড়তে লাগল বত্রিশভাগী জঙ্গলের দিকে। রুদ্র শিকারিদের যখন হুঁশ হল তখন জঙ্গলটা তার যাবতীয় মহিমা সহকারে বেমালুম গিলে ফেলেছে মেয়েটাকে।

রুদ্র শিকারির দল সারারাত ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও হদিস পেল না সে মেয়ের।

৩. ষাঁড়ের ককুদের তলায় জোঁক

কিছুক্ষণ আগে, শোবার ঘরের পশ্চিম-জানলার ফ্রেমে, সূর্যকে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপের মতো ডুবতে দেখেছেন সুদর্শন। দৃশ্যটা রোজই দেখেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চকিতে মনে পড়ে যায় কাদম্বরীর কথা। কাদম্বরী, সুদর্শনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। তার কোনও কিছুই তেমন করে ধরে রাখেননি স্মৃতিতে। কেবল পশ্চিম আকাশে ডুবন্ত সূর্যকে দেখে ওর কপালের সিঁদুরের টিপের কথা মনে পড়ে। কাদম্বরী আজ বেঁচে থাকলে, নির্ঘাৎ চোখের জলে বুক ভাসাত অবিরাম। সুদর্শনের এই পাখনা-কাটা শরীর, এই স্থবিরের মতো বসে থাকা, পিঠের এই দগদগে ঘা, —এ সব সে দু'চোখ মেলে দেখতে পারত না কিছুতেই। স্বামীকে সে ভালবাসত বলেই মনে হয় সুদর্শনের। কারণ, স্বামীকে ভালবাসবার শিক্ষা নিয়েই শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েছিল কাদম্বরী। কথায় কথায় আঁতকে উঠত। পান থেকে চুন খসলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ত। সুদর্শনের সামান্য মাথা দপদপ করলে কিংবা গায়ে অল্প জ্বরের আভাস পেলেই সে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসত। মানত, উপোস, হত্যে দেওয়া, জ্যোতিষী ডাকিয়ে ঠিকুজি দেখানো, এ সবই চলত দিনভর। এতসব করে-টরে আর স্বামীর কাছে আসার খুব একটা সময় থাকত না কাদম্বরীর। অবশ্য সুদর্শনও যে তার জন্যে খুব একটা মুখিয়ে থাকতেন, তা নয়। কোন দিন কাদম্বরীর জন্য তেমন করে টান অনুভব করেননি। ওর উপস্থিতি বাড়তি

কোন জোয়ার আনেনি মনে। অনুপস্থিতিও কোন অভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আসলে, কাদম্বরী ছিল এক যথার্থ পতিপ্রাণা মহিলা। তার রক্তে-মাংসে, মেদে-মজ্জায়, বিশ্বাসে-সংস্কারে স্বামী মিশে গিয়েছিল সেই শৈশব থেকে। সে ছিল এমনই এক নারী, যার থেকে স্বামীব কোন পৃথক সত্তা আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। অন্তত সুদর্শনের মনে হয়েছে তেমনটাই। সুদর্শন জানতেন, তিনি কেমন দেখতে, কতটা বলবান, কত গুণের অধিকারী,—এগুলো কাদম্বরীর বিবেচ্য ছিল না কোনদিনও। একটা কথাই বোধকরি তার বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঘন্টার মত বেজে যেত। সেটা হল, সুদর্শন ওর স্বামী, আর অন্য কিছু নয়। শুধু স্বামী। মনে আছে, কোনও তরল মুহূর্তে, সুদর্শন হয়ত কাদম্বরীকে শুধিয়েছেন, কাদম্বরী, আমি দেখত্যে কেমন? ডাগর চোখে তাকিয়ে স্বামীর মুখের রেখাগুলো পরখ করত কাদম্বরী। এটা বাস্তবিকই সুদর্শনের একধরনের ঠাট্টা কিনা, সেটা বোঝবার চেষ্টা করত। তারপর ভ্রূকুটি করে বলত, 'স্বামীর রূপ লিয়ে ভাবতে নাই মেয়াদের।' ধীরে ধীরে সুদর্শনের বিশ্বাস হয়েছে, কাদম্বরীর মতো মেয়েদের কাছে স্বামীরা পুরুষ নয়, কেবলই স্বামী। স্বামী, স্বামী।

ভাবনার রশি বেয়ে বেয়ে কত উঁচুতে উঠে গেছেন সুদর্শন। রোজই এমনই উঠে যান। কত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত তখন কত সহজে খেলে যায় মগজে। সুদর্শনের ইদানীং মনে হয়, কাদম্বরীর চোখে তিনি পুরুষ ছিলেন কি কোনদিন? কাদম্বরী এ বাড়িতে যতটা সুদর্শন সিংহবাবুর স্ত্রী হয়ে এসেছিল তার চেয়েও বেশি এসেছিল দ্বারিকাপ্রসাদের পুত্রবধূ হয়ে। এ বিয়েতে সুদর্শনের তিলমাত্র মত ছিল না। শিমলাপালের ষড়ঙ্গীদের সঙ্গে শালুকার জঙ্গল নিয়ে সিংহবাবুদের তিন পুরুষের বিবাদ। সেটা সুদর্শনের রক্তেও চারিয়েছে জন্মাবধি। আচমকা বাবার মুখে প্রস্তাবটা শুনে তিনি থ' হয়ে গিয়েছিলেন। বাবার গম্ভীর মুখের সামনে কিছু বলতে পারেননি। মা বেঁচে নেই তখন। বাধ্য হয়ে শিশুবালার মারফত কথাটা জানিয়েছিলেন বাবাকে। শিশুবালার সঙ্গে বাবার একটা রহস্যময় সম্পর্ক ছিল বলে বিশ্বাস হয়েছিল সুদর্শনের। তখন সুদর্শন সবে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরেছেন। শহরের স্কুলে পড়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া,—এ বংশে প্রথম ঘটল এমনটা। একদিন দ্বারিকাপ্রসাদ সুদর্শনকে ডেকে পাঠালেন তাঁর শোবার ঘরে। বললেন, 'শিমলাপালের ষড়ঙ্গীদের ঘরে বিবাহ করত্যে আপত্তি কিসের?'

এমন রাশভারি মানুষের সামনে কী জবাব দেবেন সুদর্শন। পুরোপুরি গুলিয়ে ফেললেন। পায়ের দিকে চোখ রেখে কোন গতিকে বললেন, 'উয়ারা আমাদের চিরকালের শত্রু।'

দ্বারিকাপ্রসাদের মুখ দেখে কোনকালেও তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া ধরা যেত না। তবুও সুদর্শনের মনে হল, ওঁর কথায় এক টুকরো হাসি যেন পলকের তরে ঝিলিক মেরে গেল দ্বারিকাপ্রসাদের ঠোঁটে। বললেন, 'বোকা শত্রুকে তুমি লাঠির আগায় বশ কইর্‌বে। কিন্তু ধূর্ত শত্রুকে লিয়েই যত চিন্তা। সে তোমাকে আচমকা অন্‌জায়গায় ঘা' দিতে পারে। তার জন্য চাই অন্য ওষুধ।' একটু থেমে দ্বারিকাপ্রসাদ বললেন, 'তেমন শত্রুর গায়ের সাথে লেপট্যে থাকতে হয় সর্বদা। লাঠি চালাতে হলে, সামনে একটুন্ পরিসর চাই। ওই পরিসরটুকু যেন শত্রু কিছুতেই না পায়।'

সুদর্শন জানতেন, বাবার সঙ্গে যুক্তিতে পারবেন না। বাবার ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি নেহাতই শিশু। তাঁর ইচ্ছেকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা, সামান্য একটু প্রতিবাদ করাও বুঝি কারও পক্ষে অসম্ভব। কাজেই, নির্দিষ্ট দিনে কাদম্বরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুদর্শনের। তখন তাঁর বয়স বাইশ।

অটুট স্বাস্থ্য, অদম্য তেজ। চোখ জুড়ে আজব আজব নেশা। কাদম্বরীর বয়েস পনেব। দুধের মতো গায়ের রঙ। সারা সঙ্গে কচি অশ্বত্থ পাতার লাবণ্য। আর, ফুলের ভারে নুয়ে পড়া গাছের মতো দেমাক। গা-ভর্তি গয়না পরে কাদম্বরী সিংহগড়ে ঢুকল। সঙ্গে নিয়ে এল প্রচুর ঐশ্বর্য আর উপঢৌকন। আর, সেই সুবাদে, শালুকার জঙ্গলটাও এল সিংহবাবুদের এস্টেটে। শত্রুকে হাতের মুঠোয় রাখবার সমস্ত কলাকৌশল তখনও পুরোপুরি রপ্ত হয়নি সুদর্শনের। একটা এস্টেট চালাবার মতো পরিপক্ক বুদ্ধি তখনও তিনি অর্জন করেননি। তবুও সেই বয়সে, ঠিকই বুঝেছিলেন, কী অপূর্ব কৌশলে দ্বারিকাপ্রসাদ তাঁর চির-শত্রুকে নিজের কব্‌জার মধ্যে নিয়ে এলেন! ষড়ঙ্গী-বাড়ির মেয়ে এসে কয়েদ হল সিংহগড়ে, জামিন হিসেবে।

কাদম্বরী অগাধ রূপের অধিকারিণী ছিল। কিন্তু তবুও কোনদিন কাদম্বরীর টানে অন্দরমহলে ঘাঁটি গাড়বার কথা কল্পনাও করেননি সুদর্শন। সেটা সিংহবাবুদের রক্তেই অনুপস্থিত ছিল। সিংহবাবু বংশে নারীরা চিরকালই একেকটি সহস্রদল পদ্ম। আর পুরুষেরা মধ্যাহ্ন আকাশের সূর্য। সূর্য কখনও জগতের একটিমাত্র কুমুদিনীকে আলো দেয় না। কাজেই, অন্দরমহলের নিভৃত সরোবরে সুদর্শন আজীবন কায়মনোবাক্যে একটি মাত্র পদ্মকেই ফুটিয়ে যাবেন, এমনটা ভাবাই যায় না। বরং ওঁর ক্ষেত্রে বলা যায় অন্য কথা। ছেলেবেলা থেকেই অন্দবমহলের প্রতি কোন টানই ছিল না সুদর্শনের। মা ছিলেন জন্মরোগী। ছেলেবেলা থেকে শিশুবালার কোলেপিঠেই তিনি মানুষ। ক্ষীরোদ মাস্টারের কাছে বাল্যের শিক্ষাদীক্ষা। বাবার কাছেপিঠে কোনদিন ঘেঁসতে পারেননি তিনি। নিজের ব্যক্তিত্বকে বর্মের মতো দুর্ভেদ্য করে বেখেছিলেন দ্বারিকাপ্রসাদ, নিজের চারপাশে। সেই বর্মের আড়ালে কোথায়, কত গভীরে একটা পিতৃহৃদয় বসবাস করত, তার হদিস পাননি সুদর্শন।

সিংহগড়টা ছিল সর্বার্থেই একটি গোলকধাঁধার মতো। মহলের পর মহল। ছোট বড় অসংখ্য ঘর। সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথ। অসংখ্য দরজা, অলিন্দ। জাফরি দিয়ে ঘেরা দোতলার বারান্দা। সারাক্ষণ একটা রহস্যময় আলো-আঁধারির রাজ্য।

দ্বারিকাপ্রসাদের ছিল নিজস্ব মহল। সেখানে সবাইয়ের ঢুকবার অনুমতি ছিল না। উনি সেখানে একলাই থাকতেন। যৌবনের শেষ পর্বে এসে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে নিয়ে যেমন-খুশি খেলবার প্রবণতা জন্ম নিয়েছিল তাঁর মধ্যে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন উপলব্ধি করেছেন, ও মহলে একটা স্বতন্ত্র নদী বইছে। সন্ধের পর জ্বলে উঠছে ঝাড়বাতি। বিলিতি মদের আসর বসছে। মাঝে মধ্যে আসছেন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের দল। শিম্পসন, বার্টলার, ওয়াটসন। মদ্য-মাংসে চুর হয়ে তাঁরা বিজাতীয় ভাষায় হল্লা জুড়েছেন মধ্যরাতে। এসব সুদর্শনের চেনা দৃশ্য। মাঝে মাঝে, রাতের অন্ধকারে, ঝালর দেওয়া পাল্‌কি বেরিয়ে যেত নিঃশব্দে। গভীর রাতে ফিরে আসত। পাতলা পর্দা সরিয়ে তা থেকে নামত প্রজাদেরই কোন ঘরের কুলবধূ। কদম শিকারিকে অনুসরণ করে সে নারী ধীরপায়ে চলে যেত দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবুর খাসমহলে। সিংহগড়ের প্রায় প্রত্যেকেই জানত ব্যাপারটা। জানত তালুকের আপামর মানুষ। কিন্তু মুখ দিয়ে 'রা' কাড়বার সাহস হয়নি কারও। যদ্দুর মনে পড়ে, দ্বারিকাপ্রসাদের বয়েস যখন সত্তর কি পঁচাত্তর, তখনও ওই নৈশ নাটক চলত।

সুদর্শনও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন সেটা। ফলে, কাদম্বরীকে পতিপ্রাণা পত্নী হিসেবে সিংহগড়ে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি জয় করতে চলেছেন অনেক সাম্রাজ্য।

সুদর্শনের জীবনে জয় অনেক। পরাজয়ও কম নয়। তাঁর এমনি এক পরাজয়, অসহায় পরাজয়, নিজের স্মৃতির কাছে। কোন কালের কোনও কথাই তাঁর স্মৃতি থেকে মোছে না। সেই শৈশব থেকে আজ অবধি প্রতিটি ঘটনা তাঁর মনের মধ্যে ভীষণ জীবন্ত হয়ে বেঁচে আছে। অথচ সুদর্শন বিশ্বাস করেন, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু ভুলে যাওয়ার ভীষণ প্রয়োজন আছে। তাঁর মতো বয়সে অধিকাংশ মানুষই তাদের টাটকা স্মৃতিগুলোকে বারে বারে ভুলে যায়। আর সুদর্শন, সেই কবে থেকে, কোন্ যুগ থেকে, বিষাক্ত, পচা, অজীর্ণ ও অদাহ্য স্মৃতিকে আঁকড়ে বসে আছেন। কিছুতেই তাদের ভিটেছাড়া করতে পারছেন না। সারা জীবন ধরে মানুষকে ভিটেছাড়া করবার জন্য কত নতুন নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। কত নিষ্ঠুর পথ। সেসব পদ্ধতি বুঝি এ ক্ষেত্রে অচল। আজীবন প্রজাদের ত্রাস হলেও এখন তাঁর স্মৃতির রাজ্যের বেয়াড়া প্রজাগুলোর কাছে তিনি কত হীনবল, অসহায়। তাদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা বুঝি আর এ জন্মে হল না। ওরা তাঁকে দেখে হাসে। পরিহাস করে। ভয় দেখায়। ওরা তাঁর চোখের সামনে হাজার বে-আদবী করে। সুদর্শনকে সব মুখ বুঁজে সইতে হয়। জীবনে কারও বে-আদবীই সহ্য করেননি সুদর্শন সিংহবাবু। না চন্দ্রকান্তর, না বৈদ্যা-লায়েকবাঁধের লায়েকদের, না শালকাঁকির নিশান বাউরির, কারুর নয়। অথচ মগজের বেয়াড়া প্রজাগুলো তাঁর সঙ্গে এমনভাবে লেপটে রয়েছে যে তাদের কোনভাবেই আঘাত করবার জো পান না।

সুদর্শনের ছেলেবেলায় একটা ষাঁড়ের কষুদের তলায় একটা জোঁক বসেছিল। বেচারি ওটাকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। না মুখ দিয়ে, না শিং দিকে, না লেজ দিয়ে। সে বড় করুণ অসহায় অবস্থা তার। ভীম পরাক্রম থাকলেও সামান্য এক জোঁকের কাছে কাবু। সুদর্শনের স্মৃতিগুলোও ওই জোঁকের মতোই। নাগালের বাইরে থেকে অষ্টপ্রহর রক্ত চুষছে। এতদিন তিনি অবশ্য ওই জোঁকগুলোকে শরীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন একটি মাত্র কৌশলে। অবিরাম বনবন্ করে ঘুরতেন। তেজী ঘোড়ার মতো পিঠ ঝাঁকিয়ে ছুটতেন। ঘুরন্ত চাকা থেকে যেমন জল-কাদা ছিটকে যায় নিমেষে, তেজী ঘোড়ার পিঠে যেমন একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারে না সওয়ার, সুদর্শনের প্রচণ্ড গতিশীল জীবনে, সেই কারণেই, তাঁর স্মৃতিগুলো কখনও খুব আঁটোসাটো হয়ে মগজের মধ্যে থিতু হয়ে বসতে পারেনি এতকাল। কিন্তু এখন তিনি পাখনা-ছাঁটা পাখির মতোই অচল। মানুষের পা জোড়াই তো পাখনা।

এই পা দুটোর কথা প্রায় সময়ই ভুলে থাকতে চান সুদর্শন। কিন্তু পারেন না। আচমকা পায়ের কথাটা ধক্ করে মনে পড়ে যায়। বাঁ-হাতখানা অজান্তে নেমে যায় কোমরের নিচে। সরসর করে এগোতে থাকে খানিক। তারপর এক সময় থেমে যায়। দুটো পা-ই হাঁটু থেকে কাটা গেছে। আজ পাঁচ বছর আগে। সেই থেকে কেবল ঊর্ধ্বাঙ্গটুকু নিয়ে তিনি দোতলার এই কোণের ঘরখানায় শুয়ে আছেন, আজ পাঁচ বছর।

পা দুটি হারাবার বছর-পাঁচেক আগে একখানা রেডিও কিনেছিলেন সুদর্শন। এ তল্লাটে এমন যন্ত্র তখনও কেউই দেখেনি। খুব গমগমে আওয়াজ ছিল যন্ত্রটার। বাড়ির উঠোনে একজোড়া লম্বা বাঁশ পুঁতে এরিয়েলের তার খাটানো হয়েছিল। দিনভর হরেক জাতের গান বাজতো তাতে। কানা কেষ্ট, জ্ঞান গোঁসাই, ছবি রাণীর কীর্তন, মীরার ভজন। সকাল সন্ধেয় খবর পড়ত কম্বুকণ্ঠে। সুদর্শনের বৈঠকখানা গমগম করত। চুয়ামসিনার তো বটেই, আশেপাশের গ্রাম থেকে বাবু ভায়ার দল সন্ধেবেলার খবর শুনতে আসত। রেডিওটি ছিল সিংহগড়ের আভিজাত্যের প্রতীক।

বহুদিন এমন সপারিষদ রেডিও শোনেন নি সুদর্শন। যন্ত্রটা সরিয়ে এনে রাখা হয়েছে তাঁর শোবার ঘরে। অষ্টপ্রহর বেজে যায়। সুদর্শন কখনো শোনেন, অধিকাংশ সময়ই শোনেন না। যন্ত্রটা

ইদানিং খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বেজে যায়। আর সুদর্শন, দিন-রাত, হপ্তা, মাস, বছর, নিরন্তর তাঁর নিজস্ব স্মৃতির প্যাঁচে কাবু হয়ে হাঁসফাঁস করেন।

স্থবির পাথরের গায়ে যেমন একটু একটু করে শ্যাওলা জমে, সুদর্শন সিংহবাবুর অচল জীবনের খাঁজে খাঁজেও তেমনি ওই বজ্জাতরা জাঁকিয়ে বসেছে সুযোগ পেয়ে। এবং তাদেরই তিলতিল প্যাঁচে জড়ানো তিনি, দম আটকানো এক মৃত্যুমুখী গাছ। গাছ, গাছ, গাছ।

৪. পরীক্ষিত বাউরির উত্তরাধিকার

বাঘের মুখ থেকে শিকার ফসকে গেল, অথচ বাঘ নির্বিকার, এমনটা যেমন ভাবা যায় না, তেমনই, হাতের মুঠো থেকে আস্ত যুবতী মেয়েমানুষ ফসকে পালিয়ে গেলে সুদর্শন সিংহবাবু চুপচাপ বসে থাকবেন এও যেন এক অসম্ভব ব্যাপার। অথচ, যে মানুষটা এক প্রবল ঝড়জলের রাতে কাঁধে দোনলা বন্দুক ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁর পছন্দের মেয়েমানুষটির প্রেমিকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে, সেই সুদর্শন সিংহবাবু এত বড় একটা অঘটন ঘটে যাওয়ার পরও অনুদ্বিগ্ন, অচঞ্চল রইলেন। ডান হাতখানি খুব শীতল অনুত্তেজক ভঙ্গিতে ওপরে তুলে থামিয়ে দিলেন রুদ্র শিকারিকে। বললেন, 'ছেড়্যে দে। যে গেছে, উয়াকে যেত্যে দে। উ উড়া পাইখ। ধরা দিবার লয়। তুই বরং ঝারমনিয়ার বউটাকে দেখ্। রাধালগরের রাধাটিকে।' রাধালগরের গগন ঝারমনিয়ার বউটাকে অনেকদিন আগে থেকেই পছন্দের তালিকায় রেখেছেন সুদর্শন। গেল বছর দুর্গাপূজায় সে মেয়ে যাত্রাগান শুনতে এসেছিল সিংহগড়ে। কমিক দৃশ্যগুলোতে হেসে লুটিয়ে পড়ছিল বারংবার। দোতলার বারান্দা থেকে সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখেছিলেন সুদর্শন। তৎক্ষণাৎ ওকে নির্বাচন করে তালিকাভুক্ত করেছিলেন। মনিবের আদেশ পেয়ে রুদ্র শিকারি ঝাঁপ মারল রাধালগরের দিকে।

পাক্কা তিনদিন তিনরাত্রি নিশান বাউরির বউ বসত করেছিল বত্রিশভাগীর জঙ্গলে। নিশান বাউরি খুঁজে খুঁজে আলা। চারপাশে কান পাতলেই কত গুজব। অধিকাংশের ধারণা, ভোগ-টোগ করে নিয়ে কর্তাবাবু মেয়েটাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন। দু'দিন বাদে কে যেন খবর নিয়ে এল, হরিণমুড়ির পাড়ে কুকুরের দল মাটি আঁচড়িয়ে গর্ত করছে। নির্ঘাৎ পচা লাশের গন্ধ পেয়েছে ওরা। কেউ বলে, তারা শেষরাতে হরিণমুড়ির দিকে 'জলঘাট' বসতে গিয়ে রুদ্র শিকারিদের একটা ভারি কিছু বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছে। এইভাবে, বউকে নিয়ে তল্লাটে গুজব যখন পাখনা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে অগুনতি, বর্ষার বাদলা-পোকার মতো, ঠিক তখনি খুঁজতে খুঁজতে, বত্রিশভাগীর জঙ্গলের পোড়া মহুলের মগডালে বউকে খুঁজে পেয়েছিল নিশান বাউরি। বাজ পড়ে ঐ প্রাচীন মহুলের চুড়োখানা পুড়ে গিয়েছিল সেই কোন্ আদ্দিকালে। আজও এলাকার তাবৎ মানুষ বত্রিশভাগীর জঙ্গলের 'পোড়া মহুল' বলতে একডাকে চেনে। মাটির হাতি-ঘোড়া সাজিয়ে ভৈরবের থান হয়েছে সেখানে। পৌষ মাসের শনিবারে সেখানে জমজমাট পূজা হয়। মোরগ বলি দিয়ে মানত শোধ করে চারপাশের বাউরি-বাগদি, সজ্জন-চণ্ডাল। সেই গাছের মগডালে ঝাপুড়ঝুপা ডালপালার আড়ালে শরীর লুকিয়ে তিনদিন-তিনরাত বসে ছিল নিশানের বউ। যে শোনে সে আকাশে আচঁড় কাটে বিস্ময়ে। আরে, ঠাকুর-গাছে পা লাগিয়ে উঠলি তুই? ঠাকুর সইল্যাক? নিশানের বউ বলে, তখন কি অতশত বোধ-বুদ্ধি ছিল্যাক গ খুড়ি। তখন হল্যাক আমার 'জীবন যায় রে গোপী বেরা' আবেস্তা। শুধু ঠাগ্রের সুমুখে খাঁড়া হইয়ে বলল্যম, ঠাকুর, ইখন আমি তুমার আশ্রিত্। বাঁচালে বাঁচাও, মাইর্লে মার। বলেই তরতরাই উঠে গেল্যম গাছে।

'আরে, মাগী, তুয়ার ডর লাইগ্ল্যাক নাই?'

'সত্যি গ' খুড়ি, তখন ভয়-ডর, ক্ষিদা-তিষ্টা সব উধাও হইয়ে গেছল শরীল থিকে।'

নিশানের বউয়ের এবংবিধ বয়ান শুনে ভক্ত মানুযেরা গদগদ হয়। বলে, উ শালীর কী ক্ষ্যামতা, তিনদিন, তিনরাত, খাদ্যজল বিহনে বাঁচে। খাদ্য না হয় না-ই হইল্যাক, কিন্তু জল? এই ঘোর চৈতমাসে জল বিহনে তিনদিন, তিনরাত থাকা সোজা কথা বটে! শুনে, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত টানে চারপাশের মানুষজন। ঠাকুরই ওই তিনদিন ক্ষিদা-তিষ্টা হরণ করেছিলেন নিশানেব বউয়ের শরীর থিকে। ওই মাগীর কুনোই ক্যাদ্দানি নাই উয়াতে।

'ক্ষিদা-তিষ্টা না হউক, উ মেয়া ত ভালুকের হাতে মরতে পারত। জঙ্গলটার নাম কী? না, বত্রিশভাগী। আর কুন্ মাস? না, চৈত মাস। পুরা জঙ্গলটা যে পা কা মউলের গন্ধের ম-ম কইর্ছে হে। ভালুক গিজ্গিজ করছে যে জঙ্গলময়।'

'ঠাকুর যাকে বাঁচাবেক, ভালুক তার কী ছিঁড়বেক!' মন্তব্য করে কেউ ভক্তি গদগদ গলায়, 'ভালুক উয়াকে ছুঁবেক নাই।'

অবিশ্বাসীজন কেউ হয়ত মন্তব্য করেছিল, 'আসলে, বাজ পড়ার পর থিক্যে উ গাছে আর মউল ধরে না। ভালুক কী করত্যে যাবেক উ গাছের তলায়? মেয়াটা সেই কারণেই বাঁচল্যাক।' এ হেন অবিশ্বাসীকে সবাই মিলে এমন বাখান দিল যে তার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার জোগাড়। কিন্তু এসব ঘটেছে ধীরে ধীরে। অনেক পরের ঘটনা এসব। নিশানের বউ ততদিনে একটু একটু করে থিতু হয়েছে নিজের ঘরে। বউকে খুঁজে পাওয়ার পর পয়লা চটকায় তাকে ঘরে এনে তোলেনি নিশান। হপ্তা দুই রেখেছিল দাপানজুড়ি গাঁয়ে ওর পিসির বাড়িতে। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি যখন থিতোল, সুদর্শন সিংহবাবু এদিক থেকে নজর সরিয়ে জিহ্বা বাড়িয়েছেন রাধালগরের গগন ঝারমনিয়ার বউয়ের দিকে, এমন খবর নিশ্চিতভাবে পাওয়া গেল যখন, নিশান ধীরে ধীরে বউকে থিতু করেছিল নিজের ঘরে। প্রথম দিকে দিনের আলোয় ঘরের বাইরে বেরোত না বউ। ক্রমশ ভয়টা ভাঙল যখন, তখনই শুরু হল পাড়াপড়শীর এমনতর গবেষণা। সুদর্শন সিংহবাবু তখন গগন ঝারমনিয়ার বউটাকে একটু একটু করে গিলছেন।

ষোল আনা নির্ভয় হওয়ার পর নিশানের বউ তার তিনদিনের অরণ্যবাসকে নানা উপচারে মহিমান্বিত করে তুলবার জন্য হরেক গল্প শোনাতে লাগল। সুদর্শনের পাইক-বাহিনী নাকি দ্বিতীয় দিনেই খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল ওর। সন্ধ্যার আঁধারে নাকি সুদর্শন সিংহবাবু লোকলস্কর সহকারে হাজির হয়েছিলেন পোড়া মউলের তলায়। তাঁর কাঁধে নাকি ঝোলানো ছিল দোনলা বন্দুক। কিন্তু 'ভৈরব থানে'র কাছাকাছি আসতেই গাছের তলা থেকে এমন অবিশ্রান্ত পাথর বৃষ্টি হতে লাগল সুদর্শন ও তার বাহিনীকে লক্ষ্য করে যে পুরো দলটাই পিছিয়ে গেল বিশহাত। নিশান বাউরির বউ গাছের মগডাল থেকে সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে নাকি কলাপাতার মত কেঁপেছে সারাক্ষণ। হেনকালে পোড়া মউলের তলা থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় বলল, নিশানের বউ আমার আশ্রিত্। উয়ার গায়ে হাত দিলে তুয়ারা মুহে অক্ত উঠ্যে মইর্বি। দম বন্ধ করে সে কাহিনী শুনতে থাকে শালকাঁকির বাউরিপাড়া। দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকায়। নিশান বাউরির বউ রাতারাতি ঠাকুরের কৃপাধন্যা সিদ্ধা রমণীর মর্যাদা পেয়ে যায় পাড়া-পড়শীর চোখে।

যেদিন সকালে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা বলল নিশানের বউ, সেইদিনই আকাট দুপুরে রুদ্র শিকারির দল এসে শতজনের সুমুখ দিয়ে তুলে নিয়ে গেল ওকে। শালকাঁকির

বাউরিপাড়ার সেই দুপুরটার আলাদা কোনও রঙ ছিল না। শালকাঁকির কাঁকুরে ডাঙার ওপর তপ্ত তামাটে আকাশের এক কোণে গোটা কয় ডোমচিল চক্কর মারছে নিঃশব্দে, তালগাছগুলোর চূড়োয় কলসি বাঁধা আর চুয়ামসিনা গাঁয়ে বাবা কপিলেশ্বরের গাজনের বোল তুলছে ভক্তরা। রাধানগরের পার্শ্ববর্তী ঠাকুরপুকুর থেকে শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি তুলে নিয়ে ফিরছে ওরা কপিলেশ্বরের মন্দিরের দিকে। মাঝেমধ্যে আকাশ ফাটিয়ে বোল দিচ্ছে, বাবা কপিলেশ্বরের পূজা লাগে—বাবা পাতালফোড় মহাদেব—।

এর পরের ঘটনা নিশান বাউরি শুনেছিল একটু একটু করে নৈতন কাচারিঘরের দাসী-চাকরদের মুখ থেকে। রুদ্র শিকারির দল নিশানের বউকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল নৈতন কাচারিঘরের দোতলায়। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়েছিল মাষকলাইয়ের দানা। সন্ধেবেলায় সপারিষদ এসেছিলেন সুদর্শন সিংহবাবু। ঘরের এক কোণে ঢালাও ফরাস পাতা ছিল। ওঁরা সদলে মৌজ করে বসেছিলেন ফরাসের ওপর। নিশানের বউয়ের দিকে তাকিয়ে একচোট হেসেছিলেন সুদর্শন। বলেছিলেন, বুঝলি বাঁজা বউ, ইয়ার নাম কাগের দৃষ্টি। একটি চোখ দিয়ে বিশ্ব সংসারের সবকিছু ভাইল্ছে, অপর চোখটি তাক কর‍্যে রেখেছে শিকারের দিকে। এরপর নিশান বাউরির বউকে নগ্ন করে, খুলে দেওয়া হয়েছিল হাতে-পায়ের বাঁধন। লে, ইবার যত দৌড়াবি, দৌড়া। মাষ কলাইয়ের ওপর দৌড়োতে গিয়ে পা পিছলে নিশানের বউ বারে বারে আছাড় খেল মেঝের ওপর। সুদর্শন সিংহবাবু খলখলিয়ে হেসে ওঠেন এমন মজাদার দৃশ্য দেখে। বলেন, কী রে, সেবারে অমন দৌড় মের‍্যে পালালি, আর ইবারে দরজা কপাট হাট কর‍্যে খুলা, পালাতে লারছিস?

সে রাতে সবাই মিলে বারে বারে ধর্ষণ করেছিল নিশানের বউকে। ভুয়াশ গাছের কোটরে পেঁচাটা ভয়ে চুপ মেরে গিয়েছিল, পথচারী মানুষ এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিশান বাউরি রাতভর শুনেছিল এক অসহায় যুবতীর নিষ্ফল আর্তনাদ। কিন্তু ভোক্তা যেখানে স্বয়ং সুদর্শন সিংহবাবু, সেখানে টু শব্দটি করবার মতো বুকের পাটা দেখাতে পারেনি কেউই।

পরের দিন বেশি বেলায় কাচারিঘরের দোতলা থেকেই নামানো হল নিশান বাউরির বউয়ের ঝুলন্ত লাশ। নিজের শাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে দোতলার কড়িকাঠে ঝুলে পড়েছিল শেষরাতে। সুদর্শনরা তখন কড়া মদের নেশায় চুর হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন ওই ঘরেরই এক কোণে ফরাসপাতা মেঝেতে।

অনেকদিন যাবৎ একেবারে গুম মেরে ছিল নিশান বাউরি। কথাবার্তা বলত না কারও সঙ্গেই। খাওয়া-দাওয়া করত না ঠিক মতো। আর গভীর রাতে, পাড়াপড়শীরা কান এড়ে বহুবার শুনেছে, ঠিক বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অত বড় জোয়ান মানুষটা।

ধীরে ধীরে, অনেকখানি সময় নিয়ে, সামলে উঠেছিল নিশান বাউরি। পিসি জাপটা-জাপটি করল দিনরাত, আর একটা বিয়া কর্, বাপ। বংশটা রাখ্। কঁদা বাউরির মেয়াটা কলাগাছের পারা বেড়্যেছে। বেশ সাফা সুত্‌রা গায়ের রঙ। গায়গত্‌রেও বেশ ডগেরটি। বল্ তেবে, কথা কই। অনেক বলা কওয়ার পর প্রায় বছরটাক বাদে ফের বিয়ে করল নিশান বাউরি। তবে পিসির নির্বাচন করা ওই সাফা রঙের ডোগর মেয়াটিকে নয়। বিয়ে করল দাপানজুড়িরই ভরত বাউরির কুৎসিত কদাকার মেয়েটিকে। সরলা তার নাম। পচা পাঁকের পারা গায়ের রঙ, কেঁদ গাছের পারা শুক্‌না খসখইস্যা গা, উঁচকপালি, চিরণ-দাঁতি, পিসি ডুক্‌রে কেঁদে সারা হয়, সোনার তালটিকে ফেল্যে দিয়ে, কাদার ঢেলাটিকে গলায় বাঁধলি বাপ। চাঁদে আর মেনি-বাঁধরের পোঁদে। নিশান বাউরি বিড়বিড়িয়ে বলে,

চাঁদ লিয়ে আমি কী কইর্‌ব পিসি গ, আমার এই কুচ্ছিৎ মেয়াই ভাল। সিংহগড়ের কত্তাবাবু এ মেয়াব দিকে ঘুরেও ভাল্‌বেক নাই।

নিশান বাউরির সেই কুচ্ছিৎ বউয়ের পেটে পরীক্ষিত বাউরির জন্ম।

নিশান বাউরির প্রথমপক্ষের বউটা মরে বেঁচেছিল। কিন্তু নিশান বাউরিকে চিরতরে মেরে রেখে গেল। যতদিন সে বেঁচে ছিল, সুদর্শন সিংহবাবুর জাতক্রোধ তাকে সর্বদাই তাড়া করে বেড়িয়েছে। তার কারণ সম্ভবত তিনটি। এক, নৈতন কাচারিঘরে আত্মহত্যা করে নিশানের বউটা জনসমক্ষে বহুতই বেইজ্জত করে দিয়েছে সুদর্শনকে। দুই, কেসটা ধামাচাপা দিতে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে সিংহগড়ের তহবিল থেকে। তিন, নিশান বাউরি বেছে বেছে একটি কুচ্ছিৎ মেয়েকে বিয়ে করে পরোক্ষে একখানা থাপ্পড় লাগিয়েছে সুদর্শনের গালে। নিশান বাউরিকে তাই একদিনের জন্যও ক্ষমা করতে পারেননি সুদর্শন। যতদিন বেঁচে ছিল সুদর্শনের উগ্র রোষ নিশানকে সদাসর্বদা তাড়া করে বেড়িয়েছে তাঁর মৃত্যুর দিন অবধি, ঠিক যেমন করে বাউরিদের বর্শা তাড়া করে বেড়ায় তাদের নির্বাচিত শুয়োরটিকে, যতক্ষণ না শেষ প্রাণবায়ুটুকু বেরিয়ে যায় তার শরীর থেকে।

৫. নিশাকালে দক্ষযজ্ঞ

এ বেলায় লাবণ্যর বুঝি আসার সময় হল না।

ওর ছেলে এসেছে কাল রাতে। প্রিয়ব্রত। বড্ড নরম নাম, শঙ্করপ্রসাদের দেওয়া নাম, সুদর্শনের পছন্দ হয়নি।

গভীর রাতে সদর দেউড়ির ফটক খোলার শব্দ পেয়েছিলেন সুদর্শন। তখন বোঝেননি। সকালে রুদ্র শিকারি সঙ্গোপনে জানিয়ে গেছে, প্রিয়ব্রত এসেছে। দিনের আলোয় প্রিয়ব্রতর পক্ষে সিংহগড়ে ঢোকার উপায় নেই, সুদর্শন জানেন। রাতের বেলায়ও তাকে অতিশয় সঙ্গোপনেই আসতে হবে সুদর্শনের ঘরে। পাহাড়ের মতো জমাট একরাশ বিপদ ঘাড়ে বয়ে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সকালে সরযু এসেছিল সুদর্শনের ঘরে, লাবণ্যও এসেছিল, ওরা কেউই তো বলল না প্রিয়ব্রতর আসার খবর। কেন বলল না? ভয়ে? সঙ্কোচে? নাকি এটা ওদের এক ধরনের সতর্কতা? সুদর্শনকে কি ওরা বিশ্বাস করে না? প্রিয়ব্রতর আগমনবার্তাটুকু পেলে সুদর্শন কি লোক মারফত সেটা পুলিসকে জানিয়ে দিতে পারেন, এমন আশঙ্কা ওদের মনে? এটা ঠিক, কমিউনিস্টরা সুদর্শনের দু'চক্ষের বিষ। সারা জেলা জুড়ে ওরা যেভাবে দাপাদাপি জুড়েছে, তাতে করে ওদের যে কোন ক্ষতি করতে তাঁর বুক তিলমাত্র কাঁপবে না। কিন্তু প্রিয়ব্রতর ক্ষেত্রেও সুদর্শন তেমন কিছু করে বসবেন, এমনটা ওরা ভেবে বসতে পারল! প্রিয়ব্রতর কাজকর্মকে মনে প্রাণে অপছন্দ করলেও সুদর্শন যে ওকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন—সেটা তো ওদের জানা উচিত। অন্তত লাবণ্যর।

আগে, প্রিয়ব্রতর সেই বালক বয়সে, স্কুল-হোস্টেল থেকে বাড়ি এলে অন্তত একটিবার দাদুর মহলে আসত প্রিয়ব্রত। গল্প-গুজব করত খানিক। স্কুলের গল্পও শোনাত। লাবণ্যও একসময় পাশটিকে এসে দাঁড়াত। আস্তে আস্তে ভীষণ রকমের গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ব্রত। সুদর্শনের মহলে আনাগোনা কমে আসছিল তার। গোপনে পা টিপে টিপে সে কবে যে একটু একটু করে এগিয়েছে আগুনের কুণ্ডের দিকে সিংহগড় তা টেরই পায়নি। তারপরই তো সেই সর্বনাশা অষ্টমীর রাতে আচম্বিতে তার আগুনের কুণ্ডে ঝাঁপ দেবার খবর ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়। পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়ি থেকে শেষ রাতে তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিস। তারপর সারাটা কৈশোর, যৌবন, সে পোকার মত

মুহুর্মুহু ঝাঁপিয়ে পড়েছে একাধিক সর্বনাশা অগ্নিকুণ্ডে। বারংবার। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা যায়নি। বারংবার ধরা পড়ে জেলে গেল, কত নিপীড়ন সইল, জীবনের মূল্যবান সময়টাকে ভেঙে টুকরো টুকরো, চূর্ণ চূর্ণ করল, তবুও তার বোধোদয় হল না। আজও আগুন নিয়ে খেলছে সমানে। পুলিস ওকে তৃতীয়বার জেলে পোরার জন্য মরিয়া হয়ে খুঁজছে। একদিন ধরা পড়তেই হবে তাকে। জেলে যেতে হবে তৃতীয় বার। মেয়াদ তেমন বেশি হলে শেষ মুহূর্তে সুদর্শনের সঙ্গে চোখের দেখাটাও হবে না। হ্যাঁ, সুদর্শনের শরীরের ভেতর থেকে তেমনই সঙ্কেত ভেসে আসছে ইদানীং। দিন বুঝি শেষ হয়ে এল। যে কোনদিন শেষ ঘন্টা বেজে যেতে পারে। এ সময়ে প্রিয়ব্রত জেলে চলে গেলে, ফিরে এসে দোতলার কোণের এই ঘরখানা ফাঁকাই দেখবে। ভাবতে গিয়ে সুদর্শনের চোখের কোনা অজান্তে চিকচিকিয়ে ওঠে।

এ সংসারে অনেকের মতো, অনেক কিছুর মতো, প্রিয়ব্রতও সুদর্শনের কাছে এক মূর্তিমান প্রহেলিকা। সুদর্শন বুঝে উঠতে পারেন না, বারংবার আগুনের কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো সাহস এবং তেজ প্রিয়ব্রত পেল কোত্থেকে, যার শরীরে কিনা বইছে নিতান্তই এক নিরীহ, নির্বিরোধী পুরুত বামুনের রক্ত।

কতদিন বাদে যেন ঘরে ফিরল প্রিয়ব্রত? মাত্র দু'তিন মাস আগে এসেছিল সে, তবুও মনে হয়, কতদিন যেন তাকে দেখেননি সুদর্শন! রুদ্র শিকারি মারফত তার আগমনবার্তা শোনা অবধি তিনি উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেছেন সারাদিন। একবার, একটিবার প্রিয়ব্রত এক লহমার জন্যও এসে দাঁড়াবে তাঁর সুমুখে। অন্তত, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখবার বাসনাও তো হয় মানুষের। পুরাকীর্তি তো সব মানুষকেই টানে। কিন্তু সারাটা দিন কেটে গেল, প্রিয়ব্রত এল না। সুদর্শন ভেবেছিলেন, দিনের বেলায় লাবণ্য হয়ত তাকে লুকিয়ে রেখেছে, আড়াল করে রেখেছে হাজার কৌতূহলী দৃষ্টির থেকে। বিশেষ করে, সিংহগড়ের লাগোয়া যে বিষধর সাপটি সপরিবারে বিষ ওগরাচ্ছে অবিরাম, সেই প্রতাপলাল ও তার ছেলে হরবল্লভের চিল-নজরকেই ভয়টা বেশি। সর্বদা ওত পেতে রয়েছে। প্রতাপলাল কিংবা তার ছেলে হরবল্লভ জানতে পারলে, প্রিয়ব্রতব চরম ক্ষতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। লাবণ্যর এই সতর্কতাটুকু তাই, সুদর্শনের মতে, স্বাভাবিক। কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় সূর্য নিভল। আঁধার নেমে এল সিংহগড়ে। কই, প্রিয়ব্রত তো একটি বারের তরে এল না।

তবে কি লাবণ্য বাস্তবিকই তার ছেলেকে সুদর্শনেরও নাগাল-নজরের বাইরে রাখতে চায়? বাস্তবিকই কি সুদর্শনকে ওরা মনে মনে সন্দেহ করে? এও কি সম্ভব।

এটা ঠিক, তেরশ সাতচল্লিশের সেই সর্বনাশা অষ্টমীর রাতে, পুলিস যে যাত্রাগানের আসর থেকে উঠে গিয়ে আচম্বিতে হানা দিয়েছিল পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়িতে, তার গুহ্য কারণ ছিল। আর কেউ নয়, হরবল্লভই পুলিসকে খবরটা দিয়েছিল। অথচ সুদর্শনের তিল তিল বিশ্বাস হয়েছে, সরযু, শঙ্করপ্রসাদ, লাবণ্য এমনকি প্রিয়ব্রত নিজেও এ ব্যাপারে সুদর্শনকেই সন্দেহ করে। ওই সন্দেহের কাঁটাখানি বুকে বিঁধিয়ে রেখেছে আজ এক যুগ। অথচ সে রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, আজ এতদিন বাদেও চোখ বুজলেই স্পষ্ট দেখতে পান সুদর্শন। চোখের সুমুখে ভোজবাজির মতো উদয় হয় চুয়ামসিনা ও শালকাঁকির মধ্যবর্তী পুরো ডাঙা এলাকা জুড়ে গভীর নিশাকালে সেই দক্ষযজ্ঞের দৃশ্যখানি। কানে ভাসে, সারা ডিহি জুড়ে চিল-চিৎকার। অনেক আর্তরব। কোলাহল। রোগাশোগা ঠ্যাং বাগিয়ে অনেক মানুষ ছুটে পালাচ্ছে অন্ধকারে মধ্যে। প্রাণভয়ে। বুড়া-বুড়ি, মেয়ে-মদ্দ, ছগরা-

জুয়ান---সব এলোপাতাড়ি ছুটছে। সে রাতে বাঘ হুঁকরেছে গাঁয়ে। পেছন থেকে খেদাড় দিয়ে আসছে মানুষগুলোকে। একটা নয়, দুট্টা বাঘ। একটা বুড়া, একটা বাচ্চা। হোক বাচ্চা, তারই বা গর্জন কম কী! যত হোক, বাঘের বাচ্চা তো।

আঁচড় কামড় খেয়েছে অনেকে। রক্ত চুঁয়াচ্ছে কারও পিঠে। অন্ধকারে ক্ষতস্থান জ্বলছে। কিন্তু জ্বলনটা চাখবার সময় নেই তখন। আগে তো আইজ্ঞা প্রাণটা বাঁচাই। বটে কি না? দু'চারজন বুড়া-বুড়ি, আঁধার-কানা মানুষ তাড়াসে ছুটতে গিয়ে পা হড়কে পড়েছে কাঁকুরে ডাঙায়, কিংবা সোঁদাল গাছের ঝোড়ের মধ্যে, কুচলা গাছের মরা ঠুঁটে হুঁচোট খেয়ে বুড়া আঙুল থেঁতলে গেল, ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে, তড়িঘড়ি উঠে ফের দৌড়। এলোমেলো ছুটতে গিয়ে ছৈতার কাছা খুলে গিয়েছে কারও, গুঁজে নেবার সময় নেই। বাঁ-হাতে কাছা বাগিয়ে দৌড়ুচ্ছে। কাছা গুঁজবার আইজ্ঞা টাইম মিলবেক পরে। পরাণটা তো বাঁচুক আগে। পরাণটা বাঁইচ্‌লে আইজ্ঞা বাপের নাম।

ডিহিটা বিশাল। অর্ধগোলাকার তার গড়ন। পুরোটাই উঁচালি-নিচালি মাকড়া পাথরের নির্মাণ। মাঝেমাঝে পলাশের ঝোড়। এই ডিহিটাই চুয়ামসিনাকে তার চারপাশের বাউরি-বাগদি আদিবাসীদের পাড়া থেকে পৃথক করে রেখেছে। ডিহির ওপারে হরিণমুড়ির তীর ঘেঁসে সিংহবাবুদের দু'তরফের বিশাল গড়। গড়েব মধ্যে পরপর দু'খানা মহল। নিশুত অন্ধকারের দুনিয়ায় তখন ওই গড় দুটিতেই দিনের পারা আলো। দশ-বিশটা ডে-লাইট, বিশ-পঞ্চাশখানা 'হ্যাচাক' জ্বলছে দু'মহলেই। আঁধার ভেঙে খানখান। সেই আলোর মধ্যে এক মহাসমারোহ। মানুষগুলো ওই আলো নিশানা করে পোকার মত ছুটছে। লোক তো নয়, পোক। কে আগে গড়ের মধ্যে সেঁধাতে পারে, তারই প্রাণপণ মহড়া। জলকুলি ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে মানুষ । দড়াম দড়াম আছাড় খাচ্ছে। উঠেই তৎক্ষণাৎ ফের ছুটছে। মহাষ্টমীর মধ্যরাতে সারা ডিহি জুড়ে চলছিল জোড়া বাঘের খেলা।

৬. প্রলয় রাতের অতিথি

প্রিয়ব্রতকে যতই দেখেন ততই সুদর্শনের বিস্ময়ের পারদখানি হু-হু বেড়ে যায়। সেই কচি বয়েস থেকে তার হীরের কুচির মতো চোখের তারায় তিনি স্পষ্টতই অন্য কারও ছায়া দেখেছেন। শঙ্করপ্রসাদের শীতল শিষ্টতা নয়, প্রিয়ব্রতর হাঁটাচলা, কথা বলবার দৃপ্ত ভঙ্গিতে অন্য একজনের প্রগাঢ় ছাপ দেখে হতবাক হয়ে যান সুদর্শন। চকিতে মনে পড়ে যায় সেই এক রাত্রির কথা। যার খুঁটিনাটি অনুপুঙ্খ আজও সুদর্শনের স্মৃতিতে বড়ই জীবন্ত। সেটা বোধ করি তেরশ একুশ কি বাইশ সাল।

সে বড় দুর্যোগের রাত। বাইরে প্রলয় চলেছে যেন। মেঘে মেঘে দাঁত কিড়িমিড়ি। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে দশদিক, চরাচর কাঁপিয়ে। হরিণমুড়ির দিক থেকে মাতালের মতো হাওয়া বইছে। বাতাসের সোঁ সোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগে বুঝি। মনের মধ্যে এক ধরনের চাপা অথচ তীব্র আশঙ্কা ঘুমটাকে গাঢ় হতে দেয় না।

সদর দেউড়িতে কারা যেন কথাবার্তা বলছে। হাওয়ায় সব কথা উড়িয়ে নিয়ে গেলেও দু-চারটে খুচরো শব্দ কানের কাছে আলতো বেজেই মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু ঘটেছে।

এই দুর্যোগের রাতে লগদীগুলোর নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার কথা। তার বদলে ওরা কার সঙ্গে এমন উত্তেজিত গলায় কথা বলছে! এক সময় শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ান সুদর্শন। তীব্র অন্ধকারের মধ্যেও চোখ চারিয়ে দেখবার চেষ্টা করেন দৃশ্যখানা। কিছুই দেখা যায় না স্পষ্ট করে। বিঘৎখানিক দূর থেকেও সব পুরু অন্ধকারে ঢাকা।

অকস্মাৎ ঝলাক ঝলাক করে বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকায়, আলোটুকু সামান্য দীর্ঘায়িত হয়, এবং সেই আলোয় সুদর্শন দেখতে পান, লগদীগুলো কিছু একটা বস্তুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে প্রবল বাদানুবাদে মত্ত।

গমগমে আওয়াজ তুলে রুদ্র শিকারিকে হাঁক পাড়েন সুদর্শন, 'রুদ্রা—।'

মালিকের গলার আওয়াজ শুনে আচমকা কথাবার্তা থেমে যায় লগদীগুলোর।

'হুজুর—।' রুদ্র শিকারি সদর দেউড়ি থেকে লম্বা সাড়া দেয়।

'কী হয়েছে? কার সাথে কথা বলছু?'

'একটা লোক আইস্তা।'

লোক! সুদর্শন বিস্মিত। এই প্রবল ঝড়-ঝাপটার রাতে চোর-ডাকাতেও বেরবে না ঘর ছেড়ে, এমন অসময়ে কে এল!

বলেন, 'কে লোক? কী চায়?'

ওদিক থেকে কোন জবাব আসে না। খুব সম্ভব মালিককে কী জবাব দেবে, বুঝে উঠতে পারছে না লগদীগুলো। কেমন অস্বস্তি জাগে মনে। সনাতনের দিকে তাকান সুদর্শন। সারাদিন, সারারাত, চব্বিশ ঘন্টা সনাতন কাছে কাছে থাকে। এক মুহূর্তও সুদর্শনকে চোখের আড়াল করে না। রাতের বেলায় তাঁর শোবার ঘরের দরজার পাশটিতে শুয়ে থাকে। সুদর্শনকে বেরিয়ে আসতে দেখেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে, চলে এসেছে পাশটিতে, 'কী হয়্যেঁছে হুজুর?'

সুদর্শন বলেন, 'যা তো নিচে একবার, দেখ্যে আয়, ব্যাপারটা কী?'

বাঁ হাতে চৌকো লন্ঠন আর ডান হাতে লাঠি বাগিয়ে সনাতন একের পর এক খিল খুলে এগোতে থাকে সদর দরজার দিকে।

সে রাতে সুদর্শন খাস অন্দর মহলেই ছিলেন। রোজ তো এক ঘরে থাকেন না। এই গোলকধাঁধার মতো প্রাসাদের কোন্ ঘরে তিনি রাত্রিবাস করবেন, তা তিনি স্বয়ং ছাড়া আর কেউই জানে না। সরযুও না, কৃষ্ণদাসও না। একেবারে শেষ মুহূর্তে কেবল সনাতন জানতে পারে। ওকে জানাতেই হয়। যে জায়গাতেই থাকেন না কেন সুদর্শন, ওঁকে সারাক্ষণ ছায়ার মতো অনুসরণ করে সনাতন, দৃষ্টির খাঁচায় আগুলে রাখে।

ফি-রাতে অমন শয্যা বদলের কারণগুলো অবশ্যই জটিল। সর্বসাধারণের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। আর, কোন কথা ষোল আনা বোধগম্য না হলেই মানুষ আন্দাজে ঢিল মারে। দুর্বোধ্যতার শরীরে তা দিয়ে দিয়ে হরেক কিসিমের বাচ্চা পয়দা করে। সুদর্শনের দৈনন্দিন কক্ষবদলের ব্যাপারেও তাই নানান মুনির নানান মত। কেউ বলে, ভয়ে। নিদারুণ আতঙ্কে। আজীবনকাল বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে লোকটা। আর, ধূলায় লাথ মাইর্‌লে ধূলাও লম্ফ মারে আকাশে, মানুষ তো আইস্তা দু'হাত দু'পাওয়ালা জীব। প্রতিহিংসা তার রক্তে। তেমন ঘটনা তো এলাকার মানুষের স্মৃতিতে একেবারেই ঝাপসা হয়ে যায় নি। বিশ্বেশ্বর সিংহবাবুর মরণটাতো মনে আছে এলাকার সব্বাইয়ের।

বিশ্বেশ্বর সিংহবাবু। সুদর্শনের ঠাকুরদা পরমেশ্বর সিংহবাবুর ছোটভাই। আজন্ম উগ্রতেজা মানুষ। বিয়ে-থা করেন নি। শুধু পুরো তালুক চষে বেড়িয়ে ফুলেফুলে মধু খাওয়াতেই ছিল তাঁর অপার আনন্দ। জীবনে বহু মানুষের ঘর ভেঙেছেন বিশ্বেশ্বর। বহু সংসার ভেসে গিয়েছে তাঁর কামানলে। একদিন, সুদর্শনের তখন পাঁচ-ছ বছর বয়েস, সিংহগড়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হল। এবং মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়েসে, সেই ঘোর অমাবশ্যার রাতে, ডাকাতের হাতে মরলেন বিশ্বেশ্বর। লড়তে

গিয়েই মরলেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল মানুষের একান্ত-মন্তব্য, না লড়লেও মরতেন। কারণ, ডাকাতি কইর্‌তে আসে নাই উয়ারা, এসেছিল বিশ্বেশ্বরকে মারতে। কথাটা এখনও অবধি সিংহগড়ের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। সে রাতে ডাকাতির ছদ্মবেশে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে কোনও লাঞ্ছিত মানুষ। ডাকাতদের আচার-আচরণের মধ্যেই নাকি তেমন লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কারও কারও মধ্যে কোন কিছুর সংক্রমণ অধিক মাত্রায় ঘটে থাকে। সম্ভবত সুদর্শনের মধ্যে তেমন কোনও সংক্রমণ-জনিত আতঙ্ক পাকা রঙ নিয়ে ফেলেছে। এমন ধারণা তিলতিল বদ্ধমূল হয়েছে যে, অত্যাচারিত মানুষজনের মধ্যে কেউ কেউ অন্তরালে তাঁর প্রাণনাশে তৎপর ও সক্রিয়। অন্তত দু'জনের কাছ থেকে যে কোনও মুহূর্তে চোরা গোপ্তা আক্রমণ আশঙ্কা করেন তিনি। একজন চন্দ্রকান্ত আচার্য, অপরজন নিশান বাউরি। মুখে অবশ্যই এসব কথা স্বীকার করেন না সুদর্শন। বলেন, সিংহবাবুরা ছুঁচো-ইঁদুরদের ডরায় না। আসলে, স্রেফ মুখ বদলানোর উদ্দেশ্যেই ফি-রাতে আমার এই কক্ষ বদল, শয্যা বদল। রসিক মানুষজন এমন মন্তব্যের ওপরে এক পোচ অন্য রঙ চাপায়। হাঁ-ঠিক কথা বলেছেন সুদর্শন। মুখ বদলানোর উদ্দেশ্যেই প্রতি রাতের এই শয্যা বদল। কারণ, শয্যা তো শুধু শয্যাই নয়, শয্যা সঙ্গিনীরও বদল ঘটে তাতে। সেটাই আসল।

অন্দরমহল থেকে সদর দেউড়ি অবধি যেতে হলে অন্তত পনেরখানা ভারি দরজা খুলতে হবে, পেরোতে হবে মহলের পর মহল। ঝিপঝিপে বৃষ্টির মধ্যে একের পর এক দরজা খুলে এগিয়ে চলেছে সনাতন। তার লণ্ঠনের আলো এঁকে বেঁকে এগোচ্ছে, ক্রমশ ছোট হচ্ছে আলোকিত বৃত্ত, আলোর পরিমাণও হচ্ছে ক্ষীণ। সুদর্শন দোতলার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে সনাতনের চলে যাওয়া দেখছিলেন, কখন সরযু এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, খেয়াল করেননি।

সরযু নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল। বৃষ্টির ঝাপসা পর্দাখানি ভেদ করে তার দৃষ্টিও বিঁধে রয়েছে সদর দেউড়িতে। বিদ্যুতের আলোয় থমথম করছে ওর মুখ। সারা গায়ে, মুখে, চুলে, বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। ওর হুঁশই নেই তাতে। সরযুর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন সুদর্শন। সরযু কিন্তু স্বামীর দিকে তিলমাত্র তাকায় না। তার চোখের তারাদুটি নিষ্কম্প প্রদীপের মতো দেউড়ির দিকে স্থির। ওর ওপর সুদর্শনের ধারাবাহিক দৃষ্টিপাত সরযুর মধ্যে সামান্যতম চঞ্চলতা আনে না, ওকে তিলমাত্র স্পর্শ করে না তা। অন্ধকারের মধ্যেও সুদর্শন টের পান, বুঝতে পারেন, সরযু সেই মুহূর্তে কিছুই দেখছে না। কোনও বিশেষ বস্তু, বৃষ্টি, আকাশ, সদর দেউড়ি, কোন কিছুর ওপর দৃষ্টিখানি তিলমাত্র নিবদ্ধ নেই। সে এখন তার দৃষ্টিখানিকে ভাসিয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। তুমুল ঝড়ের মধ্যে যেমন পাখি, ডানা ঝাপটে সরযুর দৃষ্টিখানিও তেমনই উড়ে বেড়াচ্ছে বিপর্যস্ত হয়ে। খ্যাপা হাওয়ায় বেসামাল হয়ে বারবার ফিরে আসতে চাইছে সরযুর চোখের খাঁচায়। বড় বেশি পোষা, বাধ্য, সরযুর দৃষ্টিখানা। কোন্ গভীরে শুয়ে থাকে সে দৃষ্টি, খাঁচার কোন্ অন্দরে, সুদর্শনও বুঝি তার কূল-কিনারা পান না। মাঝে মাঝে নিজের দৃষ্টিখানিকে এমনিই হাওয়ায় ছেড়ে দেয় সরযু, উড়িয়ে দেয়। বুঝি মুক্তি দেয় ক্ষণিকের জন্য। কাগজের নৌকার মতো ভাসিয়ে দেয় আকাশের নীল-যমুনায়। খুশিমতো অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে, ভেসে ভেসে সে দৃষ্টি আবার ফিরে আসে খাঁচায়, আর সরযু সঠিক মুহূর্তে চোখের দু'পাতা এক করে বন্ধ করে দেয় খাঁচার দরজা, দু'চোখে কেবল ঝুলে থাকে বড় সড় একজোড়া অশ্রুর ফোঁটা, অল্প গড়িয়ে কপোলের কাছাকাছি ঝুলে থাকে, যেন শেকলসহ তালা ঝুলছে ওই পাখির খাঁচার জোড়া-দরজায়। খাঁচা, খাঁচা।

পাখিদের ওড়াউড়ির জন্য শুধু একখানা আকাশ হলেই চলে, কিন্তু দৃষ্টিকে ওড়াবার জন্য শুধু একখানা আকাশই যথেষ্ট নয়। আলোও চাই। আকাশ যদি নদীর খাত হয়, আলো তবে ঐ খাতে ভর্তি টলটলে জল। জল ছাড়া যেমনি শুকনো খাতে নৌকো ভাসে না, আলো ছাড়াও তেমনি দৃষ্টি ছোটে না, ভাসে না, ওড়ে না। এখন এই নিঃসীম অন্ধকারে অধিক দূরে গিয়ে ওড়াওড়ি করবার উপায় নেই। উপায় নেই, উড়তে উড়তে কোনও নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর গিয়ে বসবার। কেবল, ঝলাক ঝলাক বিদ্যুতের আলোয় অল্পস্বল্প ওড়াউড়ি করে, কাছাকাছি ওখানে-ওখানে দু'এক দণ্ড বসে আবার ফিরে আসা, কোটরের খাঁচায়। কিন্তু সরযু নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে দেউড়ির দিকে। সে এখন দৃষ্টিকে কিছুতেই ঢুকতে দিতে চায় না খাঁচায়। বরং সহনীয় দূরত্বের বাইরে, অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে দেয় দৃষ্টি, একেবারে দিগন্তের কাছাকাছি, যেখানে ঝলাক ঝলাক বিজলির আলোয় মেঘেরা বিচিত্র রঙ ধরে, রূপ ধরে, যেখানে কালো কালো গাঁয়ে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা তালের সারি প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। আকাশ জুড়ে মেঘের খেলার কাছাকাছি সরযু ভাসিয়ে বেড়ায় ওর দৃষ্টি। আসলে, দৃষ্টির সাথে সাথে তার বুকের ভেতর থেকে মানুষটাও যে ছুটে চলে যায়। চলে যায়, চলে যায়।

সেও বুঝি সরযুর এক দুর্লভ লাভ। শুধু দৃষ্টিটাই নয়, মানুষটাও যে খাঁচায় নিরন্তর বন্দী। সেও যে মাঝে মাঝে ছুটি চায়, মুক্তি। শরীরটাতো এক অর্থে জেলখানাই। চোখদুটি যেন ফটক। চোখের ফটক বন্ধ হলেই ভেতরের সব আলো নিভে যায় মুহূর্তে। তখন বুকের মধ্যে অন্ধকার নির্জন ফাটক, বন্দীশালা। সেখানে অনেক ভয়, শঙ্কা,—স্বামীর জন্য, আত্মজার জন্য। অনেক অপমান, ক্লান্তি ও ক্লেদ নামক অতৃপ্ত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে নির্জন বসবাস।

'মা মাগো—।' ঘরের ভেতর থেকে লাবণ্য অস্ফুট গলায় ডেকে ওঠে।

ঘরের মধ্যে এক জোড়া ঢাউস পালঙ্ক। একটাতে দশ বছরের লাবণ্যকে নিয়ে সরযু শোয়। অন্যটা কোন কোনদিন ফাঁকা থাকে, কোনওদিন সুদর্শন শোন।

লাবণ্যর ঘুম ঘুম ডাকে যেন ঘুম ভেঙে যায় সরযুর। সাড় ফিরে আসে। দৃষ্টিখানা উড়তে উড়তে ফিরে আসে। খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়। সরযু পায়ে পায়ে ফিরে যায় ঘরে। বাইরে তখন ঝড়ের মাতন খানিকটা কম।

সনাতন লণ্ঠন দুলিয়ে ফিরে আসছে। হাঁটাটা তত ছন্দোবদ্ধ নয়। ঈষৎ চঞ্চল পদক্ষেপ। কিছু একটা ঘটেছে।

সনাতন দোতলায় উঠে আসে। সুদর্শনের থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়ায়। কিছু একটা বলবার জন্য উসখুস করতে থাকে। সুদর্শন ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। ওর সারা শরীর বেয়ে টসটসিয়ে জল ঝরছে। ঠকঠকিয়ে কাঁপছে লোকটা।

সুদর্শন ওর কষ্টটা দেখেও দেখেন না। ভ্রু কুঁচকে শুধোন, 'কী হচ্ছে উখ্যেনে?'

'একটা ছগরা, হুজুর।' সনাতন ঈষৎ চাপা গলায় জবাব দেয়।

'ছোকরা।'

'হুঁ, আইজ্ঞা। ভদ্দর ঘরের ছগরা। কাক-ভিজা হইয়ে কাঁপছ্যে শীতে।'

সুদর্শনের মনের মধ্যে চাপা বিস্ময় ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। এই প্রলয়ের রাতে কে ও? কেনই বা এসেছে এই সিংহগড়ের সদর দুয়ারে? কী চায়?

লণ্ঠনের মৃদু আলোটুকু হাওয়ায় নাচছিল। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের ছায়াটাও। ছায়াখানি দেখতে দেখতে সুদর্শন গভীর ভাবনায় তলিয়ে যান। এক সময় পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকেন সিঁড়ি ভেঙে। সনাতন পলকের মধ্যে একখানা ছাতা তুলে নিয়ে দৌড়তে থাকে সুদর্শনের পেছনে।

সদর দেউড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই লগদিগুলো সিধে হয়ে দাঁড়ায়। রুদ্র শিকারি, এ বাড়ির সর্দার-পাইক, হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

লগদীদের কালো কুচকুচে শরীরগুলোর ঠিক মধ্যিখানে আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবশিশুর মতো সুঠাম এক যুবক। বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় সুদর্শন মুহূর্তের তরে প্রত্যক্ষ করেন সে রূপ। টকটকে ফরসা রঙ, সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, মেদহীন অথচ রুক্ষ্ম নয়। অল্প তফাত থেকে ওর শরীরের ওপর দৃষ্টি বুলোতে বুলোতে সুদর্শন ওর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ওর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালের মধ্যে। সনাতন একহাতে ছাতা ধরেছে সুদর্শনের মাথায়, অন্য হাতে লণ্ঠনখানি তুলে ধরে ওপরে।

পরনে সাধারণ ধুতি, সস্তা ছিটের সার্ট। জলে-কাদায় সপসপে, নোংরা, গায়ের সঙ্গে লেপটে একাকার। এক মাথা কোঁকড়ানো কালো চুলের ডগা বেয়ে কপাল বরাবর জলের ক্ষীণ ধারা। সদ্য উঠতি কালো গোঁফের তলায় পুষ্ট এক জোড়া লালচে ঠোঁট, স্থির, দেমাকে কঠিন। সুদর্শন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন ছেলেটিকে। ওর উজ্জ্বল একজোড়া চোখও ততক্ষণে জবিপ করতে শুরু করেছে সুদর্শনের শরীর।

রুদ্র শিকারির মুখ থেকে ঘটনাটা শোনা গেল।

প্রয়াগ বাগদি মাঝ রাতে সদর দরজা খুলে বেবিয়েছিল প্রাকৃতিক প্রয়োজনে। তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাওয়ার ঝাপটাও ছিল খুব। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। চারপাশের গাছগাছাল মাতাল হয়ে টলছিল দু'ধারে। আচমকা বিজলির এক ঝলক আলোয় নজর পড়ল, শিব মন্দিরের পাশে বেলগাছটার তলাতে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়। বিজলির আলোটা নিভে যেতেই ঘুরঘুট্টি আঁধার। সেই আঁধারটুকুর মধ্যে প্রয়াগ বাগদি তীরবেগে ছুটে গেল বেলগাছটাকে নিশানা করে এবং পরবর্তী বিদ্যুতের আলোয় দেখামাত্রই ছেলেটাকে জাপটে ধরল শক্ত হাতে। আর, প্রয়াগ বাগদির এক জোড়া সাঁড়াশির থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে এমন ক্ষমতাবান মানুষ জন্মায়নি এই রাঢ়ভূমে।

অনেকক্ষণ ধরে ছেলেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সুদর্শন। ওর চোখ-মুখ, কপাল, চিবুক, ঠোঁট, সব কিছুই পরীক্ষা করলেন আলাদাভাবে। নির্বিকার দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটা। ঠোঁটজোড়া পরস্পরের গায়ে চেপে বসছিল বারবার। লণ্ঠনের চেরাচেরা আলোর রেখা বর্শার ফলার মতো ছুঁয়ে যাচ্ছিল ওর মুখ।

'কে তুমি? নাম কী তোমার?' গম্ভীর রাশভারি গলায় শুধোন সুদর্শন।

ছেলেটি জবাব দিল না প্রথমবারে। তার বদলে সুদর্শনের চোখে সরাসরি চোখ ফেলল। তারপর বেশ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'অরিজিৎ।'

সুদর্শন পলকহীন চোখে দেখছিলেন ওকে। নামটা শোনামাত্র তাঁর চোখের মণিতে চাপা বিদ্যুৎ চমকায় বুঝি। ছেলেটা তাই দেখে আরও শক্ত করে নেয় সারা মুখের পেশী।

খানিকবাদে পিছু ফিরলেন সুদর্শন। হাঁটতে হাঁটতে সনাতনকে হুকুম দিলেন, 'উয়াকে সদর মহলের একটা ঘরে বিছানা পেইতে দে। শুকনা কাপড়-চুপোড় দে। আর, কিছো খাবারদাবার এইন্যে দে ভিতর থিকে।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্দরের দিকে হাঁটতে থাকেন সুদর্শন। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। মেঘলা আকাশ, ক্লান্ত, থমথমে। রাতও শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকারটা ফিকে লাগছে চালধোওয়া জলের

মতো। সহসা একতলা থেকে মাথার ওপর চোখ তুলে তাকাতেই সুদর্শনের দু-চোখ আটকে গেল। দোতলার ঝুল-বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরযু। একখণ্ড শ্বেতপাথরের মতো স্থির। স্থির, স্থির।

৭. শালকাঁকির ডাঙায় জোড়া বাঘের খেলা

তেরশ সাতচল্লিশের দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর সেই রাতটা। শালকাঁকির ডাঙায় মধ্যরাতে চলেছিল জোড়া বাঘের খেলা।

চুয়ামসিনার সিংহগড়ের দুর্গাপূজার খ্যাতি চারপাশের দশ-বিশটা গাঁয়ে সুবিদিত। দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবুর আমল অবধি একটা পূজাই হত। দেবী বিগ্রহের নাম ছিল দশভুজা। তাঁর অন্তে এক পূজা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবুর ছিল দু'ছেলে। সুদর্শন ও প্রতাপলাল। সুদর্শনের কোনও ছেলে নেই। একমাত্র মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন মশিয়াড়ার শঙ্করপ্রসাদ মহাপাত্রের। ঘরজামাই রেখেছিলেন শঙ্করপ্রসাদকে। প্রতাপলালের একটি মাত্র ছেলে হরবল্লভ। দ্বারিকাপ্রসাদ মৃত্যুর আগেই সিংহগড়কে দু'ভাগ করে দু'ছেলের বসবাসের উপযোগী করে যান সুচারুভাবে। এমন কি প্রতাপলালের মহলে দেবী সিংহবাহিনী এবং রাধাবল্লভের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাবেক মন্দিরের আদলে আরও এক জোড়া মন্দির গড়ে দিয়ে যান। দ্বারিকাপ্রসাদের মৃত্যুর পর থেকেই তাই দু'মহলে চলছে আলাদা দোল-রাস-দুর্গোৎসব।

বলতে কি, এই সব পুজো নিয়ে দু'মহলের চিরকেলে রগড়গুলি দেখার মতো। দু'মহলের মানুষগুলো সারা বছর আদায়-কাঁচকলায়। পূজা-পার্বণকে কেন্দ্র করে সে তিক্ততা বেড়ে যায় বহুগুণ। শুধু মহালয়ার ঢাকে কাঠি পড়লেই হল। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই দু'মহলের চর ঘোরে আনাচেকানাচে। সুলুকসন্ধান নিতে থাকে।

—উঁয়ারা হুজুর যাত্রা আনছেন এগরা বালিঘাই থিক্যে। ধাওয়া-পার্টি।

—বটে, বটে! তো যাও হে নিশিকান্ত। তুম্ম গুমগড় রওনা দাও এক্ষুনি।

—উয়ারা হুজুর গুমগড় গেলেন।

—বটে! ও কৃষ্ণদাস, সাত মাইল যাও হে। সাত মাইলের 'সত্যকালী অপেরা'য় সুধাংশু পণ্ডা, গোপী পণ্ডা সব রয়েছে। ঝামা ঘইস্যে দিব্যেক গুমগড় পার্টির মুহে। উয়ারা মেড় আনছে কুখিকে? খবর লাও। কুথাকার ঢাকী আইছে?

এইভাবে পরস্পরকে টেক্কা দিতে দিতে দু'পক্ষের আয়োজন এগোয়। একপক্ষ এক পা হাঁটলে, প্রতিপক্ষ দু'পা হাঁটে।

অষ্টমীর 'খ্যান' বুঝে কামান দাগা হয় বিষ্টুপুরের রাজ দরবারে। 'জলঘড়ি' জানান দেয় সন্ধিপূজার ক্ষণ। চুলচেরা মুহূর্ত। ঠিক সময়ে রাঢ়ের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে ওঠে মল্লরাজাদের কৌলিক কামান। সঙ্গে সঙ্গে একটি চালকুমড়ো বলি হয় বিষ্টুপুরে, মা সর্বমঙ্গলার থানে। শুরু হয় সন্ধিপূজা।

তো, তেরশ সাতচল্লিশের সেই মহাষ্টমীর রাতে বিষ্টুপুর দরবারে কামান দাগা হল। বত্রিশভাগীর জঙ্গলের সবচেয়ে উঁচু চাকোল্‌তা গাছটাতে চড়ে বসেছিল রুদ্র শিকারির ব্যাটা কালো শিকারি। কামান দাগার আওয়াজ শুনে পলকের মধ্যে লাকড়ায় কাঠি দিয়েছে। ড্রিম, ড্রিম, ড্রিদিম—ড্রিম।...লাকড়ার বাদ্যি শোনামাত্তর সিংহগড়ের দু'মহলে শুরু হয়েছে অষ্টমীর 'খ্যান'-এর পূজা। সারা রাঢ়ভূমিতে ওই গভীর নিশাকালে কত এলাকার কত মানুষ যে কামানের গর্জন শোনার

উদ্দেশ্যে গাছে চড়ে বসে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই অষ্টমীর রাতে দুই গড়েই উৎসবের প্লাবন লেগেছিল। হোমরা চোমরা বাবু-ভায়ার দল নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন দু-তরফেই। চারপাশের আট দশখানা গাঁয়ের ভদ্দর-সজ্জন, ইতর-চণ্ডাল, সে রাতে কোনও বাড়িতেই হাঁড়ি চড়বার রেওয়াজ নেই। ভদ্দর-সজ্জনরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসবেন। তা বাদে, চারপাশের বাউরি-বাগদি, লোহার মাদোড়রা সব পাড়া ঝেঁটিয়ে আসবে। দু-গড়েই পাত পাড়বে যে যার প্রজাবর্গ। তাবত বর্গাদার, পত্তনিদার, উঠবন্দী আর কোর্ফাচাষীর দল। আসবে ভূমিহীন খেতমজুর, হা-ঘরে অনাথ আতুর, চামার-চণ্ডাল...।এরা সব রবাহূত।অনাদি কালের রেওয়াজ অনুসারে নিমন্ত্রণ ব্যতিরেকেই হাজির হয়। রাতভর চলে পংক্তি ভোজন। পরের দিন দুপুর অবধি।

সিংহগড়ের দু'মহলের বারান্দা জুড়ে সারবন্দী চুলা জ্বলছিল সারাদিন। উঠোনের মধ্যিখানে পাহাড়প্রমাণ ভাত। মেঝেতে শালপাতা বিছিয়ে তাতে ডাঁই করা চচ্চড়ি, ছ্যাঁচড়া, ডিংলার ঝাল। ডালের ফোড়নের গন্ধে ম-ম করছিল বাতাস। এ সব হল ছোটলোকদের খোরাক। আর একটু বাদে পিলপিলিয়ে আসবে সবাই। বুড়ো-থুড়োরা আসবে লাঠি ঠুকে, পথ হাতড়ে। কাচ্চা-বাচ্চারা কোলে কাঁখে চড়ে। উপোসী শরীরগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে সেই সকাল থেকে। বহুদিন বাদে ভাতের মুখ দেখবে ওরা। গরম গরম ভাত। কাঁচা মুগের ডাল। সাথে ডিংলার ঝাল, চচ্চড়ি আর ছ্যাঁচড়া। ব্যস, আর কী চাই? বছরের এই একটা দিনে— এই ঘোরতর আশ্বিন-কার্তিকে রাজার গড়ে পাত পড়ে এ তল্লাটের সবাইয়ের। সিংহগড়ের তিন পুরুষের রীতি এটা।

বাবু-ভায়াদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। তাদের রান্না-বান্নার পদও আলাদা। থানও পৃথক। ভেতর-মহলে তাদের খাওন-দাওন শুরু হয়ে গেছে।

প্রতাপলাল সিংহবাবু কিছুদিন যাবৎ ভয়ানক অসুস্থ। তার তরফে এই উৎসব সামলাচ্ছে তার ছেলে হরবল্লভ। সুদর্শনেরও বয়েস হয়েছে। এই বয়সে আর সারা রাত উজাগর হয়ে অতিথি অভ্যাগতদের তত্ত্ব-তালাশ করে উঠতে পারেন না। তাঁর তরফে সবকিছু দেখাশোনা করছে জামাতা শঙ্করপ্রসাদ। কিন্তু তার ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখেন না সুদর্শন। পুরুত বামুনের ছেলে সে, নেহাতই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, এই মহাযজ্ঞকে সুষ্ঠুভাবে সামাল দেবার সামর্থ্য কই তার! তা ছাড়া, তার নজরখানাও কিঞ্চিৎ নিচু। হাত খুলে খরচ-খরচা করবার ক্ষেত্রে সর্বক্ষণের অনীহা। অপচয় করাটাকে মনে মনে বড়ই অপছন্দ করে শঙ্করপ্রসাদ। সে কী করেই বা বুঝবে, অপচয়ের মধ্যে কী অপার আনন্দ, আর আত্মশ্লাঘা লুকিয়ে থাকে! সুদর্শনের সর্বদাই আশঙ্কা, মধ্যবিত্তসুলভ কৃপণতার দ্বারা চালিত হয়ে শঙ্করপ্রসাদ না কোন বিষয়ে প্রতাপলালের থেকে পিছিয়ে পড়ে সুদর্শনের মুখে চুনকালি লাগায়। কৃষ্ণদাসকে সেই কারণেই শঙ্করের পেছনে মোতায়েন করে দেন সুদর্শন। বলে দেন, দেখো কৃষ্ণদাস, যেন মাথা কাটা না যায়। কৃষ্ণদাস থাকতে অবশ্য তেমন আশঙ্কা নেই। সে সিংহগড়ের দীর্ঘদিনের গোমস্তা। সে সিংহগড়ের রুচি-বিচারকে চেনে, মান্য করে। দু-তিন পয়সা খাজনার দায়ে সে প্রজার পেছনে দু-তিন মাস লেগে থাকতে পারে। আবার সিংহগড়ের মান বর্ধনে লাখ টাকাকে খোলামকুচি জ্ঞান করে। সুদর্শনের মহলে মূলত কৃষ্ণদাসই পার্বণ-উৎসব সামাল দেয়। শঙ্করপ্রসাদ কেবল থাকে আলঙ্কারিকভাবেই উপস্থিত। এছাড়াও, থাকে ভুবন সরকার, ওর ছেলে নন্দ সরকার, আর যশোদা তুঙ্গ-এর মতো বশংবদ ব্যক্তিবর্গ। দাপানজুড়ির চণ্ডিদাস দত্ত, লোখেশোলের নিশিকান্ত চক্রবর্তীর মতো পারিষদবর্গ। কৃষ্ণদাসের

ছেলে রতিকান্তও বেশ চৌকস হয়েছে। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র ভাল নয় বলে, কৃষ্ণদাস তাকে সিংহগড়ে ঢোকায় না। সুদর্শনের তিন শালা সরযুর তিনভাই, এসব ব্যাপারে উঁচিয়ে থাকলেও সুদর্শন ওদের বড় একটা পছন্দ করেন না। ভগ্নিপতির বৈভব দেখতে দেখতে ওদের দু'চোখ দিয়ে লালা ঝরতে দেখেন তিনি।

জমে উঠেছে মহাষ্টমীর পুজো। অতিথ অভ্যাগতদের পঙক্তিভোজন শুরু হয়ে গেছে। সদর মহলে বৈঠকখানায় তাসপাশার আসর বসেছে। যাত্রাগানের আসর পাতাপাতি চলছে নাটমণ্ডপে। বিষ্টুপুর থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছিলেন সদলবলে। এই মাত্তর খানাপিনা সেরে প্রতাপলালের মহলের দিকে হাঁটা দিলেন তিনি। দু-মহলের রেষারেষির খবর রাখেন দারোগাবাবু। কোন তরফকেই দুঃখ দিতে চান না। এ মহলে ভোজন সেরে ও মহলে যাত্রাগান শুনবেন। ঠিক সেই সময়েই খিড়কি পথে চুপিসারে সুদর্শনের মহলে ঢোকে হরবল্লভ। যথাসম্ভব মানুষজনের দৃষ্টি এড়িয়ে সোজা উঠে যায় দোতলায়।

দোতলায় নিজের শোবার ঘরে বিষ্টুপুরের অন্নদা চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করছিলেন সুদর্শন সিংহবাবু। এমন ভরভরাট আনন্দের হাটেও কেবল একটি কারণেই মনের মধ্যে চাপা গুমোট ভাব সুদর্শনের। আজকের এই আনন্দের মধ্যে উপস্থিত নেই প্রিয়ব্রত। আজ দু-মাসাধিককাল সে নিরুদ্দেশ। স্বদেশী আন্দোলন চলছে দেশ জুড়ে। সেই জোয়ারে ভেসে গেছে, অকল্পনীয়ভাবে, সুদর্শনের একমাত্র নাতিটি। পুলিস যে রাতে ওয়ারেন্ট নিয়ে সিংহগড়ের কড়া নাড়ল, সেই রাত থেকেই সে ফেরার। আজ অবধি তার কোন হদিস পাননি সুদর্শন। সেই থেকে সরযু আর লাবণ্যর মুখ থেকে উধাও হয়েছে হাসি। শঙ্করপ্রসাদও কেমন মনমরা হয়ে গেছে। আর, সুদর্শন, বুকের মধ্যে তোলপাড় তাণ্ডব চললেও মুখ দেখে তা বোঝার উপায় থাকে না কারও। কথা বলছেন, হাসছেন, গল্প করছেন, প্রয়োজনে হুঙ্কারও ছাড়ছেন, কিন্তু মনের মধ্যে গুমোট ভাবখানা কাটছে না কিছুতেই। এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি সুদর্শন। সিংহগড়ের বাসিন্দা, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী, সে যে স্বদেশী দলে নাম লিখিয়ে রাজদ্রোহের অপরাধে পালিয়ে বেড়াবে, এঁমনটা সত্যিসত্যিই ছিল তাঁর স্বপ্নের অতীত।

সহসা দরজার সুমুখে হরবল্লভকে দেখে চমক খেলেন সুদর্শন। চমক খাওয়ারই কথা। এ সময়ে হরবল্লভের এ মহলে আসাটা নেহাতই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এ হল ঠেকায় পড়ে আসা। এ হল সঙ্কটের সময়। সঙ্কটকালে বৈরীভাব ভুলতে হয়। হরবল্লভের চোখেমুখে চাপা উদ্বেগ। সুদর্শন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন হরবল্লভের দিকে। টকটকে ফর্সা, দশাসই জোয়ান, সর্বাঙ্গে পূর্ণ যৌবনের অদম্য তেজ। সুদর্শন তেমন করে কখনও তাকিয়ে দেখেন নি আপন ভাইপোকে। এত বড় হয়ে গিয়েছে হরবল্লভ! এমন সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে! সুদর্শন বেশ কিছুক্ষণ হরবল্লভের থেকে নজর সরাতে পারেন না। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে পাথরের মতো জমাট বেঁধে যান।

'জ্যাঠা?' হরবল্লভ ডাকে।

সম্বিত ফিরে পান সুদর্শন। চমকে তাকান। নড়েচড়ে বসেন।

হরবল্লভ জ্যাঠামশাইয়ের পাশটিতে গিয়ে বসে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'বাবা পাঠালেক তুমার পাশ। উদিগকার খবর শুনেছ জেঠা?'

'কিসের খবর?'

'উয়ারা কেউ খেতে আসবেক নাই।'

'কারা?' সুদর্শনের কপালে অজান্তে ভাঁজ পড়ে।

'বাউরি পাড়া, বাগদি পাড়া, লোহার পাড়া, শিকারি পাড়া, কেউ লয়।'

'কেন?' সুদর্শনের দু'চোখ ছোট হয়ে আসে।

'উয়াদ্যার নিমন্তন্ন করা হয় নাই। সেই তরে।'

কথাগুলো সুদর্শনের কানে হেঁয়ালির মতো ঠেকে। বাপের জন্মেও অমন কথা শোনেননি তিনি। বাউরি, বাগদিদের কে আবার কবে নিমন্ত্রণ করে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে খেতে ডেকেছে! ওরা তো চিরকালই রবাহূত। সুদর্শন সহসা গুম মেরে যান। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেন, রাত দশটা।

'উয়ারা কেউ আসে নাই ইখন তক্ক?' সুদর্শন শুধোন।

'লয়। উয়াদ্যার নাকি মিটিং হয়েছে বত্রিশভাগীর জঙ্গলে। বাবুভায়াদের যেমন ঘরে ঘরে গিয়ে নিমন্তন্ন করে আসা হয়, উয়াদ্যারও তেমনি করে আসতে হব্যেক। লচেৎ উয়ারা কেউ পাত পাড়বেক নাই।'

শুনতে শুনতে সুদর্শন পাথরের মতো স্থির হয়ে যান। চোখের পাতাও পড়ে না। কেবল লাল টকটকে নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে। হরবল্লভ চুপটি করে বসে থাকে স্থাণুর মতো। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'এদিকে দু-মহলে ডাঁই করা অত ডাল-ভাত ব্যঞ্জন।'

'থাম্।' এক ধমকে ওকে থামিয়ে দেন সুদর্শন, 'ডাল-ভাতের ভাবনা চুয়ামসিনার সিংহবাবুরা ভাবে না। এ হল মান লিয়ে কথা।'

বটে তো। আজ রাতে যদি লোকগুলো সত্যি সত্যিই না খেতে আসে, ভাত-ডালগুলো যদি কাল সকাল অবধি চূড় হয়ে থাকে সিংহগড়ের উঠোনে, নিমেষের মধ্যে চতুর্দিকে চাউর হয়ে যাবেক কথাটা। শত্রুরা তালি বাজাবেক। টিটকারি দিবেক। বলবেক, আচ্ছা জবাবটি দিয়েছে ছোটলোকগুলান। এক্কেবারে মুহের মতন জবাব। সিংহবাবু বংশের মুহে এক্কেবারে চুনকালি লেপে দিয়েছে শালারা। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আজ নিমন্ত্রিত। তারা দেখে যাবেক অমন রসালো দৃশ্য। আর, মানুষ হল মাছির জাত। মুখে নোংরা বয়ে বেড়াতেই তার আনন্দ। ভোর না হতেই, মুখে মুখে নোংরা নিয়ে উড়ে যাবেক মানুষ-মাছির দল। একটা মজার ব্যাপার দেইখ্যে এল্যম হে। চুয়ামসিনার সিংহগড়ে কাল মহাষ্টমীর রাতে প্রজারা কোউ পাত পাড়ে নাই ভোজের থানে। রান্না করা পাহাড়-প্রমাণ খাদ্য গর্ত কর‍্যে বেবাক পুঁত্যে দিতে হল মাটিতে।

সুদর্শন বোধ করি জীবনে এত বেশি অপমানিত হননি কারুর কাছে। শালাদের অত সাহস! সিংহগড়ের রাঁধা ভাত ফেলা করিয়ে লোক হাসাতে চায়। শালারা কী ভেবেছে, সুদর্শন সিংহবাবু মরে গেছে! রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন সুদর্শন। সেই অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন, 'সনাতন—।'

হরবল্লভ জেঠার অমন চণ্ডরূপ বোধ করি দেখেনি জীবনে। অন্নদা চক্রবর্তীও দেখেননি। সনাতন সামনে এসে দাঁড়ায়। মেঘের মতো গম্ভীর গলায় সুদর্শন হুকুম দেন, 'রুদ্রা আর কালো শিকারিকে তিয়ার হত্যে বল্।' বলেই দেওয়াল থেকে রুপোর বাঁট লাগানো বেতখানা তুলে নেন হাতে।

মৃদু বাধা দিয়েছিলেন অন্নদা চক্রবর্তী। এই বয়সে, এত রাতে, নিজে না-ই বা গেলেন সুদর্শনদা। হরবল্লভ এবং শঙ্করকেই পাঠান। লগদীরা যাক সঙ্গে। শঙ্করের প্রসঙ্গে মুহূর্তে

অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যে ঠোঁটজোড়া বেঁকে চুরে যায় সুদর্শনের। বেতগাছা শক্ত করে ধরে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নামতে থাকেন। পিছু পিছু, পুতুলের মতো হরবল্লভ। জেঠার পেছনে হাঁটিতে হাঁটিতে হরবল্লভ বলে, 'উই নিশান বাউরির ব্যাটা পরীক্ষিতই নাকি পালের গোদা। উ-ই সব্বাইকে ক্ষেপাচ্ছে। নিশান বাউরি পিছন থিকে মদত দিচ্ছে। দু'শালাকে উচিত শিক্ষা দিবা দরকার।'

'সে সব পরে দেখা যাবেক হে।' সুদর্শন বাঘেব ঝাপট নেন ভাইপোর ওপর, 'আগের কাজটা আগে কর দেখি তুমরা।'

পেছনে হাঁটিতে হাঁটিতে কী একটা বলতে যাচ্ছিল সনাতন, মনিবের মেজাজটা বুঝে চুপ মেরে যায়।

লগদীগুলোর হল্লাতে আগড় খুলেছিল ওরা দু-একজন। গোটাকতক এলোপাতাড়ি বেতের ঘা খেয়ে, সমস্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধান্ত ভেসে গেল খড়কুটোর মত। সুদর্শন পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে কেবল হুঙ্কারটি ছেড়েছিলেন, এক ডাকে যে বারাবেক নাই, তার দুয়ার বাইরে থিকে বন্ধ কর‍্যে আগুন লাগাই দে। শালারা পুইড়ে মরুক পঙ্কার মতন।

ব্যস, আর যায় কোথায়। মুহূর্তে ছাগলের পালে যেন বাঘ পড়েছিল। কে যে কোন্ দিক দিয়ে ছুটে পালাবে, কী করে আগেভাগে হাজির হবে সিংহগড়ে, তার দিক-দিশা পায়নি। বুড়ো-থুড়ো, কাচ্চা-বাচ্চা, ছুগরী-বুড়ি—কাউকে বাদ দেয়নি সুদর্শনের দল। যাকে সামনে পেয়েছে, বসিয়েছে বেতের সপাসপ ঘা। আতঙ্কে নীল হয়ে আসা মানুষগুলো চোরের মতন হাজির হয়েছে যে যার মনিবের গড়ে।

ডিহির ওপর ছুটতে ছুটতে পিঠগুলো জ্বলছিল। ভয়ে-তাড়াসে সেটা মালুমই হয়নি তত। এখন সিংহগড়ের উদোম উঠোনে বসে ভাত-ডাল গিলতে গিলতে মালুম হচ্ছে। পিঠ জুড়ে সার সার পাঁকাল মাছ। এক পিঠ যন্ত্রণা নিয়ে, ধুলো-কাদায় মাখামাখি মানুষগুলো এখন গপাগপ ভাত গিলছে ভয়ের তানে।

পরবর্তীকালে, পূজার ঝামেলাদি মিটলে পর, সব শালাকে তলব করা হয়েছিল কাচারিতে। ওরা সুদর্শনের সামনে নাক মলেছিল, কান মলেছিল। হামাগুড়ি দিতে দিতে নাকে খত দিয়েছিল কাচারি-ঘরের সামনের মাঠের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত। এবং সুদর্শনের নির্দেশে, পরের ধান কাটার মরসুমে সব পাড়ার সব শালাকে পাঁচটা করে বেগার মজুর দিতে হয়েছিল নিদারুণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে।

কিন্তু সে রাতে যে আরও একটি হাড় হিম করা অভিজ্ঞতা হয়েছিল সুদর্শনের। সেই কারণেই না আজ অ্যাদ্দিন বাদেও এত কথার অবতারণা। বাউরি পাড়ার লোকগুলোকে সে রাতে ছাগল-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়ির মধ্যে আচম্বিতে এক লহমার জন্য সুদর্শন দেখেছিলেন প্রিয়ব্রতর মুখখানি। মুহূর্তে মাথায় আকাশখানি ভেঙে পড়েছিল তাঁর। একমাত্র আদরের নাতিকে যে এক শুয়োর-খেকো বাউরির ঝোপড়িতে আবিষ্কার করবেন, এ ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অতীত। পরীক্ষিত বাউরির বাড়িতেই কি তবে বিগত দু'মাসাধিককাল লুকিয়ে রয়েছে প্রিয়ব্রত? নাকি অন্য কোনও গোপন আস্তানা থেকে সম্প্রতি এসে ডেরা পেতেছে এখানে? কিন্তু উপস্থিত এ সব নিয়ে গবেষণা করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না সুদর্শনের। তাঁর বুকের মধ্যে তখন চলছিল তুমুল ঝড়। ঘেন্নায় রি-রি করছিল মন। আশঙ্কায় গুরগুর করছিল বুক। প্রিয়ব্রতকে কেউ দেখে ফেলেনি তো?

লগদীগুলো এবং হরবল্লভ খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সুদর্শন ওদের খুব কাছে আসতে দেন না। চল্ চল্। উদিগে চল্। এ ঝোপড়ি ফাঁকা। বলতে বলতে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেন অন্য ঝোপড়িগুলোর দিকে। বুকের মধ্যে তখন চলছে ঝড়ের অস্থির দাপাদাপি। ঝড়, ঝড়।

সুদর্শনের মনে হয়েছিল, তিনি ছাড়া আর কেউই দেখেনি প্রিয়ব্রতকে। তাঁর সে ভুল ভাঙল, যখন শেষ রাতে পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়ি ঘিরে প্রিয়ব্রতকে গ্রেপ্তার করল পুলিস এবং যখন শুনলেন হরবল্লভ সারারাত পুলিসের সঙ্গেই ছিল। কোন সন্দেহ নেই, সে রাতে হরবল্লভই ধরিয়ে দিয়েছিল প্রিয়ব্রতকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, পরের দিন সকাল থেকেই কেমন যেন বদলে গেল লাবণ্যর মুখ। শুধু বিষাদপ্রতিমাই নয়, বিষাদপ্রতিমাতো লাবণ্য বহুদিন ধরেই, দেখা গেল তার চোখের মণিতে চাপা বিষ, কেবল সুদর্শনের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই উথলে ওঠে। লাবণ্যের এমন বিষ মাখানো চোখের মণি, সুদর্শন এর আগে দেখেছেন মাত্র একবার, যখন শঙ্করপ্রসাদকে পাঠালেন বেলগুলিয়ার মহালে, ঠেলে দিতে চাইলেন এক পাতালগভীর ইঁদারার মধ্যে...। পরবর্ত্তীকালে, বহুভাবে নিঃসন্দেহ হয়েছেন সুদর্শন, সে রাতে প্রিয়ব্রতর ধরা পড়ার পেছনে সুদর্শনের হাত আছে,-এমন সন্দেহ করেছে কেবল লাবণ্যই নয়, সরযু, শঙ্করপ্রসাদ, সম্ভবত প্রিয়ব্রত নিজেও। সেই কারণেই বুঝি, আজ এতদিন বাদেও প্রিয়ব্রতর অজ্ঞাতবাসের খবরটা সুদর্শনর কাছে গোপনই রাখতে চায় সবাই।

৮. শঙ্করপ্রসাদের শ্রেণীগত অসুখ

আজ সাতদিন প্রিয়ব্রত রয়েছে সিংহগড়ে। লুকিয়েই রয়েছে। রুদ্র শিকারির মারফত খবর পেয়েছেন সুদর্শন। অথচ একদিনের জন্যও সে সুদর্শনের ঘরে এল না। হয়ত খেয়ালই নেই দাদুর কথাটা। হয়ত ভুলেই গেছে যে, সুদর্শন সিংহবাবু নামে এক অক্ষম অথর্ব বৃদ্ধ এই গড়ের এক নির্জন কামরায় চব্বিশ ঘন্টা বেঁচে রয়েছে। সুদর্শনের বুক চিরে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে সবাই। একমাত্র সরযু ছাড়া। সে বোধ করি এখনও ভুলতে পারেনি স্বামীর নীরব অস্তিত্বটুকু। তার সারা বুকে দগদগে হয়ে একজন স্বামীর বুঝি অনন্ত, অখণ্ড বসবাস। কয়েকটি বাছাবাছা সময় ধরে আজ পাঁচ বছর সে এমনই আসছে। পুতুলের মতো মাপা পায়ে হেঁটে আসে, সেবা-যত্ন সেরে পুতুলের মতো হেঁটে ফিরে যায়। এক মুহূর্ত বেশি থাকে না। এক মুহূর্ত কমও নয়। সুদর্শনের কেন জানি বিশ্বাস হয়, তিনি মরে যাওয়ার পরও বুঝি সরযু একইভাবে নিয়মিত এই ঘরে আসতে থাকবে বহুদিন।

সরযু এসে কাজের মধ্যে ডুবে যায় রোজ। সুদর্শন সারাক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন নিষ্পলক। ওর কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা শুধোন। সরযু পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে নেড়ে নিঃশব্দে জবাব দেবার দায় সারে। কোন কোন দিন সুদর্শন ওকে একটুখানি বেশি সময় আটকে রাখবার চেষ্টা করেন। বলেন, একটুখানি থাকো না। কী অত কাজ তুমার? সরযুর দুই ভুরুর মধ্যিখানের জমিটুকু অল্প কেঁপে ওঠে বুঝি। ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে সূক্ষ্ম দুর্বোধ্য হাসি উঁকি মেরেই মিলিয়ে যায় চকিতে। সুদর্শনের পাশে চেয়ার নিয়ে ও বসে। সামনের জানলা গলিয়ে চোখদুটো বিঁধিয়ে দেয় আকাশের গায়ে। পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে সুদর্শনের কথার জবাবে শুধু যান্ত্রিক মাথা নাড়ায়। খুব বাধ্য হলে, অগত্যা দু-একটা শব্দ উচ্চারণ করে। সে সব নিতান্তই পোষা শব্দ। পোষা, পোষা।

বহুদিন সরযুকে কাঁদতে দেখেননি সুদর্শন। অথচ সব মেয়ের জীবনে কোন না কোন সময়ে একটুখানি কাঁদবার দরকার হয়। সুদর্শন আশা করেন, সরযু হয়ত কোন একদিন ওঁর

পাশে বসে হু-হু করে কেঁদে উঠবে। সুদর্শন অপেক্ষা করেন। কিন্তু সরযু কাঁদে না। পাথরের মতো তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে তাঁর বুকে আশঙ্কা জমে। মনে মনে ভাবেন, তাঁর পাশে বসে সরযু কান্নায় বুক ভাসালে, তিনি কী বলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন? জানলার পাশে নিঃসঙ্গ সুদর্শন ইদানীং সরযুর জন্য সান্ত্বনার ভাষা তৈরি করে চলেন সারা বিকেল।

সন্ধেবেলায় দশভুজার আরতির শেষে সরযু একবার আসবে। সঙ্গে এ বাড়ির পুরনো চাকর সনাতন। একখানা রুপোর রেকাবিতে রাতের খাবার নিয়ে আসবে। দশভুজার প্রসাদ। সুদর্শন অনেকদিন লক্ষ করেছেন, সন্ধেবেলায় দশভুজার আরতির পর সরযু যখন আসে, তখন তার চোখদুটো ফোলাফোলা লাগে। সরযু কি তবে রোজ দশভুজার বিগ্রহের পায়ের তলায় ঝরিয়ে আসে চোখের সবটুকু জল।

আজও সরযুর জন্য সান্ত্বনার ভাষা তৈরি করছিলেন সুদর্শন। মনটা সারাক্ষণ উড়ছিল। বারবার প্রিয়ব্রতর মুখখানা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

আজকাল মনটা বড় অভিমানী হয়ে ওঠে কথায় কথায়। বাচ্চা ছেলের মতো। কারণে-অকারণে অবুঝ হয়ে ওঠে। সুদর্শন বোঝেন, শঙ্করপ্রসাদের ওপর তিনি যত জুলুম করেছেন, তার ছেলে এখন সব কিছুর শোধ নিচ্ছে সুদে-আসলে। তিনি ওর মধ্যে স্পষ্টতই অন্য এক ছায়া দেখে চমকে ওঠেন। সিংহগড়ের প্রচলিত ধারার সাথে সেটা মানানসই নয়।

প্রিয়ব্রতর তখন মাত্র ছ'বছর বয়েস, ফুটফুটে শিশু, চোখদুটো ঠিক লাবণ্যর মতো, টানা টানা আর গভীর। সারাদিনের অশান্ত ছোটাছুটির পর একটিবার ওই কোমল শিশুকে বুকের মধ্যে চাইতেন। অন্যদের মতো প্রিয়ব্রতও ভয় করত তাঁকে। কিন্তু হাত নেড়ে ডাকলে লাজুক হাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসত। পাশটি ঘেঁসে দাঁড়াত।

ওকে বুকের পাশটিতে টেনে নিতেন সুদর্শন। বলতেন, 'দাদু, আজ কী কী খেঁয়েছ তুমি?'

'ভাত খেঁইছি, ডাল খেঁইছি, মাছ খেঁইছি, দুধ—।'

'বেশ। আজ কী কী খেলা খেল্যেছ?'

'পুতুল খেলেছি, গাদি খেলেছি। লুকাচুরি—।'

'সনাতনের পিঠে ঘোড়ায় চড়া খেল নাই?'

'না।' প্রিয়ব্রতর বলিষ্ঠ উত্তর।

'কেন?'

সুদর্শনের ধবধবে দাড়িতে ওর কচি কচি নরম আঙুলগুলো নড়াচড়া করত। দাদুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে খুব মজা পেত প্রিয়ব্রত।

শুধোত, 'এগুলো কী?'

'দাড়ি।'

'এগুলা কী কইর‍্যে হয় ইখ্যেনে?'

'বয়স হল্যেই হয় দাদু। কিন্তু তুমি ঘোড়ায় চড়া খেল নাই কেন?'

'আমার ইখ্যেনে দাড়ি হবেক?' নিজের চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে প্রিয়ব্রত শুধোয়।

'হবেক, হবেক। না হল্যে তুমি দাদুর মতন হবে কী কর‍্যে?'

'আমি তোমার মতন হব নাই।'

'কেন?' অল্প চমক খেয়ে তাকান সুদর্শন।

প্রিয়ব্রত জবাব দেয় না। সুদর্শনের সাদা চুলের মধ্যে তার কচি আঙুল নিঃশব্দে খেলে বেড়ায়।

সেদিন কিছুতেই আর মুখ খুলল না প্রিয়ব্রত। কিন্তু ওইটুকু ছেলের ওই দুটো কথা সুদর্শনকে ভাবিয়ে তুলল। আরও একটা জিনিস অবাক করল। ও ঘোড়ায় চড়া খেলাটা খেলে না কেন, এ প্রশ্নের জবাবটা কেমন নিপুণ উপায়ে এড়িয়ে গেল। কেমন অন্য প্রসঙ্গ তুলে পাশ কাটাল অবলীলাক্রমে। লোকনীতিতে ঝুনো নারকোল সুদর্শন সিংহবাবুর মাথায় ও দাড়িতে একটিও চুল কাঁচা নেই। কেমন অনায়াস দক্ষতায় তাঁর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল ওইটুকু দুধের বাচ্চা। সুদর্শন বুঝতে পারেন, এইটুকু বয়েসের এই শিশু, নিরন্তর তার বুকের মধ্যে রচনা করে চলেছে তার নিজস্ব জগৎ। এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। নিজস্ব জগতের দুয়োর সে সহজে খোলে না। যার তার কাছে তো নয়ই। এও বুঝতে পারেন, ও দাদুকে মনে মনে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। দাদুর মতো হতে চায় না ও।

এরপর কিছুদিন ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন সুদর্শন। ওর নিজস্ব জগতের দুয়োরে অল্পস্বল্প টোকা দিয়ে দেখলেন। একদিন চেপে ধরলেন ওকে। বল দাদু, আমার মতন হতো চাও না কেন, বল।

অনেক সাধ্যসাধনার পর প্রিয়ব্রত দু'হাতে মুখ ঢেকে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'তুমি ভাল লয়।'

'কেন? আমি খারাপ কিসে?'

'তুমি আমার বাবাকে মার।'

সুদর্শনের বুকখানা নিমেষে ছলাৎ করে উঠেছিল ওইটুকু বাচ্চার কথা শুনে। অনেকক্ষণ গুম মেরে রইলেন তিনি।

একমাত্র জামাই শঙ্করপ্রসাদকে বহুবার মেরেছেন সুদর্শন। তাকে দেখলেই ওঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সে ছিল সুদর্শনের দু'চোখের বিষ।

শঙ্করপ্রসাদকে দেখতে না পারার অনেক কারণ ছিল। সবগুলো সুদর্শনও ঠিকঠাক বোঝেন না। তার সঙ্গে সুদর্শনের সম্পর্ক ছিল জটিল। এটা ঠিক যে, শঙ্করপ্রসাদ দরিদ্র, কিন্তু ভদ্র বাড়ির ছেলে। সে পড়াশুনোও করেছে। তার ব্যবহার অমায়িক। সুদর্শনকে সে চিরকাল ভয়-ভক্তি করে এসেছে। আসলে, সুদর্শন অনেকদিন ধরে লাবণ্যর জন্য একটি উপযুক্ত ছেলে খুঁজছিলেন। লাবণ্য তাঁর একমাত্র সন্তান। তাকে পরের ঘরে পাঠানো সম্ভব ছিল না। ঘর-জামাই হয়ে সারাজীবন সিংহগড়ে থাকবে, এমন একজন ভাল ছেলেই চাইছিলেন সুদর্শন। তাঁর অবর্তমানে এই বিপুল সম্পত্তি, তালুক-মুলুকের উত্তরাধিকারী হবে সে-ই। ওগুলো রক্ষা করবার দায়ও বর্তাবে তারই ওপর। সুদর্শন তাই সব দিক থেকে একটি মনের মতো ছেলে খুঁজছিলেন। একজন বুদ্ধিমান, তেজী ছেলে, যে কিনা সবদিক থেকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। বহু খোঁজাখুঁজির পর শঙ্করপ্রসাদকে পাওয়া গেল। মশিয়াড়ার দীনবন্ধু মহাপাত্রর কনিষ্ঠ পুত্র সে। রুচিশীল যুবক। মার্জিত। সংস্কৃতিবান। একটু মুখচোরাও বটে। আর, লাবণ্যকে পাগলের মতো ভালোবাসে। সুদর্শনের সামনে সর্বদাই সে খুব নম্রভাবে চলাফেরা করত। পরে

সুদর্শন খোঁজ নিয়ে দেখেছিলেন, ও প্রায় সবাইয়ের সঙ্গেই এমন নম্র ব্যবহার করে। সুদর্শন ভেবেছিলেন, প্রথম প্রথম এমনটা হচ্ছে বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষ অভ্যেস আর পরিবেশের দাস। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ঘরে মধ্যবিত্ত পরিবেশে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ছিলই তার কৈশোর। নতুন পরিবেশে সেটা ভুলে যেতে বেশি সময় লাগবে না। মানুষের তা লাগে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা মানুষের অসীম। শঙ্করপ্রসাদও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নয়। ধন-দৌলত, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি পেলে কিছুদিন বাদেই ও পালটে যাবে। সুমিষ্ট রক্তের স্বাদ পেলে মানুষই বিশ্বের হিংস্রতম শ্বাপদ হয়ে ওঠে। আর অরণ্য-জননীর রক্ত তো সেই আদিমকাল থেকেই মানুষের ধমনীতে বইছে।

ভাবনা-চিন্তার জন্য বেশি সময় না নিয়ে সুদর্শন তড়িঘড়ি লাবণ্যর সঙ্গে শঙ্করপ্রসাদের বিবাহ দিয়ে ফেলেছিলেন। সেটাই যে কতবড় ভুল হয়েছে, সেটা বুঝতে পারলেন কিছুদিন বাদে।

শঙ্করপ্রসাদকে তিলতিল পর্যবেক্ষণ করেছেন সুদর্শন। লাবণ্যকেও লক্ষ করেছেন। ওদের মধ্যে খুব ভাব হয়েছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর। সুযোগ পেলেই ওরা সকলের চোখ এড়িয়ে তিনতলার ছাদে চলে যেত চুপি চুপি। মনের সুখে গল্পগুজব করত। শঙ্করপ্রসাদ দেখতে খুব সুন্দর। বলিষ্ঠ পেশীবহুল তার শরীর। সিংহগড়ের আরাম আর প্রাচুর্য পেয়ে তার গায়ের রঙ পাকা ধানের মতো হয়ে উঠেছিল। কান্তি ফিরে আসছিল সারা শরীরে। তিনতলার ছাদে মেঘে ঢাকা কালো আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সে নির্ভুল উচ্চারণে 'মেঘদূত' শোনাত লাবণ্যকে। লাবণ্য কতটুকু বুঝত কে জানে। কিন্তু শঙ্করপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে তন্ময় হয়ে যেত। এদিকে, দিনদিন সুদর্শনের আতঙ্ক বাড়ছিল এ বংশেব ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তাঁর তিন পরগণায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তালুক, যার আয় বছরে লাখ টাকার কম নয়, তাঁর এই এতগুলো বোঝাই সিন্দুক, ধানের গোলা, অত বড় মহল। সবচেয়ে বড় কথা, এ তল্লাটে সিংহবাবু বংশের মান-সম্ভ্রম, প্রভুত্ব-সবই যে নির্ভর করছে শঙ্করপ্রসাদের ওপর। নিজের ভাই প্রতাপলাল, সুদর্শনের সবচেয়ে বড় শত্রু, তার ছেলে হরবল্লভ বর্ষার গাছের মতো দ্রুত বেড়ে উঠছিল। সে তখনই এ মহলের দিকে বাঁকা চোখে তাকাত। ভবিষ্যতে, সুদর্শনের অবর্তমানে, হয়ত ও-ই হবে সিংহবাবু বংশের প্রতিভূ। শাসন করবে এই এলাকা একচ্ছত্রভাবে। যে গড়কে এ এলাকার মানুষ 'সিংহগড়' বলে চেনে, তা নিতান্তই গৌণ হয়ে যাবে দুনিয়ার চোখে। প্রতাপলালের পোঁতা বীজ শেকড় ছড়াচ্ছিল মাটির তলায়। ক্রমে ক্রমে ওই গাছ একদিন মহীরুহ হবে। এ সব ভাবতে গেলেই সুদর্শনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠত। আগুন, আগুন। শঙ্করপ্রসাদের ওপর রাগখানা গনগনে হত। সুদর্শন বুঝতে পারছিলেন, দিনকাল তড়িৎগতিতে বদলাচ্ছে। এই সব তালুক-মহল বোধ করি থাকবে না। এক নতুন দিন আসছে। যে দিনগুলোতে, জমি নয়, রুপোলি চাকতিই হবে সর্বেসর্বা। রুপোলি চাকতিকে বাটখারা করে, ওজন করা হবে মানুষের মান-মর্যাদা-আভিজাত্য। সেই জন্যই সুদর্শন নিরন্তর পাহারা দিয়ে চলেছেন এক ডজন সিন্দুকের চাবি। সেই সিন্দুকের চাবিগুলো রক্ষা করতে পারবে, শঙ্করপ্রসাদ তেমন মানুষই নয়। শঙ্করপ্রসাদ যে নির্বোধ, অকর্মণ্য কিংবা অলস, তা কিন্তু মোটেই নয়। তালুকের জটিল কাগজপত্তর সে খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করছে। হিসেবপত্তর ও খুবই ভাল বোঝে। পরিশ্রম করবার ক্ষমতাও তার অফুরন্ত। বিচারে-বৈঠকে সে মাঝে মাঝে

এমন পরামর্শ দেয় যে সবাইকে চমকে তাকাতে হয়। কত জটিল সমস্যার সমাধান কত অনায়াসে বাতলে দেয় সে।

তবুও শঙ্করপ্রসাদকে নিয়ে সুদর্শনের দুশ্চিন্তা তিলমাত্র কমেনি। তার বুকে স্নেহ-মমতা প্রবল। সরযুর অসুখ করলে সে দিনরাত তার মাথার পাশটিতে বসে থাকে। তার নীতিবোধও একটু বেয়াড়া মাত্রায় বেশি। অত বড় মহলে কত রূপসী, যুবতী, ঝি-চাকরানী, আশ্রিতা নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়। তাদের মুখের দিকে ভুলেও কোন দিন চোখ তোলে না শঙ্করপ্রসাদ। লাবণ্য ছাড়া তার চোখে, এই দুনিয়ায় বুঝি দ্বিতীয় কোন নারীর অস্তিত্বই নেই। সুদর্শন জানেন, যে মানুষ জীবনে একটি মাত্র মেয়েকে পাগলের মতো ভালবাসে, সে হয়ত আদর্শ প্রেমিক কিংবা স্বামী। কিন্তু ধন-সম্পদ অর্জন করা কিংবা রক্ষা করা তার কর্ম নয়। সুদর্শনের বাবা, দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবুর মহলে, তাঁর শেষ দিনগুলিতেও, গভীর রাত্রে পালকির আনাগোনা ছিল। প্রথমা স্ত্রী কাদম্বরীর সাবিত্রীব্রত উদ্‌যাপনের দিনেই সুদর্শন বেরিয়েছিলেন সরযুর প্রেমিকের সাথে বোঝাপড়া করতে। সিংহবাবুদের শিরায় শিরায় এক ভিন্ন রক্ত বইছে। সে রক্ত শঙ্করপ্রসাদের দেহে তিলমাত্র নেই। আসলে, সুদর্শনের আজীবনের বিশ্বাস, যারা সারা জীবন একটি মাত্র নারী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তারা নেহাতই গেরস্থ। তারা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গলবস্ত্র হয়ে লক্ষ্মীর পুজো করে। সুদর্শনের দৃষ্টিতে লক্ষ্মী চিরকালই নারী। চঞ্চলা নারী মাত্র। চঞ্চলা নারীকে ভজনা করলে সে ধরা দেয় না। শুধুই খেলিয়ে মারে। নারীকে চুলের মুঠি ধরে বশ করতে হয়। লক্ষ্মীকে আজীবন চুলের মুঠি ধরে বশ করেছেন সুদর্শন। সেই তিলতিল বশ করা নারীটি তাঁর অবর্তমানে খাঁচামুক্ত পাখির মতো উড়ে যাবে, উড়ে যাবে, হয়ত বা বসবে প্রতাপলালের ডালে, এটা ভাবতেই সুদর্শনের শিরায় শিরায় উন্মত্ত রক্তের স্রোতস্বিনী বয়ে যেত। সেই কারণেই, শঙ্করপ্রসাদকে 'মানুষ' করবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। প্রতি মুহূর্তে তাকে নিদারুণ অপমান করেছেন। কথায় কথায় তার দু'গালে বসিয়ে দিয়েছেন হাতের পাঁচটি আঙুলের দাগ। আশা করেছিলেন, একদিন অপমানিত শঙ্করপ্রসাদ জ্বলে উঠবে। তাঁর বিরুদ্ধে শঙ্করপ্রসাদের তাবৎ উষ্মা ধূমায়িত হতে হতে একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে অন্য কোথাও। মনের চাপা আগুন বেরবার জন্য একটা পথ খুঁজবে নিশ্চয়ই। সুদর্শন দেখেছেন, অপমানিত মানুষ অন্যকে অপমান করে সুখ পায়। অপরকে নিগ্রহ করে নিজের অন্তরের জ্বালা জুড়োয়। কিন্তু না। শঙ্করপ্রসাদ ওঁকে সব দিক থেকে হতাশ করেছে। সারা জীবন সে শুধু শত্রুতাই করে গেল সুদর্শনের সঙ্গে। শত্রুতা, শত্রুতা।

একটা সময় গেছে, যখন শঙ্করপ্রসাদের কথা, এ বংশের ভবিষ্যতের কথা, ভাবতে ভাবতে বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কেটে গেছে সুদর্শনের। কী করবেন। কেমন করে শঙ্করপ্রসাদকে এ বংশের যোগ্য করে তুলবেন। কেন তিনি গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা না করে বাস্তুতে এমন নির্বিষ সর্পটিকে আমদানি করলেন। দিন যতই ফুরিয়ে আসে, ততই আশঙ্কায়, দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে ওঠেন সুদর্শন; শঙ্করপ্রসাদের ওপর ততই বাড়তে থাকে চণ্ডরোষ।

একদিন সন্ধেবেলায় নিজের ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন সুদর্শন। আফিমের মাত্রাটা একটুখানি বেশি হয়ে গিয়েছিল সেদিন। মনের মধ্যে হাজার চিন্তা জিয়োল মাছের মতো কিলবিল খেলে বেড়াচ্ছিল। চোখের সামনে অনেক ছবি—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের। সহসা নড়েচড়ে বসলেন সুদর্শন। একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দুলছে যেন। শঙ্করপ্রসাদের

চিকিৎসা প্রয়োজন। ওর রোগটা বড় জটিল। সাধারণত গরিব-গুরবোদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা ঢুকলে, এ ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় তাদের রক্তে। সেই সন্ধ্যায় সুদর্শন এস্টেটের পুরোন গোমস্তা কৃষ্ণদাসকে ডেকে পাঠালেন। কৃষ্ণদাস অতি অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া মানুষ। লোকচরিত্রে পণ্ডিত। সিংহগড়ের অতি বিশ্বস্ত জন সে।

খাস কামরায় ডেকে পাঠানোর মর্ম কৃষ্ণদাস বিলক্ষণ বোঝে। ঘরে ঢুকে দরজাখানি ভেজিয়ে দিল সে।

সুদর্শন বলেন, 'কৃষ্ণদাস, বেলশুলিয়া মহালের আদায়পাতি এ বছর বড়ই কম।'

'উদিগ্‌টায় আইজ্ঞা গেল সাল থিক্যে চাষবাস ভাল হয় নাই।' কাঁচুমাচু হয়ে বলল কৃষ্ণদাস। তারপর প্রস্তুত হল, আসল কথাটা শোনার জন্য। আজীবন অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, ওকে একান্তে ডেকে পাঠাবার আসল কারণ এটা নয়।

সুদর্শন বললেন, 'শঙ্করপ্রসাদকে বেলশুলিয়ার কাচারি-বাড়িতে পাঠাব ঠিক কচ্ছি। মাসকয় উখ্যেনে থেক্যে সে আদায়-ওয়াসিলের ব্যাপারটা স্বয়ং দেখাশুনা করুক। তুমি গগন কুচলানকে খবরটা পাঠাই দাও। সে যেন কাচারি-বাড়িতে শঙ্করপ্রসাদের থাকবার যাবতীয় বন্দোবস্ত করে। আর তুমি নিজে গিয়ে সব দেখাই বুঝাই দিয়ে এসো।'

কৃষ্ণদাসকে যতটুকু চেনেন সুদর্শন, এর বেশি তাকে কিছুই বলবার প্রয়োজন নেই।

দিনসাতেক বাদে শঙ্করপ্রসাদ বেলশুলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করল।

৯. অরিজিতের নিজস্ব চাবুক

পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছিল অরিজিতের। ইতিমধ্যে বার দুয়েক ওর খোঁজ নিয়েছেন সুদর্শন। স্নান, আহ্নিক, এবং কাচারির কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর দৃষ্টি বার বার চলে যাচ্ছিল সদর মহলের দিকে। সকাল থেকে কেন জানি ভারি চঞ্চল হয়ে ছিল মন। কাজকর্মেও মন বসছিল না তেমন। কাল শেষ রাতে দোতলায় ফিরে আসার পর, সরযু ধীর পায়ে চলে গিয়েছিল ঘরের ভেতরে। সুদর্শনকে কিছুই শুধোয়নি সে। সুদর্শনই বরং নিজের থেকে আগ বাড়িয়ে ওকে সংক্ষেপে বলেছেন ঘটনাটা। সরযু নির্বাক শুনে গেছে, কোন মন্তব্য করেনি।

তখন বোধ করি আড়াই পহরটাক বেলা, সুদর্শন ছিলেন অন্দরমহলেই। অন্দরমহলের একতলায় একট বড়সড় বসবার ঘর রয়েছে। অনেক সময় সেই ঘরেই জমিদারির কাগজপত্র নিয়ে বসেন তিনি। আজও বসেছেন।

এক সময় সনাতন এসে দাঁড়ায় সামনে। অপেক্ষা করতে থাকে নীরবে, কখন মালিক ওর আর্জি শোনার জন্য মুখ তুলে তাকান।

এক সময় মুখ তুলে তাকালেন সুদর্শন।

'উ ছগরা উঠেছেন।' সনাতন বলে।

সুদর্শন বেশ খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সনাতনের দিকে। এক সময় বলেন, 'মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হইলে, খেত্যে দিবি। তারপর খবর দিবি আমাকে।' বলতে বলতে সুদর্শন আবার ডুবে যান কাগজপত্রের মধ্যে। ডুবে যান অর্থে, ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মনটা আসলে বড়ই চঞ্চল হয়ে রয়েছে আজ। কাজকর্মে মন বসছে না কিছুতেই। কাজে ডুবে

যাওয়ার চেষ্টা করে আসলে তিনি তাঁর বুকের ভেতরকার চঞ্চলতাকে পোষ মানাবার বিফল প্রয়াস চালাতে থাকেন।

আজ সকাল থেকে লাবণ্যরও দেখা নেই। সকালটা তার কাটে তেতলার ছাদে। পোষা পায়রা আর বিলিতি খরগোশগুলোকে রোজ সকালে নিজের হাতে খাওয়ায় সে। তারপর নেমে আসে দোতলায়, কখনও বা একতলায়। ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় দোতলায়,একতলায়, খিড়কির বাগানে, পুকুরের পাড়ে। একটা দাসী-গোছের মেয়ে সর্বদাই দৌড়ুতে থাকে ওর পিছু পিছু। আজ ওকে দেখতেই পাচ্ছেন না সুদর্শন। ওর মলের আওয়াজ কোন রহস্যময় কারণে একেবারেই নীরব হয়ে গেছে আজ। ভাবতে ভাবতে লাবণ্যর মুখখানা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।

এক সময় সুদর্শনের নির্দেশে সনাতন অরিজিৎকে নিয়ে আসে। সুদর্শন হাত নেড়ে চলে যেতে বলেন সনাতনকে।

এখন, ঘরের মধ্যে কেবল সুদর্শন আর অরিজিৎ। আর কেউ নেই। এমনকি আশে পাশেও নয়। বাইরে ঝলমল করছে রোদ্দুর। ভেজা মাটির বুক থেকে সোঁদা গন্ধ মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়।

একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন সুদর্শন। হাত দুয়েক তফাতে একটা চেয়ারে অরিজিৎ। পরনে ধবধবে ধুতি, গেঞ্জি। প্রশস্ত বুকখানি চিতিয়ে সে বসে রয়েছে সুদর্শনের সুমুখে। সুদর্শন ওকে নিষ্পলক দেখছিলেন। শিকারি বেড়ালের চোখে পরখ করছিলেন ওর নাড়ি-নক্ষত্র। এক সময় গম্ভীর গলায় শুধোন, 'কে তুমি? পরিচয় কী?'

'বলব না।'

ওর দিকে এক ঝলক তাকান সুদর্শন।

'কাল রাতে উই বেলগাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিলে কেন?'

'তাও বলব না।' একরোখা জবাব বেরিয়ে আসে অরিজিতের দু'ঠোঁট ভেঙে।

জবাব শুনে বিস্ময়ে থ হয়ে যান সুদর্শন। এমন কাঠ-কাঠ জবাব, সিংহগড়ের সুদর্শন সিংহবাবুর মুখের ওপর, কল্পনাও করতে পারে না কেউ।

'বলবে না?'

'না।' ঠোঁট চেপে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় অরিজিৎ, 'তবে শুধু এটুকুই বলতে পারি, কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না আমার।'

সেটা বিশ্বাস করেন সুদর্শন। মনুষ্য-চরিত্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়ে সহজেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয় অভ্রান্ত।

সুদর্শন লক্ষ করেন, অরিজিতের পা থেকে মাথা অবধি সারা শরীর জুড়ে এক দুর্দমনীয় যৌবনের জোয়ার আসছে। এক দৃপ্ত পৌরুষ তার শরীরের খাঁজে খাঁজে সোচ্চার। অথচ কী সরল পবিত্র মুখমণ্ডল। চোখদুটিতে কী স্বচ্ছ বাঙময় দৃষ্টি। কী অপূর্ব তেজ। নিজের অজান্তেই বুঝি সুদর্শনের সারা মন এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে যায়।

'তুমি কি ইখ্যেনে দিনকয় থাকত্যে চাও?'

এমন প্রশ্নে আচমকা মুখ তোলে অরিজিৎ। সরাসরি চোখ রাখে সুদর্শনের চোখে। একটুক্ষণ কী যেন ভাবে। ঘন চুলের জঙ্গলে সুপুষ্ট আঙুল চালায়।

বলে, 'আপনার অসুবিধে না হলে, থাকতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে।'

সুদর্শনের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আশ্রয়দাতার ওপর শর্ত আরোপ করছে আশ্রয়প্রার্থী, কী বিষম স্পর্ধা, দুঃসাহস!

'শর্তটা বল।' খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন সুদর্শন।

'আমি যেদিন খুশি, যখন খুশি চলে যেতে পারব। কেউ বাধা দেবে না আমায়।' দৃপ্ত গলায় অরিজিৎ বলে।

মনে মনে তখন দারুণ উপভোগ করছেন সুদর্শন। বুকের মধ্যে খুশি তখন বাধা মানছে না। শুধু টের পাচ্ছেন, আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে তাঁর নিজের মধ্যেও বাস করত এমনিতর এক দুরন্ত, দুর্বিনীত জেদী যুবক। একরোখা, দুঃসাহসী।

সুদর্শন সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেলেন। সরযুর কাছে। সরযু বোধ করি ভেতরে ভেতরে ভীষণ উৎসুক ছিল, কিন্তু মুখ, চোখ, চোখের তারা দেখে বোঝবার উপায় নেই তা। সুদর্শন অরিজিতের সঙ্গে কথাবার্তার সারাংশটুকু বলেন সরযুকে। চোখ বড় বড় করে শুনতে থাকে সরযু। আরও কিছু শোনার আশায় তাকিয়ে থাকে ওঁর মুখের দিকে।

'বেশ বড় ঘরের ছেইলা।' পরিতৃপ্ত গলায় বলেন সুদর্শন, 'শরীরে কোন তেজী পুরুষের রক্ত বইছে।'

শুনে সরযুর মুখখানা অজান্তে নরম হয়ে আসে, 'এমন বাউণ্ডুল্যা কেন?'

এ কথার জবাব সেই মুহূর্তে সুদর্শনেরও জানা ছিল না। কিছু আন্দাজ করে থাকলেও সঠিক ভাষা দিয়ে তা বোঝাবার ক্ষমতা নেই। এ কেবল উপলব্ধি করবার বিষয়। উষ্ণ রক্ত যার শরীরে বয়, সে-ই কেবল বোঝে, এর জ্বলন সামলানো কত কঠিন। পাহাড়ী নদীর মতো তার তীব্র দুরন্ত গতি, অপরিসীম প্রাণশক্তি। নদীর খাত অবশ্যি তিনদিকে আবদ্ধ থাকে, কেবল আকাশের দিকটাই খোলা। অসীম জলরাশি প্রচণ্ড বেগে ফুলে উঠে দু'কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে দু'ধারের বিস্তীর্ণ ভূমিতে। কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরে যে রক্তের নদী বয়, তার সে উপায় নেই। নেই, নেই। চার পাশ থেকে অবরুদ্ধ বন্দী সে নদী। শিরা-উপশিরার খাতের মধ্যে শরীরের অন্তর্গত অসংখ্য রক্ত-নদী যখন ফুঁসে ওঠে, তখন শরীর জুড়ে সে এক অসহনীয় যন্ত্রণা। কোনদিকেই নির্গমনের পথ নেই, শিরা-উপশিরার কঠিন বন্ধনীর মধ্যে টগবগে রক্ত দাপাদাপি করে অনর্থ বাধায় সারাক্ষণ। সে অনর্থের টানে কেউ রাজ্যজয়ে বেরোয়, কেউ সহস্র রমণীর তৃষ্ণা মেটায়, কেউ বা পাগলের মতো ছুটোছুটি জুড়ে দেয় ব্রহ্মাণ্ডের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

ছেলেটি বোধ করি শেষের দলের।

কিন্তু এ সব কথা অত নিটোল করে বোঝানো যাবে না সরযুকে। সে চেষ্টাও করেন না সুদর্শন। কেবল মুখে হালকা হাসির ঢেউ তুলে বলেন, 'বড় ঘরের খামখিয়ালি ছেইলারা অনেক সময় অমন বাউণ্ডুল্যা হয়।'

সরযু নিঝ্‌ঝুম হয়ে কত কিছু ভাবতে থাকে।

পরপর সাতদিন কেটে গেল। অরিজিৎ সিংহগড় ছেড়ে যাওয়ার নামটিও করে না। ওর সবগুলি শর্ত মেনে নিয়েছেন সুদর্শন। স্বেচ্ছায়। এমনকি সরযুও অনুনয় করে বলেনি

কিছু। মুখ ফুটে তো নয়ই, চোখের তারায়ও না। তবুও কেন যে মেনে নিলেন এমন দুর্বিনীত যুবকের বেয়াড়া শর্তগুলো, নিজের মধ্যেই পরিষ্কার নয় সে সব। যদি বা কোনওগোপন ইচ্ছা বুঁজকুড়ি মেরে থাকে মনের অতলে, প্রকাশযোগ্য নয় তা অন্যের কাছে। নয়, নয়।

অন্দরমহল থেকে রোজ চার বেলা নিয়ম করে খাবার পাঠায় সরযু। ছেলেটা খায়-দায়, তারপর সারাদিন ধরে যে কেমন করে কাটায়, তার খোঁজ পুরোপুরি পায় না সরযু। সুদূর অন্দর মহলের দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কয়েকবার দেখেছে ছেলেটিকে। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দৃপ্ত ঋজু চেহারা। হাঁটবার ধরনটাও বড়ই মানানসই। সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। যখন শিব মন্দিরের সামনে বসে থাকে, বাগানে পায়চারি করে, কেবল আকাশের দিক ছাড়া আর কোন দিকেই তাকায় না।

একদিন সরযুর শোবার ঘরে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিলেন সুদর্শন। সরযু এসে দাঁড়াল সামনে। সুদর্শন মুখ তুলে তাকান। ওর চোখে চোখ রেখেই বুঝে ফেলেন মনের ভাষা। কিছু বলতে চায় সরযু।

সুদর্শন প্রশ্রয় মাখানো গলায় বলেন, 'কিছো বলবে?'

সরযু মুহূর্তকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, একটু ইতস্তত করে, তারপর বলে, 'অরিজিৎ মানে কী?'

সরযুর আচমকা এমন প্রশ্নে একটু বুঝি চমক খান সুদর্শন। সোজা হয়ে বসেন। সরাসরি চোখ রাখেন সরযুর চোখে। বলেন, 'হঠাৎ এমন প্রশ্ন?'

বিস্ময়ের মাত্রাখানি বুঝি কিঞ্চিৎ বেশি ফুটে উঠেছিল সুদর্শনের চোখে তারায়, মুখমণ্ডলের পেশীতে,গলার স্বরে। সরযু অপ্রস্তুত বোধ করে।

সামলে নিয়ে বলে, 'এমনি জানতে চাইছি। বলুন না।'

সুদর্শন আবার আধশোওয়া হন। একটা আলতো হাই তোলেন। মুখ থেকে মুছে ফেলেন তাবৎ বিস্ময়ের রেখাগুলি। খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'অরিজিৎ মানে, যে শত্রুকে জয় করেছে।'

শোনামাত্রই সরযুর চোখ-মুখ ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। ওর সারা মুখে এক ধরনের তৃপ্তির আভাস পান সুদর্শন। তাঁর বিস্ময় তুঙ্গে ওঠে। তবে কি তাঁর মতোই, একই কথা ভাবছে সরযুও! তিনি তো আর শুধু-শুধুই, কেবল উদারতা দেখানোর জন্য আশ্রয় দেননি, এই জেদী, একরোখা যুবককে।

'এ ছোকরার কিন্তু অনেক শত্রু।' বলতে বলতে সুদর্শন ধীরে ধীরে সরযুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে, 'এবং শত্রুর হাতেই হয়ত বা উয়ার মরণ।'

শুনেই সরযু দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ওর সারা শরীর অজান্তে কেঁপে ওঠে বুঝি। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে বলে, 'অমন বলছেন কেন?'

সরযুর চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সুদর্শন। বলেন, 'এমন ঘোর জোয়ারের দিনে অমন ছেইলার কত শত্রু, কত বিপদ। ভিতরে বাইরে। এ সময়ে মানুষ যে সর্বক্ষণ নিজেকেই চাবকাতে চায় অক্লান্ত। নিজের চাবুকে যে বড়ই বিষজ্বালা। আমি তো বুঝি, নিজেকে দিয়েই বুঝি, এখন উয়ার চারপাশে, বাইরে ভিতরে, বাঁশমুগরা সাপের মতো কিলবিল ঘুরছে কত সর্বনাশা মুহূর্ত। তুমি উ সব বুঝবে নাই ঠিক ঠিক।' তবু সরযুকে প্রাণপণ বোঝাবার চেষ্টা চালান সুদর্শন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু বলে অবশেষে থামেন তিনি।

সরযু বুঝি সত্যিই এ সব কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না। সে কেবল পলকহীন তাকিয়ে থাকে স্বামীর মুখের দিকে। ঠোঁট দুটো তার নিঃশব্দে কাঁপতে থাকে। সারা মুখে অসংখ্য চেনা- অচেনা রেখা অবিরাম ভাঙচুর হয়ে রূপ বদলায়। একটু একটু করে কালো হয়ে আসে ওর মুখ। শঙ্কায়, উৎকণ্ঠায়।

১০. এক পাতাল-গভীর ইঁদারার গল্প

বেলশুলিয়া মহালের পুরনো গোমস্তা ছিল গগন কুচলান। সিংহবাবুদের পক্ষে সেই মহাল পরিচালনা, আদায়-ওয়াশিল করত। সিংহবাবুদের এক-আধজন বছরে এক-আধবার গিয়ে দেখে আসত মহালের কাজকর্ম। সিংহবাবুদের একখানা কাচারিঘর ছিল বেলশুলিয়ায়। মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। আরামের বাড়তি কোন ব্যবস্থাই নেই সেখানে। খুব ঠেকায় না পড়লে, সিংহবাবু বংশের কেউই পা বাড়াত না ওদিকে। কেবল একজন ছাড়া।

সে ছিল প্রতাপলাল। সুদর্শনের ভাই। সে শুধু বেলশুলিয়ার মহালে যেতেই চাইত না, ওই মহালের এক পাতাল-গভীর ইঁদারায় পড়ে প্রায় মরতে বসেছিল। শেষ মুহূর্তে কোন গতিকে তার প্রাণ বাঁচে। অনেকখানি আশা নিয়ে, সেই কারণেই, শঙ্করপ্রসাদকে বেলশুলিয়ার মহালে পাঠিয়েছিলেন সুদর্শন। বড় আশা ছিল মনে, ওই ইঁদারা থেকে কোন মতেই রেহাই পাবে না শঙ্করপ্রসাদ। সুদর্শন খোঁজ-খবব নিয়ে দেখেছেন ইঁদারাখানা এখনও মজেনি। বরং তার গভীরতা আরও বেড়েছে। এখনও তার তলায় টলটলে কাকচক্ষু জল। শঙ্করপ্রসাদকে ওই জলের টানে ইঁদারার কাছে যেতে হবেই।

শঙ্করপ্রসাদ যেদিন বেলশুলিয়া রওনা দিল, সুদর্শন নিশ্চিত খবর পেয়েছিলেন, লাবণ্য সারাদিন এক নাগাড়ে কেঁদেছে। কুটোটি কাটেনি দাঁতে। দিন দুয়েক বাদে ওকে স্বচক্ষে দেখলেন সুদর্শন। ওঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল লাবণ্য। ঠিক সেই মুহূর্তে সুদর্শনের মনে হয়েছিল, লাবণ্য আর ছোটটি নেই। বছর-পনের বয়েসে বিয়ে হয়েছে ওর। এখন ওর বয়েস সতের-আঠারর বেশি হওয়ার কথা নয়। এই বয়েসে কোন মেয়ে কি এতখানি সাবালিকা হয়? সবাইযের চোখের আড়ালে নারী হয়ে ওঠে কি? বোধ হয় ওঠে। কারণ সেদিন সুদর্শনের সামনে যে দাঁড়িয়েছিল, দু'চোখে বাক্যহারা রোষ নিয়ে, সে ওঁর আদরের বালিকাটি নয়, সে এক পরিপূর্ণা নারী। মেয়েরা বোধ করি, ত্রিনয়না। দু'টো চোখ দিয়ে যা দেখতে পায় না, তৃতীয় নয়ন দিয়ে তা দেখে ফেলে। ওর দু'চোখের ভাষা পড়ে সেদিন বিস্ময়াহত হয়েছিলেন সুদর্শন। সিংহবাবু বংশের জামাই, সে মহালে গিয়েছে আদায়-ওয়াশিলে, এ এমনই এক পরিচিত স্বাভাবিক ঘটনা যে সিংহবাবু বংশের মেয়েদের এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সুদর্শনের কোন সন্দেহই ছিল না, সিংহগড়ের চৌহদ্দির মধ্যে বসবাস করলেও, লাবণ্য কী করে যেন বুঝতে পেরেছিল আসল ব্যাপারটা। আশ্চর্য!

সুদর্শন এবং তাঁর ছোটভাই প্রতাপলাল সেই শৈশব থেকেই ছিল পরস্পরের প্রতিযোগী। প্রতাপলাল তার একমাত্র সন্তান হরবল্লভের মধ্যেও সফলভাবে পুঁততে পেরেছিল সেই চিরকালীন অসূয়ার বীজ। যদিও দ্বারিকাপ্রসাদ, নিজের জীবদ্দশায় দু'ভাইয়ের তালুক-মুলুকের পুরোপুরি ভাগ-ব্যবচ্ছেদ করে, সেই মতো সমস্ত কাগজপত্র একেবারে পরিষ্কার করে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে করে দু'মহলের প্রতিযোগিতা এবং রেষারেষি তিলমাত্র কমেনি। বরং দ্বারিকাপ্রসাদ মারা যাবার পর প্রতাপলাল আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সেই

প্রতাপলাল যখন বেলশুলিয়ার একটা গভীর ইঁদারায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন সুদর্শন তারিয়ে তারিয়ে তা উপভোগ করেছেন। প্রতাপলালের দুর্গতির কথা বলবার আগে ইঁদারাটার কথাটা বলা দরকার।

বেলশুলিয়ার মহালে, কাচারি-বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সুদর্শনের ঠাকুরদা, পরমেশ্বর সিংহবাবু বানিয়েছিলেন এক শিবমন্দির। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবা গোপেশ্বরকে। গদাধর চক্রবর্তীরা ওই মন্দিরের বংশানুক্রমে পূজারী। সেই সুবাদে বেশ খানিকটা নিষ্কর জমি ভোগ করে ওরা। গদাধর চক্রবর্তীর বড় মেয়ে পারুলবালা ছিল বাল-বিধবা। সুদর্শন তাকে দেখেননি। তবে তার রূপের খ্যাতি শুনেছেন বহুজনের মুখে। প্রদীপের মতো কমনীয় নয়, সে রূপ নাকি জ্বলন্ত আগুনের মতো আগ্রাসী। তার স্বভাবচরিত্র নিয়েও অনেক খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে কানে। কথাগুলো যে মিথ্যে ছিল না, তার প্রমাণ মিলল, প্রতাপলাল ওখানে যাওয়ার পর। প্রতাপলালের বয়স তখন চল্লিশের বেশি নয়। ঘরে তার পরমাসুন্দরী স্ত্রী। তার বিদ্যা-বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ন মর্যাদাজ্ঞান দেখে খুব ভরসা হত। সে-ই কিনা মহাল দেখতে গিয়ে সামান্য এক পুরুতের মেয়ের কবলে পড়ল। পরনারীগমন সিংহবাবু বংশের পুরুষদের ক্ষেত্রে কোন অস্বাভাবিক ঘটনাই নয়। গদাধর চক্রবর্তীর বিধবা মেয়েটাকে কেবল ভোগ করলে, সুদর্শনের কিছুই মনে হত না। কিন্তু ভোগ নয়, প্রতাপলাল একেবারে গভীর ইঁদারার তরল পাঁকে ডুবতে লাগল ক্রমাগত। মেয়েটা ওকে নাকে দড়ি পরিয়ে বশ করে ফেলল।

তখনও বেলশুলিয়ার মহাল ছিল সিংহবাবুদের দু'ভাইয়ের এজমালি তালুক। দু'তরফের হয়ে প্রতাপলাল যেত মহাল দেখাশোনার কাজে। গদাধর চক্রবর্তী ছিল নিরীহ এবং সর্বার্থে একজন সজ্জন ব্যক্তি। অন্নদাতা প্রভু তথা স্বজাতির মানুষটিকে সে সাধ্যাতিরিক্ত যত্নআত্তি করত। চার বেলা চক্রবর্তীর কুটির থেকে খাবার যেত কাচারি-বাড়িতে। আর অসুখেবিসুখে তো কথাই নেই। চক্রবর্তীর পুরো পরিবারখানি পড়ে থাকত কাচারিতে। বিশেষ করে বড় মেয়ে পারুলবালা। সতের আঠার বছর বয়েসে একটি টলটলে কাকচক্ষু জলের সুগভীর ইঁদারা।

ক্রমশ প্রতাপলালের বেলশুলিয়া যাওয়া বেড়ে গেল। যে মুলুকে কেউই যেতে চায় না, প্রতাপলাল যেন পা বাড়িয়ে থাকে ওখানে যাওয়ার তরে। গেলেও আগে এক হপ্তার বেশি থাকত না। ক্রমশ সেটা মাসে পৌঁছুল। কানাঘুষোয় অনেক কথা শুনতে পান সুদর্শন। চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে খাবার পৌঁছুনোর ব্যবস্থাটা বাতিল করে দিয়েছে প্রতাপলাল। তার বদলে কাচারি-বাড়িতেই করে নিয়েছে রান্নার ব্যবস্থা। পারুলবালাকে রাঁধুনী হিসেবে বহাল করেছে। সকালের জলখাবার থেকে রাতের দুধ গরম অবধি সবকিছু পারুলবালাই করে। বামুনের বিধবা মেয়ে, বাবুদের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ নিয়েছে, এতে আপত্তি করবার কিছুই থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। প্রতাপলালকে তিলে তিলে গ্রাস করে ফেলছিল রূপসী মেয়েটি। কাকচক্ষু জলের তলাকার তরল পাঁকে একটু একটু করে ডুবছিল প্রতাপলাল। নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছিল পারুলবালাকে নিয়ে, শত চক্ষুর সুমুখে। সারাক্ষণ ওকে নিয়েই মগ্ন হয়ে ছিল। শুনে তাজ্জব বনে যান সুদর্শন। সিংহবাবু বংশের ছেলে, নারীলিপ্সা তার সহজাত। কিন্তু তাই বলে সে কিনা এক পুরুত বামুনের বিধবা মেয়ের জন্য বিশ্ব-চরাচর ভুলতে বসেছে। কী লজ্জা। প্রতাপলালের প্রতি ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের পাশাপাশি একটি বিপরীত অনুভূতির স্রোত

বইত মনের মধ্যে। সিংহবাবু বংশের অমন তাগড়া সিংহতনয়টিকে পরম অবলীলায় গিলে ফেলেছে, কেমন সে মেয়ে। কী এমন আছে তার। মনের গভীরে অনেকদিন যাবৎ লুকোনো ছিল সেই সাধ। পারুলবালাকে বারেকের তরে চাক্ষুষ করা। সুদর্শনের ভীষণ ইচ্ছে করেছিল, একবার দু'দিনের তরে বেলশুলিয়ায় যান। নিজের তালুক, একবার কেন, দশবার যেতে পারেন। কিন্তু বহু কষ্টে সামলে নিয়েছেন সে টান। তখন প্রতাপলালের স্ত্রী কুন্দবালা দু'বার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে। রাতগুলো নিদ্রাহীন কেটে যায় তার। সুদর্শন নিয়মিত এ সবের খোঁজখবর রাখেন। প্রতাপলালের পরিবারের বিপর্যস্ত মুখখানা দেখতে দেখতে তাঁর নাভিদেশ থেকে কুলকুলিয়ে ওঠে হাসি। পাশাপাশি ওই সর্বনাশী রূপসী মেয়েটির প্রতি জমতে থাকে, এক দুর্নিবার কৌতূহল।

১১. লাবণ্যর দিনরাত্রি

লাবণ্যর বয়েস তখন দশ।

ফুটন্ত পদ্মের মতো গোলাপী মুখখানি তার। খুবই নরম, পবিত্র। ঝকঝকে চোখের তারায় আলো-ছায়া খেলা করে দিনরাত। বড়ই খামখেয়ালী আর অভিমানী মেয়েটি।

আগে, মাঝে মাঝে, দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সে নিচে নামত। অন্দর পেরিয়ে চলে আসত বাইরে। কাচারি-ঘরের লাগাও গোলাঘরগুলো। সারবন্দী অনেক গোলাঘর। তারই চালের মধ্যে বাসা বেঁধেছে অনেক-অনেক জাতের পায়রা। কী বিচিত্র রঙ তাদের পালকে, কী সুন্দর গ্রীবাভঙ্গির মুদ্রা। দিনে একবার মাত্র তাদের সঙ্গে দেখা হয় লাবণ্যর, তেতলার ছাদে। তাতে বুঝি ওর মন ভরে না। ওদের টানেই বোধ করি দিনের মধ্যে যখন তখন ছুটে আসত সে বাইরের মহলে। শাঁখের মত পা'দুটিতে নূপুর বেজে যেত রুমঝুম।

সম্প্রতি বাইরের মহলে আসছিল না লাবণ্য। সনাতনদার মুখেই শুনেছিল এক আজব ছেলের কাহিনী। সেদিন ঝড়-ঝাপটার রাতে আচমকা এসেছে। বাইরের ঘরে থাকে সে। তাকে নিয়ে সিংহগড়ের অনেক জল্পনা, সর্বত্র। একটা জমাট কৌতূহল লাবণ্যর কচি বুকখানা জুড়ে। কোথায় তার বাড়িঘর, সেখানে কে কে থাকে, কিছুই নাকি জানে না কেউ। কেবল বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে সঙ্গোপনে কথা হয় ওই ছেলের। ছেলেটাকে দূর থেকে দেখেছে লাবণ্য। বেশ ডাকাবুকো চেহারা। ভীষণ ফরসা আর লম্বা। হাঁটায়-চলায় ভীষণ দেমাক। ছেলেটাকে নিয়ে লাবণ্যর কৌতূহল মাঝে মাঝে অদম্য হয়ে ওঠে, ফুটে বেরতে চায়। সরযুকে প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলে সে। সরযুর মারফত এ সব খবর সুদর্শনের কানে আসে প্রায়ই।

আসলে সিংহগড়ে লাবণ্যর কোন সঙ্গী নেই। পাশেই সিংহবাবু বংশের আর এক তরফ থাকে। প্রতাপলাল। ওর ছেলে হরবল্লভ বয়েসে লাবণ্যর চেয়ে ঢের বড়। তাছাড়া ওই তরফের সঙ্গে আজ দীর্ঘদিন মুখ দেখাদেখির সম্পর্ক নেই এ তরফের। কাজেই সিংহগড়ে লাবণ্যর দিনগুলো একা একাই কাটে। সুদর্শনকে সেই বাচ্চা বয়েস থেকেই ভয় করে লাবণ্য, সমীহ করে। আর সরযু, তার দু'চোখে তো সর্বক্ষণ টলটল করে এক জলভরা মেঘ। সিংহগড়ের ঝি-চাকরেরাও সারাক্ষণ বেজায় চুপচাপ। মেপে মেপে কথা বলে ওরা, নিচু গলায়। সুদর্শন বোঝেন, একটা থমথমে নিস্তব্ধ প্রাসাদে লাবণ্যর দিনগুলো কাটে। বৈভবে, একাকীত্বে।

কিছুদিন হল, তেতলার ছাদে লোহার জাল দেওয়া একাধিক বাক্সে ডজনখানেক বিলিতি খরগোশ পুষেছে লাবণ্য। সাদা ধবধবে গায়ের লোম, তুলোর মতো নরম। জমানো রক্তের মতো লাল চোখগুলি ওদের। ওরা সারাক্ষণ ছুটে বেড়ায়। ওই মহার্ঘ বাক্সের মধ্যে। ছোলা, বাদাম আর তরকারির খোসা খায়। ওদের সঙ্গে খেলা, খুনসুটি করে দিনের অনেকখানি সময় কাটে লাবণ্যর। মাঝে মাঝে ওর ইচ্ছে করে, বাইরের মহলে একটিবার যায়। অরিজিতের সম্পর্কে ওর কৌতূহল কতখানি, তা তো সুদর্শন জানেন। ওর নিশ্চয়ই খুব ইচ্ছে করে, পায়রা দেখার ছলে বাইরে গিয়ে অরিজিতকে একটিবার খুব কাছ থেকে দেখে আসে। সরযুর তো মায়ের মন, সে নির্ঘাৎ আরও ভালভাবে বোঝে সেটা।

সরযুকে একান্তে বলেন সুদর্শন, 'যায় না কেন? অত যখন কৌতূহল মেয়ার, একদিন গিয়ে দেখে এলেই পারে।'

'উয়ার ভারি ভয় করে।' সরযু যেন মেয়ের হয়েই জবাব দেয়, 'এমন ঘর-পালানো বাউণ্ডুলা ছেইলা, লাবণ্যর ভয় হয়, যদি কাছাকাছি গেলেই আচমকা কিছো শুধিয়ে বসে।'

সুদর্শন বলেন, 'ভয় কিসের? উ ছোকরা কি বাঘ না ভালুক?'

সরযু সে কথার জবাব দেয় না।

মাঝে মাঝে বাইরের কাচারিঘরে গিয়ে বসেন সুদর্শন। আদায়পত্তর হয়, দাদন বিলি চলে। মাঝে মাঝে পাইক পাঠিয়ে ধরে আনা হয় বেআদব প্রজাদের। প্রশস্ত উঠোনের মধ্যিখানে বেঁধে যৎপরোনাস্তি শাসন চলে। অরিজিৎ সে সময়টা তার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যেই বসে থাকে। মাঝে মাঝে বাঁকুড়া সদর থেকে অফিসাররা আসেন দু'এক জনা, বিষ্টুপুর থানার বড়বাবু এসে রাত্রিবাস করে যান। অনেক রাত অবধি মদ-মাংসের হুল্লোড় চলে। নিজের ঘরে বসে সবকিছু নিঃশব্দে দেখে যায়, শুনে যায় অরিজিৎ। কোন প্রশ্ন করে না। কথা বলে না কারও সঙ্গেই। আগন্তুকদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহল বশে শুধোয়, 'ছেলেটি কে?'

'আমার এক দূর আত্মীয়ের ছেইলা।' চটপট জবাব দেন সুদর্শন, 'খুব বড়লোক উয়ারা। ছেইলাটার মাথায় একটু গোলমাল আছে। বাড়িতে থাকতে চায় না বেশিদিন। ইখেনে এনে রেখেছি উয়াকে। কাচারির কাজকর্ম শিখছে।'

একদিন সুদর্শন অরিজিতকে একান্তে শুধোন, 'তুমার নামটা তো জানি। পদবিটা বলতে আপত্তি আছে?'

অল্পক্ষণ সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর মনের ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করে অরিজিৎ। তারপর মৃদু গলায় বলে, 'বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'তুমার লিখাপড়া কদ্দুর।'

'বি. এ. পাস করেছি।'

শুনেই সুদর্শনের মনখানা খুশিতে ভরে যায় অজান্তে।

আচমকা শুধোন, 'তুমাদের উদিগে আদায়-পত্তর কেমন? প্রজারা নিয়মিত খাজনা-টাজনা দিচ্ছে তুমাদের?'

অরিজিৎ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুদর্শনের দিকে। চোখ মুখ সহসা অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে আসে ওর।

বলে, 'আমি জমিদার বংশের ছেলে কিনা জানবার চেষ্টা করছেন তো?'

ধরা পড়ে গিয়ে সুদর্শন ভেতরে ভেতরে অপ্রস্তুতের একশেষ। কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে অবস্থাটা সামাল দেবার চেষ্টা করেন।

'একটা কথা বলব ভাবছিলম।' প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন সুদর্শন, 'ইখেনে তুমার শুধু-মুদু থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে নাই। হয়ত বা পাঁচজনে পাঁচ কথা ভাবছে।'

অরিজিৎ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সুদর্শনের দিকে। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আমি আজ বিকালেই চলে যাব।'

মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুদর্শন।

মোলায়েম গলায় বলেন, 'আমি কিন্তু উটা বলতে চাই নাই। বলছিল্যম, তুমি বি. এ. পাশ করেছ, ইখ্যেনে থেকে আমার লাবণ্যকে তো পড়াতে পার স্বচ্ছন্দে। তুমারও সময় কাটবেক তাতে।'

অরিজিৎ সোজাসুজি চোখ রাখে সুদর্শনে চোখে; ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির ঝিলিক খেলে যায় বুঝি।

বলে, 'তাতে পাঁচজনে কিছু বলবে না?'

খোঁচাটা সরাসরি বিঁধে যায় বুকে। হজম করেন সুদর্শন। গম্ভীর গলায় বলেন, ' সে ভাবনা আমার। তুমার লয়।'

দু'হাতের ফরসা আঙুলগুলো দিয়ে চুলের গোছা আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ ভাবে অরিজিৎ।

এক সময় বলে, ' ভেবে দেখি।'

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পুরো সিংহগড়ে। বাইরের থেকে আসা ওই বাবুটি লাবণ্য দিদিমণিকে পড়াবে রোজ। কথাটা সরযুও শুনেছে। লাবণ্যর কানেও গেছে। কিছুদিন আগে অবধি মণি মাস্টার এসে লাবণ্যকে পড়িয়ে যেত রোজ। সম্প্রতি ওর পড়াশুনো বন্ধ। মণি মাস্টারকে সুদর্শন তাড়িয়ে দিয়েছেন। মণি মাস্টার এই গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলে মাস্টারি করত। সকাল সন্ধে লাবণ্যকে পড়িয়ে যেত। সেই বাবদে সুদর্শন বিঘে-পাঁচেক জমিও বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন ওকে, চাষবাস করবার জন্য।

তেতলার ছাদে আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন সুদর্শন। সরযু এসে বসল পাশটিতে। বসেই রইল। অনেকদিনই ওঁরা এইভাবে বসে থাকেন চুপচাপ। অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পান না স্পষ্টভাবে। কেবল দু'জনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু আওয়াজ মিলিয়ে যায় হাওয়ায়।

একসময়ে সরযু মুখ খুলল, 'আপনি নাকি উই ছেইলাটাকে বলেছেন লাবণ্যকে পড়াতে?'

'বলেছিল্যম বটে। লাবণ্য শুন্যেছে?'

'শুন্যেছে।'

'কী বলে মেয়া? লৈতন মাস্টার পছন্দ হয়েছে উয়ার?'

'উয়ার তো কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নাই। আবার ভয়ও পাচ্ছে ভিতরে ভিতরে।'

'ভয় কেন?'

'আমি কী কর্যে জানব সিটা?'

'তুমি লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা কর নাই?'

'উ কী জবাব দিবেক? সব ভয়কে কি উ চিনে?'

সুদর্শন এক ঝলক তাকান সরযূর দিকে। চকিতে কত কিছু ভাবনা খেলে বেড়ায় মনে। শুধোতে ইচ্ছে করে সরযুকে, সব ভয়কে কি তুমি নিজে চেন, সরযু? মুখে বলেন, 'যাগ গা, মেয়া তুমার রাজি কি না, বল।'

'সে তো এখন একপায়ে খাড়া। তাক থিকে বইপত্তর নামিয়ে ঝেড়েঝুড়ে রেখ্যেছে। আর দু'বেলাই শুধাচ্ছে, মা, লতুন মাস্টার মশাই কবে থিকে পড়াবেক আমাকে?'

সুদর্শন নিঃশব্দে হাসেন। সরযু বুঝি আধো-অন্ধকারে সে হাসি দেখতে পায় না।

'অত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাকে বলেন নাই তো?' সরযুর গলায় গাঢ় ক্ষোভ।

'বলি নাই। ভেবেছিল্যাম, বলব।'

সরযু বুঝি মনে মনে আহত হয়। প্রকাশ করে না সেটা। বলে, 'জানা নাই, চিনা নাই, উ পড়াবেক লাবণ্যকে?'

' কেন? ক্ষতি কী? পড়াবেক বৈ তো লয়।'

সরযুর মনে বুঝি গভীর সন্দেহ দোল খায়। সুদর্শনের কথাগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। রহস্যচারী এই মানুষটার মনের তল খুঁজে খুঁজে বুঝি হয়রান হয় সরযু। সে বুঝি ভাবছে, সুদর্শনের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরও কোন গূঢ় কারণ রয়েছে। সুদর্শন মনে মনে শুধুই হাসেন।

একটুখানি চুপ থেকে সরযু ফের জেরা শুরু করে, 'পড়াতে চাইলে, অন্য কুনো মাস্টার রাখুন। গাঁয়ের ইস্কুলে কি মাস্টারের অভাব?'

আধো অন্ধকারে সরযুর দিকে তাকান সুদর্শন। গলায় প্রচ্ছন্ন রহস্য মাখিয়ে বলেন, 'মেয়াকে যে পড়াতেই হবেক তার কী মানে আছে? যা পড়্যেছে, উই যথেষ্ট।'

'তবে ছেইলাটাকে রাখতে চাইছেন কেন?'

মিটিমিটি হাসছিলেন সুদর্শন। এবারও সরযু দেখতে পেল না সে হাসি।

বলেন, 'মেয়ার মাস্টার হিসাবে থাকুক না দিন কয়েক। পড়ানোর দরকার কী?'

সরযু অন্ধকারে চোখ জেলে দেখবার চেষ্টা করে সুদর্শনের মুখ। পড়বার চেষ্টা করে মনের ভাষা। সুদর্শনের কথাবার্তায় রহস্যখানি যেন আরও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে। কোনকিছু আগাম না ভেবে সুদর্শন যে কোন সিদ্ধান্ত নেন না কোনদিনও, সেটা সরযুর চেয়ে বেশি জানে কে। অরিজিতকে যে উনি লাবণ্যর মাস্টার বানাতে চাইছেন, তার পেছনেও কোন নিগূঢ় কারণ রয়েছে নির্ঘাৎ। শুধু, উপস্থিত, সরযুর সেটা বোধগম্য হচ্ছে না কিছুতেই। আর সেই কারণেই তার মনের শঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে পলে পলে। সুদর্শনের শুভ বুদ্ধির ওপর বুঝি তার তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। তার বুঝি আশঙ্কা হচ্ছে, গাঢ়তর আশঙ্কা, সুদর্শন তাঁর নিজস্ব কৌশলে এমন কিছু একটা করতে চাইছেন, যাতে ওই আগন্তুক ছেলেটার ক্ষতিও হয়ে যেতে

পারে। অথচ, এ ক'দিন যেটুকু দেখেছেন সুদর্শন, অপরিচিত ওই ছেলেটার কথায় সরযুর দু'চোখে ঘনিয়ে ওঠে দুধের পুরু সরের মতো গাঢ় মমতা এবং মমতাজনিত স্বাভাবিক আশঙ্কা। সুদর্শন সরযুকে সময় দেন, ভাবতে দেন। তাকে শঙ্কামুক্ত করবার কথাটা মনেও আসে না ওঁর। রাতের আকাশের দিকে তাকান সুদর্শন। কাস্তের মত সরু চাঁদ দেখেন, তারাদের দেখেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, —একসময় মুখ নামিয়ে লক্ষ্য করেন, এক রাশ দুর্ভাবনা নিয়ে সরযু নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে ওঁর মুখের দিকে, চাতক পাখিটির মত।

সুদর্শন শব্দ করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ভয় নাই তুমার। অরিজিতের আপাতত কুনো ক্ষতির কথা ভাবছি নাই আমি।'

'তবে বলুন, কেন শুধু শুধু উয়াকে লাবণ্যর মাস্টার সাজিয়ে আটকে রাখত্যে চাইছেন?'

'মাস্টার সাজিয়ে'—শব্দ দুটো সুদর্শনের মনের মধ্যে সুক্ষ্ম তরঙ্গ তুলে যায়। অর্থাৎ সুদর্শনের ধারণা ষোল আনাই সঠিক। সরযু এটাকে পুরোপুরি সাজানো ব্যাপার ছাড়া কিছুই মনে করে না। তার চোখে পুরো ব্যাপারখানা দাবার ছকে একটা বোড়ে ঠেলে দেবার মতোই কৌশলসর্বস্ব এক সুচতুর সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

এক সময় আধো অন্ধকার ভেদ করে সুদর্শন খুব চাপা গলায় বলেন, 'ছেইলাটার এখন চল্যে যাবার উপায় নাই।'

১২. শঙ্করপ্রসাদের চিকিৎসা-বিভ্রাট

শঙ্করপ্রসাদ চলে গেছে বেলশুলিয়ার মহালে। সঙ্গে গিয়েছিল কৃষ্ণদাস। সে ফিরে এসে যা খবর দিল, তাতে সুদর্শনের মন নৃত্য শুরু করে। গদাধর চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে খাবার সরবরাহ নয়, পারুলবালাকে বহাল করা হয়েছে কাচারিবাড়িতে। ও-ই রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে শঙ্করপ্রসাদকে। দিনভর তত্ত্ব-তাঁলাশও নেবে।

'গদাধর চক্কোতি আপত্তি করে নাই?' সুদর্শন উৎফুল্ল হয়ে শুধোন।

'লয় আইজ্ঞা।' কৃষ্ণদাস হাসি চেপে জবাব দেয়, 'উ-বুড়া বামুন একেরে বর্তে গেছে। সিংহগড়ের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে সেবাযত্ন করবার সুযোগ পেয়েছে উয়ার মেয়া, হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে বুড়া।'

'বহুৎ আচ্ছা।' সুদর্শন দরাজ গলায় হুকুম দেন, 'গদাধর চক্কোত্তির নামে আরও দশ বিঘা জমিন বন্দোবস্ত কর্যে দাও। আর পুরুতগিরি বাবদ উয়ার মাসোহারা দ্বিগুণ কর্যে দাও। আর, দেখো, পারুলবালার পোশাকআশাক, সাজগোজ যেন ঠিকঠাক হয়। গদাধরকে ব্যাপারটা সমঝিয়ে দাও। দরকার হল্যে, সে-বাবদ আরও কিছো টাকাপইসা দিয়ে দাও বুড়াকে। সিংহবাবুদের কাচারির খাস রাঁধুনি সে মেয়া, ভাল ভাল কাপড়চুপড়, দু'চার থান গহনা—উ সব না হলে লোকে বলবেক কী?'

লাবণ্য সুদর্শনের সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। অভিমান নয়, এখন চোখাচোখি হলে তার চোখে জ্বলে ওঠে ক্রোধ। হলাহলের মত সেই চাপা ক্রোধ নিয়ে বাবার মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে সে।

একদিন সরযু অসময়ে এল সুদর্শনের কাছে। পাশটিতে বসল। সুদর্শন নিঃসন্দেহ ছিলেন, কোনও একান্ত কথা বলতে চায় সরযু।

'কিছু বইল্‌বে?' সরযুকে শুধোন সুদর্শন।

সরযু দাঁত দিয়ে নখ খোঁটে। মৃদু গলায় বলে, 'শঙ্করকে ইবার ফিরে আসতে বইল্‌লে হয়। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অনেক দিন আছে সে।'

সুদর্শন অবাক হওয়ার ভান করেন। বলেন, 'আছে তো কী হয়েছে? পুরুষ মানুষ, বিদেশে যাবেক, থাকবেক, নিজের তালুক-মুলুক সামলাবেক, ঘরে বস্যে বস্যে সে করবেক কী?'

সরযু ব্যাকুল চোখে তাকায় স্বামীর দিকে। জবাব দেয় না।

অনেকক্ষণ বাদে বলে, 'লাবণ্য খাবা-দাবা ছেড়্যেছে।'

'কেন?' সুদর্শন ঈষৎ বিরক্ত হন, 'লাবণ্য কি কচি খোকার মত আঁচলে বেঁইধে রাখতে চায় উয়াকে। উ ছোটটি লয়।'

দু'দণ্ড গুম মেরে বসে থাকে সরযু। তারপর ধীর গলায় বলে, 'ছোটটি লয় বলেই উয়াকে বুঝাতে লারি। কুনোদিন না কিছো একটা কর্যে বসে!'

সরযু ধীরপায়ে এসেছিল, ধীরপায়ে চলে যায়। মেয়েমানুষগুলোই এমনি। সুদর্শন ভাবেন। পুরুষমানুষকে কেবল দু'হাতের নরম খাঁচায় বেঁধে রেখেই ওদের সুখ। পুরুষমানুষের ওপর যে দুনিয়া চালনার ভার, সেটা ওরা কোনদিনও বুঝল না।

লাবণ্যও এসেছিল। এক ঘুরঘুট্টি সন্ধ্যায়। একাকী। তেতলার ছাদে আরামকেদারায় মটকা মেরে শুয়ে ছিলেন সুদর্শন। লাবণ্য অন্ধকার কেটে কেটে নিঃশব্দে এসেছিল। সুদর্শনের মাথার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুদর্শন তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, বুকের ওঠানামার শব্দ টের পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন নিজের আত্মজার অঙ্গের সুবাস, অন্তরের ঘ্রাণ।

এক সময় নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল লাবণ্য। একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি, কিন্তু সুদর্শন বুঝতে পেরেছিলেন কি কারণে এসেছিল লাবণ্য। আর কিছুই নয়, স্বামীর মুক্তি ভিক্ষে চাইতেই এসেছিল সে।

শঙ্করপ্রসাদ থাকে বেলশুলিয়ায়, আর সুদর্শন সিংহগড়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটান। ওকে নিয়ে কেবল লাবণ্য কিংবা সরযুর মনেই যে উৎকণ্ঠা তা তো নয়। উৎকণ্ঠা সুদর্শনের মনেও যে। আদায়-ওয়াসিল বাড়াবার অছিলায় ওকে পাঠিয়েছেন বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তো ওর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। শঙ্করপ্রসাদের সেই চিকিৎসাদি কেমন চলছে, তাই ভেবে সুদর্শনের একতিল স্বস্তি ছিল না মনে। পক্ষকাল বাদে, কাজেই, কৃষ্ণদাসকে ফের পাঠালেন বেলশুলিয়ার মহালে। শঙ্করপ্রসাদের রূপান্তরটুকু স্বচক্ষেই দেখে আসুক সে।

দিনকয় বাদে কৃষ্ণদাস ফিরে এসে দাঁড়ায় সুদর্শনের সুমুখে। সময় বুঝেই এসেছে সে, যখন কাছেপিঠে কেউই থাকে না।

সুদর্শন বলেন, 'আদায়-পত্তর কেমন চলছে? শঙ্করপ্রসাদের খবর কী?'

'আদায়-পত্তর হয়েছে কিছো কিছো। জামাইবাবু সমস্ত প্রজাদের ডেকে বৈঠক কর্যেছেন!'

'বৈঠক? কিসের বৈঠক?'

'যাতে সক্কলে কিছো কিছো খাজনা ওয়াসিল করে।'

এমন কথা সুদর্শন জীবনেও শোনেননি। আদায়-ওয়াসিলের অনুনয় জানিয়ে প্রজাদের সাথে বৈঠক। শরীরের তাবৎ রক্ত মাথায় উঠে যায় সুদর্শনের।

বলেন, 'উখ্যেনে সে আছে কেমন?'

কৃষ্ণদাসের চোখে মুখে চাপা ভয়।

'আছেন উনি ভালই—।' সসঙ্কোচে বলে সে, 'তবে—।'

কৃষ্ণদাসের চোখে সরাসরি চোখে রাখেন সুদর্শন। দু'চোখ দিয়েই দু'ঘা চাবুক কষান ওর পিঠে।

চাবুক খেয়ে যেন কুঁকড়ে যায় কৃষ্ণদাস। বলে, 'জামাইবাবুব এমনই কাণ্ড—এমন মানুষ—।'

'আহ, কৃষ্ণদাস!' সুদর্শন ওকে বেয়াড়া ধমক লাগান।

দু'হাত কচলাতে কচলাতে কৃষ্ণদাস বলেন, 'পারুলবালাকে দু'দিন না যেত্যেই ছুটি দিয়েছেন জামাইবাবু। উয়ার জা'গায় বহাল করেছেন এক বামুনের ল্যাংড়া ছা'কে। ছগ্‌রা উঁয়াকে রেঁধ্যে-বেড়্যে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে—।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সুদর্শন সিংহবাবু। অনেকক্ষণ। বুকের মধ্যে হাজার ভীমরুলের দংশন। শঙ্করপ্রসাদের ওপর যতটা নয়, তার চেয়েও হাজার গুণ রোষ জমে ওই মেয়েটার ওপর। ইচ্ছে করে লাথি মেরে শালীর মুখ ভেঙে দেন। লগদীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন শালীর শরীরখানা। একটা দুধের ছোকরাকে বশ করতে পারে না!

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল কৃষ্ণদাস, ফাঁসির আসামীর মতো, শাস্তির অপেক্ষায়।

মনের রোষ প্রাণপণে চেপে সুদর্শন হুকুম দেন, 'শঙ্করপ্রসাদকে ফিরে আসতে বল।'

মাথা নিচু করে চোখের সামনে থেকে সরে যায় কৃষ্ণদাস। পালিয়ে বাঁচে যেন। বসে বসে শুধু নিষ্ফল আক্রোশে ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া তখন আর কিছুই করবার ছিল না সুদর্শনের। ক্ষণিকের ভুলে, নিবুর্দ্ধিতায়, সিংহবাবু-বংশে ঢুকে গেল পুরুত-বামুনের রক্ত। তার খেসারত হয়ত বা দিতে হবে প্রজন্মকাল ধরে।

অথচ সবদিক থেকে সিংহবাবু-বংশের উপযুক্ত একজন তেজী পুরুষকে খোঁজবার কোনও ত্রুটি রাখেননি তো সুদর্শন সিংহবাবু। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষকে, যার হাড়ে-হাড়ে, রক্তে-রক্তে অবিরাম বাদ্যি বাজছে, ঝনাঝন আওয়াজ তুলে, শুকনো শিরীষ ফলের মতো। পাননি। শঙ্করপ্রসাদের মধ্যে সিংহবাবু-বংশের উত্তরাধিকারীকে তিলমাত্র পাননি তিনি। সেই জ্বালায় আজীবন জ্বলেছেন। যত জ্বলেছেন, তার চেয়েও বেশি নির্মম হয়েছেন। শিশু প্রিয়ব্রতর বুঝি দৃষ্টি এড়ায়নি সে সব। মাঝেমধ্যেই তাই মনে হয়, প্রিয়ব্রত কি প্রতিশোধ নিচ্ছে সুদর্শনের ওপর। সেই ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ করেছেন সুদর্শন, বাপের প্রতি প্রিয়ব্রতর অচলা ভক্তি। সেটা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি রকমেরই মনে হয়েছে মাঝে মাঝে। এও কি প্রিয়ব্রতর প্রতিশোধ নেওয়ার এক ধরন। বুঝতে পারেন না সুদর্শন, কিছুই বুঝতে পারেন না আজকাল। এ বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তাঁর রহস্যময় ঠেকে। চারপাশের মানুষজনকেও। কাদম্বরী, সরযূ, চন্দ্রকান্ত, লাবণ্য, শঙ্করপ্রসাদ, প্রিয়ব্রত, নিশান বাউরি, পরীক্ষিৎ বাউরি—সবাই এক একটি দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়। ইদানীং মনে হয়, জীবনে কারুর

কাছ থেকেই কোনও দিন সঠিক যুক্তিগ্রাহ্য আচরণ পাননি সুদর্শন। আত্মজ-স্বজনেরা চিরদিন একটা রহস্যের ঘেরাটোপে গা ঢেকে ঘোরাঘুরি করেছে তাঁর চারপাশে। তাঁর এই পঙ্গু জীবনে এই যে ওরা নিয়মিত আসে যায়, সেবা-শুশ্রূষা করে, কোনদিন তিলমাত্র ভাঁটা পড়ে না তাদের কর্তব্যকর্মে,—এও এক রহস্য। এই যে তাঁর মতো একজন মানুষ, লাট্টুর মতো ঘুরন্ত, কেবল শরীরের উর্ধ্বাংশটুকু নিয়ে বেঁচে রয়েছেন সচল মনুষ্য সমাজে, এও কি এক অপার রহস্য নয়!

১৩. সুদর্শনের স্বপ্নভঙ্গ

অরিজিৎ ততদিনে অনেক স্বচ্ছন্দ।

এখন সারা সিংহগড়ে মাস্টারমশাই নামে পরিচিত সে। যদিও একদিনের তরেও লাবণ্যকে পড়াতে বসেনি। লাবণ্য ইদানীং ভারি অস্বস্তি বোধ করে। সবাই একজনকে তার মাস্টারমশাই বলে জানবে, অথচ ছেলেটা কোন অর্থেই তার মাস্টার নয়, এতেই সে ভারী বিব্রত।

একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে সরযুকে শুধিয়েছিল, 'ছেইলাটা আসলে কে মা?'

'কোন্ ছেইলাটা?' সরযু প্রথমটায় বুঝতেই পারেনি।

'ওই, যাকে সব্বাই আমার মাস্টারমশাই বল্যে ডাকে।'

জবাবটা সরযুরও অজানা। কিন্তু সে কথাটা লাবণ্যকে বলতে সঙ্কোচ হয় তার। সরযু খুব গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, 'উহার বাড়ি অনেক অনেক দূরে।'

'আমাদের বাড়িতে থাকে কেন, মা?'

সরযু অস্বস্তি বোধ করে। জবাবটা স্পষ্ট জানা নেই তারও। প্রায় দু'মাস ছেলেটা রয়েছে সিংহগড়ে, অথচ ওর ব্যাপারে তেমন কিছুই জানা নেই সরযুর।

সরযু অরিজিতের উদ্দেশে নিয়মিত খাবার পাঠায়। বেশ যত্ন করেই দেয় সব কিছু। অবসর সময়ে সুদর্শনের কাছে ওই গল্পই করে বেশ জুত করে। সুস্বাদু আচার খাওয়ার মতো করে বলে সব। আগে নাকি সব কিছু চুপচাপ খেয়ে নিত ছেলেটা। এখন খেতে খেতে নিজের প্রতিক্রিয়াও জানায় সনাতন মারফত। কখনও তারিফ করে রান্নার, ঝাল-টাল বেশি হলে মৃদু অনুযোগও করে। সনাতনের মুখ থেকেই এ সব খবর পায় সরযু, সরযুর মুখ থেকে সুদর্শন। সরযু সব কিছু শুনে যায়,মনে মনে হাসে, মুখে কিছুই বলে না। পছন্দের খাবারটি ঘন ঘন পাঠায়। পরিমাণে বেশি। রান্নার খুঁতগুলো বামুন-মাসিকে বলে বলে শুধরে নেয়। আর, খাবার পাঠিয়েই হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে, সনাতন কখন ফিরে আসে।

সনাতন ফেরা মাত্রই সরযু আর সামলে রাখতে পারে না নিজেকে।

শুধোয়, 'আজ কী বল্ল্যাক্‌রে তুয়াদের মাস্টারমশাই?'

সনাতন কোনদিন বলে, খুব চেঁটেপুটে খেইয়েছে মা। কাঁকড়া পিঠাটা খোব ভাল হয়্যেছে, বলছিল। শুনে সরযুর মনখানা অজান্তে খুশিতে ভরে যায়। কোনদিন সনাতন বলে, আজ ভাল কইর্য়ো খায় নাই, মা। খাওয়াতে এক্কেবারেই মন ছিল নাই আইজ। বারম্বার খাওয়া থামিয়ে বইস্যে ছিল চুপচাপ। শুনে সরযুর বুকখানা অজান্তে ভারি হয়ে আসে। কেন রে, খায় নাই কেন? শরীর-টরীর খারাপ লয় তো! যা দেখি, ছুটে যা, গায়ে হাত দিয়ে দেখবি, জ্বর-

টর আছে কি না। সনাতন দুড়দুড়িয়ে সিঁড়ি ভেঙে চলে যায় মাস্টারমশাইয়ের শরীরের তত্ত্ব-তালাশ নিতে। ফিরে এসে বলে, লয় মা, গা'তো হুলের পারা ঠাণ্ডা। তবে কি মাথা-টাথা ধরল্যাক? যা দেখি, দৌড়ে যা। খোঁজ লিয়ে আয়। সনাতন হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙে। সেদিন আর সনাতনকে তিলমাত্র তিষ্ঠোতে দেয় না সরযু। সারাদিন ধরে বারবার ওকে ছোটাতে থাকে অরিজিতের খোঁজে। সারাদিন ধরে কেমন অস্থির হয়ে থাকে ওর মন। দোতলার বসবার ঘর থেকে সুদর্শন টের পান সনাতনের দৌড়োদৌড়ি, সরযুর আনচান অবস্থা, বাকিটা জানতে পারেন বিকেলে কিংবা সন্ধেবেলায় তেতলার ছাদে, কিংবা রাতের বেলায় সরযুর ঘরে রাত্রিবাস করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

'ছেলেটা আজ কিছুই খায় নাই, জানেন।'

'কিছুই খায় নাই?'

'নামমাত্র। অসুখ-বিসুখ বাধাল্যাক কিনা কে জানে!'

'না, না, আমি তো বিকালেই দেখল্যম উয়াকে। কিছুই তো মনে হইল্যাক নাই।'

'চোখে দেখে মানুষের রোগ-ব্যাধি বুঝা যায় নাকি?' সরযু স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট হয়, 'আপনি বরং কাল ভোলা ডাক্তারকে ডাকুন। লচেৎ কৃষ্ণদাসকে পাঠান বিষ্টুপুরে। সে গিয়ে ডেকে আনুক নিশীথ ডাক্তারকে।'

মনে মনে হাসেন সুদর্শন। বলেন, 'আচ্ছা সে হবেক। বল্যে দিচ্ছি কৃষ্ণদাসকে।'

সামান্য নিশ্চিন্ত মনে হয় সরযুকে। সে আরও একান্ত হয়ে বসে। বলে, 'ছেইল্যাটাকে আটক্যে রেখ্যেছেন কেন, বলবেন?'

সুদর্শন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন একটুক্ষণ। বলেন, 'বলল্যম না সেদিন, উয়ার এখন চল্যে যাবার উপায় নাই।'

'কেন? উপায় নাই কেন?' সরযুর দু'চোখে চাপা জেদ। অভিমান।

সুদর্শন একটু ইতস্তত করেন। সরযুকে কারণটা বলা ঠিক হবে কি না ভাবতে থাকেন বুঝি। অবশেষে বলেই ফেলেন, 'কথাটা যেন কোনক্রমেই ফাঁস না হয়। ছেইলাটা স্বদেশী। একটা মারাত্মক খুনের কেসে জড়িত।'

শোনা মাত্রই সরযুর মুখখানা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। চোখের তারা স্থির হয়ে যায় ওর। মুখ দিয়ে কথা জোগায় না। একেবারে বোবা হয়ে যায় সে।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ খোলে সরযু, 'ইখেনে তবে রেখ্যেছেন কেন উয়াকে? পুলিস যদি জানতে পারে?'

'পুলিস বোধ করি জানত্যে পের‍্যেছে।' সুদর্শনের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

ভয়ে বুঝি কাঠ হয়ে যায় সরযু, 'তবে?'

সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায় সুদর্শনের মন। বুকের মধ্যে তিরতিরিয়ে নাচতে থাকে এক ধরনের সুখ এবং শ্লাঘা। বলেন, 'ছেইলাটার ভীষণ সাহস আর তেজ। উই লিয়ে উয়ার দেমাকেরও অন্ত নাই বুঝি। উয়ার ধারণা, আমরা, সংসারী মানুষেরা, শালুকার জঙ্গলের খরগোশগুলার চেয়েও ভীতু। উয়াকে একটু বুঝাই দিতে চাই, আমি আসলে কী।'

সুদর্শনের কথাগুলো বুঝি দুর্বোধ্য লাগে সরযুর কানে। সুদর্শনও যে কম তেজী আর দুঃসাহসী নন, সেটা তো ও জানেই। কিন্তু নাবালক এক ছোকরাকে সিংহগড়ে ধরে রেখে, ওকে তিনি কী বুঝিয়ে দিতে চান, সেটা পুরোপুরি বোধগম্য হয় না সরযুর।

'আপনিও কি স্বদেশী হতে চান নাকি?' সরযু বাঁকা চোখে তাকায়, 'স্বদেশী হয়ে তেজ দেখাবার বয়স আপনার আছে?'

'স্বদেশী হত্যে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।' সুদর্শন হাল্কা হাসিতে উড়িয়ে দেন সরযুর কথাটা, 'উয়ার ধারণা, উ সিংহগড়ে থাকত্যে চাইলেও, আমি পুলিসের ভয়ে উয়াকে রাখত্যে সাহস পাব নাই। উয়ার উই দেমাকী বিশ্বাসটা আমি ভেঙ্গ্যে দিতে চাই। আমি উঁয়াকে বুঝাই দিতে চাই, সুদর্শন সিংহবাবু চাইলে কালসাপকে বিছানায় লিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মুরদ রাখে।'

সুদর্শনের গলার স্বর ক্রমশ-ভরাট হয়ে আসছিল। আপাতস্থির মুখের খোলস ছেড়ে চিরকালের সেই একরোখা মানুষটি বেরিয়ে আসতে চাইছিল। সরযু বুঝি চিনতে পারে সেই মানুষটিকে। চিন্তায় স্থির, কর্তব্যে অটল, ইস্পাতের মতো কঠিন, নির্মম এক মানুষ, যে বুঝি ইচ্ছে করলে ভোরের লাল টকটকে সূর্যকে বোঁটাশুদ্ধ ছিঁড়ে আনতে পারে অক্লেশে।

অরিজিতের সঙ্গে ইদানীং অল্প-সল্প ভাব হয়েছে সুদর্শনের। ওঁকে এখন অনেকখানি মেনে নিয়েছে সে, সুদর্শনও তাকে অনেকখানি। মাঝে মাঝে কাচারির বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেন সুদর্শন। গল্পগুজব করেন। অনেক বিষয়ে কথা বলেন দু'জনায়। দেশ-কাল, ঠাকুর-দ্যাবতা, রাজনীতি-অর্থনীতি, জমিদারি প্রথার সুফল-কুফল—আরও অনেক অনেক কিছু। ছেলেটার পড়াশোনা অগাধ। মনে মনে স্বীকার করতেই হয়। আর, এমন প্রখর যুক্তি দিয়ে কথা বলে, সুদর্শন হতবাক হয়ে যান। ওর কথাবার্তার ধরন, দুর্বিনীত ভাবখানা মাঝে মাঝে সুদর্শনের উষ্ণ রক্তকে আরও উষ্ণ করে তোলে। কিন্তু খেপে উঠতে গিয়েও ইদানীং সামলে নেবার অভ্যাসটা রপ্ত করেছেন সুদর্শন। কেবলমাত্র অরিজিতের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় ওর জন্য, করুণায় ভরে যায় মন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় এক বড়সড় জমিদার বংশের একটি মাত্র ছেলে সে। সেই ছেলে কি না আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে আজ পালিয়ে বেড়াচ্ছে, লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পদে পদে অনিশ্চিত হয়ে উঠছে তার জীবন। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই, শরীরের প্রতি যত্ন নেবার অবকাশ নেই। যে কোন মুহূর্তে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেলে তার জন্য ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। অথচ কত সুখ-সম্ভোগ, আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা ছিল তার জন্য, কত নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন, কিন্তু তার জন্মক্ষণে এমন এক তারা উঠেছিল আকাশে, সেই তারার শরীর থেকে আগুন নিয়ে সে জ্বলছে। এমন এক হাওয়া বয়েছিল, যা উড়িয়ে নিয়ে গেছে তার জীবনের সব কিছু সুখ-সম্ভোগের বাসনা। তার জীবনে এসেছে এমন এক কালপুরুষ, যে তাকে নিয়তির মতো ভুলপথে ঘুরিয়ে চলেছে আজীবনকাল। ভুল পথই, সুদর্শনের কোন সংশয় নেই তাতে। এ পথে ইংরেজদের একচুলও নড়ানো যাবে না। মাঝের থেকে অরিজিতের মতো কিছু অতি মহার্ঘ জীবন অকারণে শেষ হয়ে যাবে। অথচ এমন একটি ছেলেকে পেলে কী উপকারটাই না হত সুদর্শন সিংহবাবুর। এমন রূপে-গুণে, স্বাস্থ্যে-শৌর্যে দৃপ্ত, এমন সাহস, তেজ আর আত্মমর্যাদায় গরীয়ান—সুদর্শন যদি ষোল আনা দখল পেতেন এমন ছেলের, কত ভালপথেই না ব্যবহার করা যেত ওই ইস্পাতের টুকরোটিকে, কত শাণিত আমোঘ অস্ত্র ওকে বানানো যেত উত্তরপুরুষের স্বার্থে। এমনই একজনকে কত কাল ধরে যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন সুদর্শন। ভাবতে ভাবতে এক নিদারুণ হতাশায় মুষড়ে পড়েন তিনি। অরিজিৎ বুঝি সে হতাশার নাগাল পায় না।

এক সময় সুদর্শন খুব নরম গলায় বলেন, 'নিজের বাড়িতে থেক্যে, সংসারী হয়্যে কি দেশের কাজ করা যেত নাই?'

খুব তাচ্ছিল্য মেশানো গলায় অরিজিৎ জবাব দেয়, 'যাবে না কেন? করছেন তো কেউ কেউ।'

'তবে? তুমি কেন এমন ভয়ঙ্কর পথে এল্যে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে অরিজিৎ। তারপর দৃঢ় অথচ ধীর গলায় বলে, 'আমি দুধ আর তামাক একসঙ্গে খেতে পারি না।'

১৪. এক করুণ বিয়োগান্ত নাটকের প্রথম দৃশ্য

নিশুত রাতে কালকেশুতের ডালপালাগুলো দুলছিল হাওয়ায়। সুদর্শন সিংহবাবু জানলার গরাদ দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দেখছিলেন সেই দৃশ্য। কালকেশুতের ঝোপখানাকে একটি কালো কাপড়ের পুঁটলির মতো লাগছিল। ঝোপের ভেতরে একটুকরো আলোর বিন্দু। খুব খুঁটিয়ে নজর করলে পরে দেখা যায় আলোর ফুটকিটাকে। হতে পারে 'জনি পোকা'র আলো। হতে পারে সিংহগড়ের কোন পাইক লণ্ঠন নিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম করতে বসেছে ঝোপের আড়ালে। হতে পারে বহিরাগত কেউ, আলো জ্বালিয়ে কিছু খুঁজছে, কিংবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলোর সঙ্কেত পাঠাচ্ছে কাউকে। সঠিক নির্ণয় করা মুশকিল। তবে, এমনতর রাতে তেতলার ছাদে উঠে এই কালকেশুত ঝোপটার দিকে মুখ করে একমনে সরযুকে বহুবারই লণ্ঠন দোলাতে দেখেছেন সুদর্শন। রাত এখন অনেক। সুদর্শনের ঘুম আসছে না কিছুতেই। দুটো পায়েরই কাটা অংশে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় প্রদাহ শুরু হয়। এক নাগাড়ে শুয়ে-বসে থাকবার দরুন, শরীরের গাঁটে গাঁটে বাত ধরেছে। অমাবস্যা -পূর্ণিমায় তা আরও চাগাড় দিয়ে ওঠে। পিঠের শয্যাক্ষতগুলো দগদগে হয়ে উঠেছিল কিছুদিন। সম্প্রতি কৃষ্ণদাস বিষ্টুপুরের নিশীথ ডাক্তারের কাছ থেকে মলম এনেছে। সেই মলম রোজ সকালে, দুপুরে, রাতে লাগিয়ে দেয় সনাতন। কিন্তু রাতের বেলায় ঘুম না এলে ক্ষতস্থানের যন্ত্রণাকেই অসহ্য মনে হয়। অসহ্য, অসহ্য।

কালকেশুতের ঝোপ এড়িয়ে সুদর্শন চোখ চারালেন দূরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ততোধিক কালো ছোপ হয়ে জেগে রয়েছে কাঁড়ঘসার জঙ্গল। হরিণমুড়ির খাতটিকে অদ্দুর থেকে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যাচ্ছে না, কিন্তু সুদর্শনের কোনই সন্দেহ নেই, কাঁড়ঘসার জঙ্গল ঘেঁষে সে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। সুদর্শন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জঙ্গলটার দিকে। মনখানা ততক্ষণে কালো আঁধারের মধ্যে ডুবসাঁতার দিয়ে পৌঁছে গেছে বড়ামতলায়, মা-চণ্ডীর মন্দিরের সামনে, যেখানে কত কাল আগে এমনি এক ঘুরঘুট্টি রাতে সুদর্শনের চোখের সুমুখে অভিনীত হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্কর নাটক। সে নাটকের নায়ক ছিল চন্দ্রকান্ত আচার্য, আর নায়িকা ছিল সরযু।

সে-সব সুদর্শন সিংহবাবুর যৌবনের দিন। যখন সারা শরীরে দুর্দান্ত বেগে নীল রক্ত বইত। সন তেরশ দশ সাল। ঘোর শ্রাবণ মাস। সেদিনটা সুদর্শনের খুব মনে পড়ে।

সারাদিন আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি। কাদম্বরী তার নিজের মহলে বিশাল ঘটা করে সাবিত্রী-ব্রত করছে। ওন্দা থেকে কামাখ্যা চক্রবর্তী এসেছে হপ্তাটাকে আগে। গেল তিনদিন তিনরাত এক নাগাড়ে পুজো-আচ্চা চলছে। ঘি-পোড়ানো চলছে অবিরাম। এ নাকি ভারী শক্ত ব্রত।

এক-আধ বছর নয়, তের বছব ক্রমান্বয়ে ব্রত করে চতুর্দশ বছরে উদ্‌যাপন করতে হয়। শেষ বছরটিতেই ব্যাপারটা সবচেয়ে কষ্টকর। তিনদিন তিনরাত নির্জলা উপবাসে থাকতে হবে কাদম্বরীকে। চতুর্থ দিন প্রভাতে চোদ্দ কিংবা চোদ্দশ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে উপবাস ভাঙতে হবে চোদ্দ রকমের হাতে-ভাঙা ফল দিয়ে। ধাতব অস্ত্র দিয়ে কাটা চলবে না সে ফল। কেবল হাত দিয়েই ভাঙা যাবে এমন চোদ্দ রকমের ফল দাঁতে কেটে উপবাস ভঙ্গ করতে হবে। আসলে আত্মনিপীড়ন ছিল কাদম্বরীর কাছে এক ধরনের প্রিয় নেশার মতো। শরীর ও তার অন্তর্গত প্রাণীটিকে কষ্ট দেবার হাজার ছল-ছুতো খুঁজত সে।

'চোদ্দ রকমের ফল? নাকি চোদ্দশ রকমের? খোঁজ লিয়েছ?'

সুদর্শনের ঠাট্টার কোন জবাব দিত না কাদম্বরী। তাঁর মতো নাস্তিককে ও-সব বোঝাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিল সে।

আকাশভাঙা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ তল্লাটের সমস্ত ব্রাহ্মণ এসে হাজির হয়েছে সিংহগড়ে।

সুদর্শন কাদম্বরীকে শুধিয়েছিলেন, 'চোদ্দশ সাবালক বামুন চাই? নাকি বামুনের বাচ্চা দিয়েও চলবেক?'

এমন দিনে স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে নাই। কাদম্বরী উপবাসক্লিষ্ট ম্লান হাসি হেসে বলেছিল, 'তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।'

পুরুতদের মুখে সুদর্শন শুনেছিলেন, এই ব্রতটা পরপর চোদ্দ বছর পালন করলে মৃত স্বামীকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা অর্জন করে নারী। এটাই কাদম্বরীর সাবিত্রী-ব্রতর চতুর্দশ বছর।

সময় সন্ধ্যা। নিজের মহলে যাগযজ্ঞে মেতে রয়েছে কাদম্বরী। সুদর্শন তখন বাইরের মহলে এক গভীর আলোচনায় মত্ত। বড় নিদারুণ খবর বয়ে এনেছে নিমু বাউরি। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে সরযুর সম্পর্ক নিয়ে এক নিদারুণ হাড়কাঁপানো খবর। তখন সুদর্শনের বয়স আটত্রিশ। কাদম্বরীর একত্রিশ। সরযুর ষোল। তার দীর্ঘ ষোল বছরের দাম্পত্য জীবনেও সুদর্শনকে একটি সন্তান উপহার দিতে পারেনি কাদম্বরী। ধৈর্যের শেষ সোপানে টলোমলো দাঁড়িয়ে সে তাই তুকতাক, ব্রত-অনুষ্ঠান দিয়ে বাঁধতে চাইছিল তার সাত জন্মের স্বামীকে। কিন্তু সুদর্শন তখন এক অর্থে বদ্ধ উন্মাদ। কেবল কোনও গতিকে বংশ রক্ষার জন্য পাগল। রাধানগরের সুরেশ চক্রবর্তীর মেয়ে সরযুকে বিয়ে করবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দু'পক্ষেরই বাগ্‌দান সম্পূর্ণ। এখন কেবল দিনক্ষণ দেখে সরযুকে ঘরে তোলার অপেক্ষা।

আজ ব্রতের শেষ দিনে যজ্ঞের স্থানে সুদর্শনকে নাকি প্রয়োজন হবে। তাঁর পা দু'খানি নিজের কোলের ওপর তুলে কাদম্বরীর কী সব ক্রিয়াকলাপ রয়েছে আজ। অন্দর থেকে বেরবার সময় কাদম্বরী তাই পইপই করে বলে দিয়েছে, জলদি ফিরো আসবেন। বাইরে কুথাও যাবেন নাই। আপনি না এল্যে কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যাবেক।

বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। কিন্তু আকাশটা থমথম করছিল তখনও। সুদর্শন নিমু বাউরির মুখ থেকে মন দিয়ে শুনছিলেন চন্দ্রকান্তের দুঃসাহসের কথা। সিংহগড়ের উত্তরাধিকারী যাকে বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে, তার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে যে সাহস পায়, তার সঙ্গে সুদর্শনের এই মুহূর্তে বোঝাপড়া হওয়া দরকার। নিজের সম্পত্তিতে এসে হামলা করলে

অপরাধীকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হয় সেটা ভালই জানা আছে সিংহবাবুদের। চকিতে মনে পড়ে যায় শালুবার মঙ্গল শিকারির পরিণতি। বত্রিশভাগীর জঙ্গলে মহুল কুড়োচ্ছিল লোকটা। জঙ্গলটা ছিল সিংহবাবুদের। লগদীদের মুখে খবরটা পেয়েই সুদর্শনের বাবা দ্বারিকপ্রসাদ সিংহবাবু হুকুম দিলেন, 'উয়াকে কয়েদ কর। এক্ষুনি।'

মঙ্গল শিকারিকে বেঁধে নিয়ে বত্রিশভাগীর জঙ্গলে চললেন দ্বারিকপ্রসাদ। সঙ্গে গেল এক ডজন পাইক এবং লোড করা দোনলা বন্দুক। যে গাছটার তলায় মহুল কুড়োচ্ছিল মঙ্গল শিকারি, সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হল ওকে। তখন সন্ধে হয় হয়। গামীরতলার জঙ্গলের আড়ালে সূর্যের শেষ আভাও মিলিয়ে গেছে খানিক আগে। বন্দুকটা মঙ্গল শিকারির দিকে তাক করে খানিকক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন দ্বারিকপ্রসাদ। খানিক বাদে নাবিয়ে নিলেন বন্দুক।

একটুক্ষণ ভেবে বললেন, 'থাক, আজ এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আর নরহত্যা কইর্‌ব নাই।'

মঙ্গল শিকারি দু'চোখ মুদে থরথর করে কাঁপছিল। শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল সে। দ্বারিকাপ্রসাদের কথাগুলো কানে যাবার পর ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল। সহসা নাটকীয়ভাবে বেঁচে যাবার আনন্দে দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

দ্বারিকপ্রসাদ বললেন, 'চল্‌, ফির‍্যে যাই। সইন্‌ধা হইল্যাক।' বলেই পিছু ফিরে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

দু'একজন এগিয়ে যাচ্ছিল মঙ্গল শিকারির বাঁধনটা খুলতে। হাঁ-হাঁ করে উঠলেন দ্বারিকাপ্রসাদ।

বললেন, 'আরে! খুলিস কেন? মারব নাই বলেছি। বাঁধন খুলত্যে বলেছি?' বলেই মঙ্গল শিকারির দিকে কয়েক পলক তাকালেন তিনি, 'বাঁধা থাক্ উ। রাতভর। ভোরের দিকে পালে পালে ভালুক আসবেক মহুল খেইতে। বিচারের ভারটা উয়াদের হাতেই দিয়ে গেল্যম।'

সেদিন গাঢ় অন্ধকারে মঙ্গল শিকারিকে জঙ্গলের মধ্যে রেখে ফিরে এসেছিলেন দ্বারিকাপ্রসাদ। জনাকয়েক বিশ্বাসী পাইক থেকে গিয়েছিল গাছে চড়ে সারারাত মঙ্গলকে পাহারা দেবার জন্য। গভীর রাতে যাতে কেউ ওকে খুলে না দেয়।

পরের দিন দুপুর নাগাদ পাইকরা মঙ্গলকে খুলে নিয়ে এল গাছ থেকে। তাকে তখন আর চেনার উপায় ছিল না।

অথচ মঙ্গলের এই পরিণতির কারণ ওই বয়সে তেমন করে বোঝেননি সুদর্শন। বিষ্ণুপুরের রাজার জঙ্গলই হোক কিংবা জমিদারদের জঙ্গলই হোক, চিরকাল তাতে ফলপাকুড় পাড়ে, মহুল কুড়োয় বাউরি-বাগদি, লোহার-লায়েক-মাদোড়রা। তার জন্য কোনও রাজা-জমিদার অত বড় সাজা কখনই দেয় না সাধারণত। মঙ্গল শিকারির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম কেন হল সেটা সুদর্শনের কাছে এক ধাঁধা ছিল ওই বয়সে। বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, সে সাহস নেই। মাকে জিজ্ঞেস করেও লাভ নেই। কারণ, সুদর্শনের মা কঙ্কাবতী অনেক গুণের অধিকারিণী হলেও ওই প্রজা উৎপীড়নের রাজনীতিটা তিনি বুঝতেন না মোটেই।

মঙ্গল শিকারির শাস্তির কারণটা অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলেন সুদর্শন। সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু সব কিছুর মোদ্দা কথাটা ছিল, নিজের সম্পত্তি। সম্পত্তি গ্রাস কিংবা অর্জন এবং সুরক্ষা। তার জন্যই সব কিছু।

ওই মুহূর্তে সুদর্শনের সম্পত্তি বেহাত হতে চলেছে। সেই কথাটা মগজের মধ্যে কোষে কোষে ছড়িয়ে দিচ্ছে আগুন। ইচ্ছে করছে, চন্দ্রকান্তকে ঠিক তেমনি করেই মারেন, যেমনি করে মঙ্গল শিকারিকে মেরেছিলেন বাবা, স্বর্গীয় দ্বারিকাপ্রসাদ।

আবার হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামল। চরাচর ঢেকে গেল অবিরাম ধারায়। অন্দরমহল থেকে ভক্ত নাপিত এসে দাঁড়িয়েছে সুদর্শনের সামনে। বিড়বিড় করে নিবেদন করছে কথাটা। হুজুরকে একটি বার অন্দরে যেত্যে হব্যেক। মা-জননী বইসে রয়েছেন ঠায়। হুজুর না গেলে ব্রত সাঙ্গ হব্যেক নাই।

উদ্‌ভ্রান্ত চোখে আকাশটা দেখছিলেন সুদর্শন। এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। আলমারির ভেতর থেকে দোনলা বন্দুকটা নিয়ে ঝোলালেন কাঁধে। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললেন বড়ামতলার দিকে।

চন্দ্রকান্ত আচার্য জাতে ব্রাহ্মণ। চুয়ামসিনা থেকে ক্রোশ দেড়েক দূরে রাধানগর গাঁয়ে তার বাস। স্বাস্থ্যবান সুঠাম শরীর। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। চোখ দুটি গভীর। কাব্যে একটা উপাধিও ছিল তার। খানিকটা ইংরেজিও জানত। কিন্তু তার অর্থকৌলীন্য বলতে কিছুই ছিল না। ছিল না কোনও বংশকৌলীন্য। সেই কারণে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিল না। এতদসত্ত্বেও সে তার সুঠাম শরীর আর গ্রীষ্মের পাতকুঁয়োর মতো গভীর চোখদুটি দিয়ে যে কোনও নারীর বুকে নিমেষে ঝড় তুলতে পারত। আরও একটা গুণ ছিল চন্দ্রকান্তর। সে সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারত। নির্জন মাঠে বসে উদাসী সুরে বাঁশি বাজিয়ে সে চারপাশের প্রকৃতিকে কিছুক্ষণের জন্য অসাড় করে দিত পারত। অসাড়, অসাড়।

চন্দ্রকান্তর সঙ্গে সরযুর একটা সম্পর্কের কথা কানাঘুষোয় শুনেছিলেন সুদর্শন। ভাবী-স্ত্রীর এ হেন ব্যবহার তাঁকে পীড়া দিয়েছে একান্তে। এক দুর্দমনীয় ক্রোধ আর ঈর্ষা স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে বুকের মধ্যে। শুধু সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। সরযুকে পুরোপুরি হস্তগত করবার পর চন্দ্রকান্তের সব পাওনা সুদে-আসলে উশুল করে দেবার পরিকল্পনা ছিল সুদর্শনের।

তার আগেই ঘটে গেল অঘটনটা। সুদর্শন পরে জেনেছিলেন, বিয়ে করবার অনেক আগেই সরযুকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার মতলব ছিল চন্দ্রকান্তর মাথায়। সিংহের গুহার সামনেটিতে বসে ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করবার সাহস শৃগালের নাই। সুদর্শনের মেজাজটা এলাকার তাবৎ মানুষ তো জানেই। সেই কারণে সরযুকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিল চন্দ্রকান্ত। যেতও হয়ত। যদি না সরযু নামের যুবতী মেয়েটির বুকের মধ্যে একটি নারী বসে থাকত সারাক্ষণ। যার সমস্ত সত্তা জুড়ে সংসারের গন্ধ। সরযুই শেষ অবধি বেঁকে বসেছিল অবুঝের মতো। কুমারী অবস্থায় সে বাপের ঘর ছাড়বে না কোনও ভাবেই। ঘর ছাড়বার আগে তাকে প্রথামতো বিবাহ করতে হবে। চন্দ্রকান্ত তাকে অনেক বুঝিয়েছিল। এখানে বিবাহ করবার হাজার বিপদ। সিংহগড় কেঁপে উঠবে শোনা মাত্রই। সুদর্শন সিংহবাবু ক্ষুধার্ত হুঁড়ারের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এবং তার মতের বিরুদ্ধে যাবে, হেন সাহস চুয়ামসিনার চারপাশের

বিশটা গাঁয়ের নেই। অতএব সমাজপতির দল বিচারের আসর বসাবে। এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে চন্দ্রকান্ত আচার্যই। পরস্ত্রীহরণের তুল্য অপরাধ নেই। আর, যে মেয়ের জন্য বাক্‌দান হয়ে গেছে, সে তো বলতে গেলে পরস্ত্রীই। কিন্তু সরযু বুঝতে চায়নি। কিছুতেই না। বাধ্য হয়ে গাঁয়ের বাইরে কাঁড়ঘসার জঙ্গলের মধ্যে বড়ামগাছের তলায় মা-চণ্ডীর পুরনো মন্দিরের মধ্যে অতি গোপনে হাজির হয়েছিল দু'জনে। সন্ধ্যালগ্নে। দেবী চণ্ডীকে সাক্ষী রেখে মালাবদল আর সিঁদুর দান করবার সংকল্প নিয়ে। দেবীর সুমুখে গলবস্ত্র হয়ে কাকুতি জানাতে চেয়েছিল দুটি প্রাণ, শুভ জীবনের জন্য।

সিংহগড়ের অন্দরমহলে কাদম্বরী যখন তার ব্রত উদ্‌যাপনের তৃপ্তিতে বিভোর, ঠিক তখনই হাতে দোনলা বন্দুক বাগিয়ে সুদর্শন ছুট মারলেন বড়ামতলার দিকে। সঙ্গে জনাকয়েক পাইক। আকাশে মেঘ ছিল। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টিও পড়ছিল। তার মধ্যেও চাঁদের ঘসা আলোয় অন্ধকারটা কিঞ্চিৎ ফিকে লাগছিল।

মন্দিরের সামনে গিয়ে সুদর্শন দেখলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারকয়েক সজোরে ধাক্কাধাক্কি করেও কোনও সাড়া পেলেন না। পুরনো আমলের শক্তপোক্ত দরজা। ভাঙতেও সময় লাগে।

সুদর্শন চিৎকার করে বললেন, 'সরযু, দরজা খুল।'

চন্দ্রকান্তকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্যভাষায় গালি পাড়তে লাগলেন সুদর্শন।

শেষ অবধি দরজা ভেঙে ফেলবার হুকুম দিতে হল।

দরজা অবশ্যি ভাঙতে হল না। তার আগেই দরজা খুলে গেল। এবং লণ্ঠনের ম্লান আলোর সামনে এসে যে দাঁড়াল, তাকে দেখে বিস্ময়ে থ' হয়ে গেলেন সুদর্শন। অনেকক্ষণ চোখের পাতা ফেলতেও বুঝি ভুলে গেলেন তিনি। সরযু। লাজবস্ত্র পরিহিতা, সালংকারা, শুভ্র মসৃণ কপালে চন্দনের ফোঁটা। গলায় শ্বেত করবীর মালা। লণ্ঠনের ম্লান আলোয়, ওই গাঁ-ছাড়া নির্জন মন্দিরে সরযু যেন কোন অলৌকিক দেবী-প্রতিমা!

আধো-অন্ধকারে, চণ্ডীমাতার মন্দিরের প্রাচীন দরজায় হাত রেখে, সালংকারা এক জ্যোতির্ময়ী নারী! এখনও চোখ মুদলে সরযুর সেই মূর্তিখানি সুদর্শনের চোখের সুমুখে স্পষ্ট ভাসে।

সেদিন উপস্থিত সবাইয়ের ঘোর কাটতে সময় লেগেছিল ঢের। সম্বিত ফিরলে পরে সুদর্শন মন্দিরে ঢুকলেন। এবং দেখলেন, ভেতরে চন্দ্রকান্ত নেই। সুদর্শন পুরো ঘটনাটা পরে বিতাং করে শুনেছিলেন চন্দ্রকান্তর মুখেই, কাশী যাওয়ার পথে। তাঁরা দু'জনে তখন অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

১৫. ক্ষণস্থায়ী স্ফটিকের পাহাড়

বিকেলে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে থাকেন সুদর্শন। বেশ ঘন করে মারা দুধ। পুরু সর ভাসতে থাকে ওপরে। সাধারণত অন্দরমহলের বসবার ঘরে বসেই দুধটা খান, তারপর চলে আসেন খড়মে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বাইরের কাচারিমহলে।

সেদিন দুধটা না খেয়েই বাইরে এসে বসেছেন। ঘরের মধ্যে থাকলে দুধের গ্লাসটা ধরে দেয় সরযু স্বয়ং। বাইরের মহলে সে আসে না। সেদিন তাই সরযু সনাতনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে দুধ। দু'গ্লাস। বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটা ঘটেছে সুদর্শনেরই নির্দেশে।

কাচারিঘরের সামনে লম্বা বারান্দা। বারান্দার মাঝখানে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসেছেন সুদর্শন। পাশে আরও একখানা চেয়ার। সামনে বাহারি জলচৌকির ওপর দু'গ্লাস দুধ, রেকাবি ঢাকা দেওয়া।

অরিজিৎ কাছে আসতেই সুদর্শন বলেন, 'বসো।'

অরিজিৎ বসে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই তাকায় সুদর্শনের দিকে। সামনের বাগানে পুরনো গন্ধরাজের গাছটাতে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। সুদর্শনের চোখদুটো আটকে ছিল ওই গাছেই। একগ্লাস দুধ বাঁ হাতে তুলে নিয়ে অন্য গ্লাসখানা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেন অরিজিৎকে, 'লাও।'

অরিজিৎ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে গ্লাসখানি তুলে নেয়।

দুধের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক মারেন সুদর্শন। পুরু সরের বেশ খানিকটা টেনে নেন চুমুকের সঙ্গে। চোখ মুদে আয়েস করে চিবোতে থাকেন। আর চোখ মেলেই দেখতে পান বাগানের পুরনো গন্ধরাজের গাছটায় যেন খই ফুটেছে সাদা ফুলের। গেলাসখানা নামিয়ে রাখেন জলচৌকির ওপর।

সহসা সরল রেখায় চোখ রাখেন অরিজিতের মুখের ওপর, 'তুমাকে পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে, জান তো?'

দুধের গ্লাসখানা মুহূর্তে কেঁপে ওঠে অরিজিতের হাতে। সারা মুখের রেখা দ্রুততম গতিতে ভাঙচুর হয়।

'সরকারি হুলিয়া বার হয়েছে তুমার নামে।' অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায়, সাবলীল ভঙ্গিতে কথা ক'টি উচ্চারণ করেন সুদর্শন।

কিন্তু না, অরিজিতের বিস্ময়, উত্তেজনা আর শঙ্কার পারদখানি আর ওঠে না। বরং ধীরে ধীরে নেমে আসে। চোখমুখ ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসে। মুখ থেকে উধাও হয়ে যায় ভয়, শঙ্কা। বরং তার বদলে এক ধরনের কাঠিন্যে ভরে যায় ওর চোয়াল, চিবুক।

'তুমার, কাঁথির বাড়িতে ঘন ঘন হামলা চালাচ্ছে পুলিশ।' অরিজিতের প্রতিক্রিয়া মাপতে মাপতে সুদর্শন বলতে থাকেন, 'তুমার বাবাকে খুবই হয়রানি কচ্ছে উয়ারা।'

চুপ করে বসে থাকে অরিজিৎ। বজ্রাহতের মতো স্থির। দুধের গ্লাসখানি ধরাই থাকে হাতে, এবং সুদর্শন অবাক হয়ে যান, এমন একটা হাড়-কাঁপানো খবর পেল যে ছোকরা, দুধের গ্লাস ধরে তার হাতখানি কী আশ্চর্য রকমের স্থির, একটুও কাঁপছে না, আশ্চর্য। ছেলেটার বুকখানা কি সত্যি সত্যিই বজ্রের মত কঠিন। সুদর্শন যতখানি ভাবছেন, ভাবতে পারছেন, তার চেয়েও কি বেশি কঠিন!

'আপনি সব জানেন, দেখছি।' একটু বাদে খুব স্বাভাবিক অথচ নিচু গলায় বলে অরিজিৎ।

'জানি আমি বেশ কিছোদিন আগেই।' খুব হালকা অথচ রহস্যময় গলায় বলেন সুদর্শন, 'দুধটা খাও।'

অরিজিৎ গ্লাসটার দিকে দৃষ্টি ফেলে এতক্ষণে। তার হাতে যে এতক্ষণ ধরে একটা লোভনীয় পানীয়-পাত্র ধরা রয়েছে, সেটা বোধ করি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল সে। খেয়াল হতেই, নামিয়ে রাখল না, ধীরে ধীরে পান করতে লাগল দুধ। পুরো দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে

শেষ করে গ্লাসখানি ঠক করে নামিয়ে রাখল। সুদর্শন এটাও লক্ষ্য করলেন মনোযোগ দিয়ে। এমন, মাথার ওপর আকাশ-ভেঙে-পড়া খবরেও যে-ছোকরা অতখানি স্থির, নিরুত্তেজ থাকতে পারে, সাময়িক উত্তেজনা অত দ্রুত ও সহজে প্রশমিত করতে পারে, এমন ঢকঢকিয়ে দুধ খেতে পারে, তার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী যে তার কতখানি বশে, তা আর বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। সুদর্শনের সারা মন ভরে যায় এক অনাস্বাদিত পুলকে।

'সেদিন কি এই জন্যই বড়-দারোগা এসেছিল থানা থেকে?' অরিজিৎ শুধোয়।

দুধের পাত্রে তখনও চুমুক দিচ্ছিলেন সুদর্শন। খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেন, 'উনি মাঝে মাঝেই আসেন আমার ইখেনে।'

'আমার এখানে থাকাটা কি টের পেয়েছে?'

'পেতে পারে।' সুদর্শন গ্লাসখানা নামিয়ে রাখেন জলচৌকির ওপর, 'কিছোই উয়াদের চোখ এড়ায় না।'

'এতে কি আপনার বিপদ হতে পারে?'

সুদর্শন এবার পরিপূর্ণ চোখে তাকান অরিজিতের দিকে। নিজের অতখানি বিপদের মুহূর্তেও যে ছেলে অন্যের বিপদের কথা ভাবতে পারে, তার বুকের মাপ ও বিশালতা নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। বত্রিশভাগীর জঙ্গলের দিক থেকে ধেয়ে আসছে হাওয়া। ভারি সুখকর হাওয়া বইছে আজ। হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে গন্ধরাজের সুবাস। সুদর্শন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকেন। স্ফটিকের পাহাড়ের মতো শুভ্র মেঘ হরিণমুড়ি খালের ওপর। দেখতে দেখতে একসময় ফিরে আসেন কাচারিঘরে বারান্দায়।

বলেন, 'আমার বিপদের কথা তুমায় ভাবত্যে হবেক নাই। তুমি তুমার লিজের কথা ভাব।'

সুদর্শনের গলায় বুঝি ঈষৎ রূঢ়তা ছিল, কিঞ্চিৎ শ্লেষও, কিন্তু সে সব তিলমাত্র ছুঁলো না অরিজিৎকে। তার বদলে এক চিলতে অবজ্ঞার হাসি যেন চকিতে খেলে গেল ওর ঠোঁটে। সুদর্শনের দৃষ্টি এড়ায় না তা।

নিঃশেষিত গ্লাসখানা জলচৌকিতে রেখে দিয়ে সুদর্শন বলেন, 'থানার পুলিসগুলা আমার বড়ই ন্যাওটা। তাবাদে, আমি একজন সত্যিকারের রাজভক্ত জমিদার। আমার গড়ে উয়ারা হানা দিবেক নাই সহজে। তাবাদে, পুলিসের মুখ কী কইর‍্যে বন্ধ করত্যে হয় তার মোক্ষম উপায়গুলা আমি জানি। কিন্তু, আমি ভাইবছি অন্য কথা।'

অরিজিৎ খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সুদর্শনের কথা। দামাল হাওয়ায় ওর কোঁকড়ানো চুলের জঙ্গলে মাতামাতি চলছিল। একটু সময় নিয়ে সুদর্শন বলেন, 'ভাবছিল্যম, দু'একটা ইংরাজ মের‍্যে কী লাভ হয়, বলতে পার?'

ধক করে জ্বলে ওঠে অরিজিতের চোখ। পরক্ষণে খুব ক্লান্ত গলায় বলে, 'প্রশ্নটা ভীষণ পুরনো এবং অতি-ব্যবহারে জীর্ণ।' কাটা কাটা উচ্চারণে জবাব করে অরিজিৎ, 'এ প্রশ্নের জবাব অন্তত একশ বার দিয়েছি বাবাকে।'

'সঠিক জবাব একবার দিলেই যথেষ্ট। একশবার বলত্যে লাগে না। জবাবটা বোধ করি সঠিক লয়।'

'জবাবটা সঠিক।' অরিজিৎ সুদর্শনের কথার পিঠেই উত্তর দেয়, এক তিলও সময় নেয় না, 'কিন্তু ওটাকে সঠিক বলে মেনে নিতে গেলে জীবনে অনেক কিছু ছাড়তে হয়, অনেক ধন-সম্পদ, সুখ-আরাম, নিরাপত্তা...। সেই জন্যই—।'

সামান্য সময়ের জন্য বুঝি বোবা বনে যান সুদর্শন। অবাক চোখে দেখতে থাকেন ছেলেটাকে। গাঢ় স্বরে শুধোন, 'ছাড়ত্যে তুমার কষ্ট হয় না? তুমিও তো বেশ বড় বাড়ির ছেইলা।'

সে-কথায় কেমন উদাস হয়ে যায় অরিজিৎ। হাওয়ার দাপটে এলোমেলো চুলগুলোকে দু'হাত দিয়ে ঠিক করে নিতেও ভুলে যায় বুঝি।

এক সময় চোখ দুটোকে হাওয়ায় ভাসিয়ে বলে, 'হয় বৈকি। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট হয়। অনেক বেশি তীব্র আর অসহ্য। সর্বদাই আমি জ্বলতে থাকি ছেড়ে থাকবার জ্বালায়।'

সুদর্শন অনুপুঙ্খ দেখতে থাকেন অরিজিৎকে। ওর কথাগুলো কেমন দুর্বোধ্য হেঁয়ালি ঠেকে।

অরিজিৎ বলতে থাকে, 'সেই জন্যই আপনাদের মত ধৈর্য আর তিতিক্ষা দেখাতে পারি না আমি, আশায় আশায় পথ চেয়ে সারাটা জীবন কাটাতে পারি না। কখন আঙ্গুর ফলটা টুপ করে খসে পড়বে সে অপেক্ষায় এত সময় থাকা আমার পোষায় না। আমি অস্থির হয়ে উঠি। যে কোনও উপায়ে, দ্রুততম গতিতে কেড়ে কুড়ে নিতে চাই আমার স্থায়ী সম্পদ, সুখ, নিরাপত্তা, সম্মান— যা যা আমার প্রাপ্য, সবকিছু। আমি আদায় করে নিতে চাই, যে কোনও মূল্যে, যত জলদি পারি,—সম্ভব হলে এই মুহূর্তে।'

বলতে বলতে অরিজিতের চোখ-মুখ দ্রুত বদলে যেতে থাকে। তার দু'চোখ থেকে ঠিক্‌রে বেরোতে থাকে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎকণা।

বাতাস আর ততখানি আরামদায়ক নেই। একটা গুমোট ভাব আবহাওয়ায়। ঈশেন কোণে একচিলতে কালো মেঘ। হরিণমুড়ি খালের ওপরে স্ফটিকের পাহাড়টি রঙ বদলাচ্ছে দ্রুত। মনে হচ্ছে, সন্ধে নাগাদ বৃষ্টি নাববে আজ। অরিজিতের কথাগুলো সুদর্শনের বুকের মধ্যে এক ধরনের বাজনা তুলেছে। অচেনা তার তাল, লয়। মস্তিষ্কের কোষে কোষে এক ধরনের তোলপাড় ওঠে।

অরিজিৎ যা বলল, যেমন করে বলল, সে কথা, কোনদিন তেমন করে ভাবতে পারেন না সুদর্শন, ভাবতে চানও না। তবুও মনের গুমোট ভাবখানা তো কাটে না কিছুতেই।

একসময় অরিজিতের দিকে তাকান সুদর্শন। শান্ত গলায় বলেন, 'তুমি ইখ্যেনেই থাক, যতদিন খুশি, তুমার কুনো ভয় নাই।'

বাহ্যত ভাবলেশহীন মুখ অরিজিতের। কিন্তু সুদর্শন বুঝতে পারেন, ওর বুকের গভীরেও মৃদু অলোড়ন উঠেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু মনের সেই ভাবখানিকে চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই।

সেটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে তার পরের কথায়।

বলে, 'থাকছি, কিন্তু একটা ব্যাপার বড় অবাক করেছে আমায়।'

সুদর্শন নির্বাক তাকান ওর দিকে।

'আমাব এবং আমাব পরিবারের সম্পর্কে সবকিছু আপনি জানলেন কী করে?'

সুদর্শনের পক্ষে এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি শুধু সামান্য একটুখানি হাসি দিয়ে এড়িয়ে যান জবাব দেওয়ার দায়। তাকিয়ে থাকেন হরিণমুড়ির দিকে।

হরিণমুড়ির আকাশে স্ফটিকের পাহাড়গুলো দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো মেঘের আড়ালে। বহুকষ্টে দীর্ঘশ্বাস চাপেন সুদর্শন। যদিও তিনি জানেন, স্ফটিকের পাহাড়গুলো এবং ওদের শরীরে সপ্তরঙের ছটাগুলো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

১৬. ঝলসে ওঠা বুকের ছোরা

সুদর্শন তখন কসম খেয়ে বসে আছেন চন্দ্রকান্তর কাছে। অন্যকে হৃদয় দান করে বসে রয়েছে যে নারী, তার দেহটার ওপর এখন কোনই লোভ নেই তাঁর। সরযুর দেহখানি এখন ধর্মত চন্দ্রকান্তরই প্রাপ্য। চন্দ্রকান্ত নিক সরযুকে। সুখী করুক তাকে। এভাবেই চন্দ্রকান্তকে কথাগুলো বলেছিলেন সুদর্শন।

এ সব কাশী যাওয়ার পথের কথাবার্তা।

শামুকের মতো খোল থেকে মুখখানা ধীরে ধীরে বের করছিল চন্দ্রকান্ত। বিশ্বাস করে সুদর্শনের কাছে খোলসা করেছিল সেই সন্ধ্যার যাবতীয় ঘটনা।

চন্দ্রকান্ত যখন সরযুকে নিয়ে চণ্ডীমাতার মন্দিরের ভেতর, প্রলয় চলেছে তখন বাইরে। মন্দিরের ভেতরে বসে সুদর্শনের তর্জন-গর্জন, উত্তেজিত আস্ফালন ওর কানে ভেসে আসছিল যেন বহুদূর থেকে। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না, শব্দগুলো অস্পষ্ট ছিল,বয়ে যাওয়া জলের আওয়াজের মতো ক্ষীণ। চন্দ্রকান্ত বুঝতে পারছিল না শব্দগুলোর উৎস কোথায়। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল মন্দিরের সামনে থেকে, কিংবা পেছন থেকে, নাকি ওপর থেকে, কিংবা মাটির তলা থেকে উঠে আসছে। নাকি ওর নিজের বুকের ভেতর থেকে, তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের জায়গা থেকেই...।

হুঁশ হল যখন, সে তখন সুদর্শনের পাল্লার মধ্যে। দরজাখানি সামান্য খুলে দেখল, সুদর্শন এবং তার লেঠেলদের। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওরা এগিয়ে আসছে। দেখল ওদের আলো, লাঠি...শুনল ওদের চিৎকার। সামান্য সময় ছিল হাতে। মরিয়া হয়ে দৌড় মারল চন্দ্রকান্ত। সরযুকে সঙ্গে নেবার উপায় ছিল না তখন। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে দশ পা-ও দৌড়তে পারত না। বিশেষ করে ওই দুর্যোগের মধ্যে। যাবার সময় ওকে বলে গেল, যত জলদি সম্ভব তুমাকে লিয়ে যাব সরযু। রাতে কালকেশুতের ঝোপের কাছে আসব। আলো জ্বেল্যে সঙ্কেত পাঠাব। আলো জ্বেল্যে সঙ্কেত দিও। মন্দিরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

এতক্ষণ মন্দিরের দরজা কেন বন্ধ রেখেছিল সরযু, সেটা পরে বুঝেছিলেন সুদর্শন। চন্দ্রকান্তকে পালাবার সময় দিতে চেয়েছিল। ও জানত, যতক্ষণ মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকবে, ততক্ষণ সুদর্শন ভেবে নেবেন, চন্দ্রকান্ত মন্দিরের মধ্যেই রয়েছে। চূড়ান্ত বিপদের মুহূর্তেও এতখানি উপস্থিত বুদ্ধি কেমন করে সরযুর মাথায় এল, আজও সে-কথা ভাবলে অবাক হন সুদর্শন।

দরজা খোলার পর ওই অবস্থায় সরযুকে দেখে একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন সুদর্শন। দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার জোগাড়। চন্দ্রকান্তকে খুঁজে বের করবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করছিল। কিন্তু মন্দিরের আশেপাশের জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজেও সে রাতে চন্দ্রকান্তর হদিস কোন মতেই পেলেন না। মন্দিরের উত্তরে ও পূর্বে ঘন জঙ্গল, শালুকার জঙ্গলের সঙ্গে তার যোগ। অন্যদিকে কানশিকড়ার ভয়ঙ্কর শ্মশান। চন্দ্রকান্ত এই দুর্যোগের রাতে কোন্ দিকে পালাতে পারে সেটা আন্দাজ করা কঠিন ছিল। সুদর্শন হয়ত বা ভেবেছিলেন, সরযুকে যখন উদ্ধার করা গেছে, আর কী চাই।

পরে অবশ্যি বুঝেছিলেন, সরযুকে উদ্ধার করা যায়নি। সে চন্দ্রকান্তর সঙ্গেই গেছে। মনটাই তো মানুষ, দেহটা তো তার পরিচ্ছদ। পরবর্তী দিনগুলোতে সুদর্শন চন্দ্রকান্তর পেছনে অমন হিংস্র চিতার মতো ঘুরে বেড়াতেন কিনা সন্দেহ। সরযুকে ফিরে পাওয়ার পর তাকে বিয়ে করবারও কোন বাধা ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞ সমাজপতিরা একবাক্যে রায় দিয়েছিল, চন্দ্রকান্তর সঙ্গে সরযুর এই গোপন বিবাহ সব দিক থেকে অসিদ্ধ। শাস্ত্রমতে, সরযু কুমারী। কিন্তু ওই একটা চিন্তা সুদর্শনের মনটাকে অবিরাম কুরে কুরে খাচ্ছিল। সরযুকে উদ্ধার করা যায়নি। যায় নি, যায় নি। সে চন্দ্রকান্তর সঙ্গেই গেছে। শাস্ত্রমতে বিবাহ করলেও একটি যুবতী রমণীর মন-প্রাণ, সর্বস্ব, রেণু-রেণু হয়ে ভেসে বেড়াবে অন্য পুরুষের চারপাশে, সারাটা জীবন, এটা ভাবতে গেলেই সুদর্শনের সারা দেহে হাজারটা বিছের কামড়। বড় অসহায় লাগছিল। চন্দ্রকান্তকে বিজয়ী সম্রাটের মতো মনে হচ্ছিল। তিনদিন, তিনরাত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সুদর্শনের মাথার মধ্যে জ্বলছিল লক্ষ লক্ষ চিতা। বুকের মধ্যে পুড়ছিল সমগ্র ব্রহ্মান্ড। পুড়ছিল, পুড়ছিল।

খুঁজতে খুঁজতে একদিন গভীর রাতে চন্দ্রকান্তকে পাওয়া গেল বত্রিশভাগী জঙ্গলের মধ্যে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল একটা ছাতিম গাছের তলায়। সুদর্শনরা সদলে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালেন ওর শিয়রে, সাক্ষাৎ শমনের মতো। তাঁদের পায়ের শব্দে ততক্ষণে চোখ মেলেছে চন্দ্রকান্ত। তখন তার উঠে পালাবারও সামর্থ্য নেই। আধো অন্ধকারে সে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক।

চন্দ্রকান্তকে ওই রাতেই শেষ করে দেওয়া সুদর্শনের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে তার লাশটা পুঁতে দিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারতেন সিংহগড়ে। কিন্তু সুদর্শন সিংহবাবু অত কাঁচা কাজ করেন না। চন্দ্রকান্তকে বাঁচিয়ে রাখবার একান্ত প্রয়োজন ছিল তাঁর।

চন্দ্রকান্ত অপলক তাকিয়ে ছিল সুদর্শনের দিকে। জীবনের শেষতম মুহূর্তটি যে উপস্থিত সেটা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি বুঝি ওর।

অন্ধকারের মধ্যে চাপা গলায় সুদর্শন বলেন, 'ভেবো নাই, তুমাকে আমি মেরে ফেলত্যে আইছি। ভয় পেও নাই, উঠে বস।'

নীরবে সে হুকুম তামিল করল চন্দ্রকান্ত। উঠে বসল।

রুদ্র শিকারিসহ অন্য পাইকদের ফেরত পাঠিয়ে সুদর্শন বসলেন ওর পাশটিতে। চন্দ্রকান্তর চোখ-মুখ থেকে মৃত্যুভয়টা তখনও কাটেনি। চাঁদের ঝাপসা আলোয় সে আতঙ্কিত চোখে বারংবার তাকাচ্ছিল সুদর্শনের দিকে।

সুদর্শন ওর গায়ে মোলায়েম হাত রাখেন। বলেন, 'তুমাকে মেইরে ফেলাই উচিত ছিল আমার। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। তাবাদে, যে কাজ তুমি কর্যে ফেলেছ, তুমাকে মেইরে ফেললেও তার সুরাহা হবেক নাই।' একটুক্ষণ চুপ থেকে খুব আন্তরিক গলায় বলেন, 'আমি সরযুর জন্যই তুমাকে খুঁজতে বার হয়েছি।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে সুদর্শনের দুটি হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল চন্দ্রকান্ত। ভাঙা গলায় শুধোল, 'সরযু কেমন আছে?'

'কেমন থাকতে পারে, সিট্যা তুমিই আন্দাজ কর।' সুদর্শন আহত গলায় বলেন, 'এ সমাজে একটি ব্রাহ্মণ বংশের মেয়া যদি অবৈধ মতে বিয়া করে, আর বিয়ার পরপরই যদি স্বামী নিরুদ্দেশ হয়্যে যায়, তবে সমাজের মধ্যে উই মেয়ার কেমন কর্যে দিন কাটে, সিটা তুমিই ভেইবে দেখ।'

চন্দ্রকান্ত জবাব দিল না। নিদারুণ আক্ষেপে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

তাকে অনুতাপ করতে যথেষ্ট সময় মঞ্জুর করলেন সুদর্শন। অনুতাপ করা ভাল। তাতে মনের আগুন খানিকটা নেভে।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ থেকে হাত সরাল চন্দ্রকান্ত। সুদর্শনের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি এখন কী কইর্‌ব?'

সুদর্শন অল্পক্ষণ ভাবেন। বলেন, 'ইখন গাঁয়ে ফিরা তুমার পক্ষে মোটেই নিরাপদ লয়। সমাজপতিরা রেগে কাঁই হয়্যে রয়েছে। আমি চাইনা, সরযু এই বয়েসে বিধবা হোক।'

চন্দ্রকান্তর মস্তিষ্ক তখন ঠিক ঠিক কাজ করছিল না। পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝবার ক্ষমতাও বুঝি হারিয়ে ফেলেছিল সে। সুদর্শনের কথায় বোবার মতো তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। সুদর্শন ভেবে চিন্তে রায় দিলেন, 'তুমার বোধ করি ইখন অন্য কুথাও গিয়ে লুকাই থাকা উচিত। দূরে কুথাও। অন্তত কিছুদিন। যতক্ষণ না পুরা ব্যাপারটা থিতাই যায়, শান্ত হয় সমাজপতিদের রোষ।'

তারপর, কাশী যাওয়ার দীর্ঘ পথ...'। রাস্তা, লোকালয়, নদী, প্রান্তর, অরণ্য,কত জায়গাতেই কত নিভৃত মুহূর্তে ঝলসে উঠেছে সুদর্শনের বুকের ছোরাখানি। কত নিবিড় উষ্ণতার মুহূর্তে, কত অন্তরঙ্গ দৃষ্টির আড়ালে।

১৭. এক ম্লান-আলোর-ফুল-ছড়ানো বিকেল

সকাল থেকেই সরযু রান্নাঘরে ঢুকেছে। নিজের হাতে রান্না করছে অনেক পদ। এমনিতে নিজের হাতে কদাচিৎ রান্না করে সরযু। বামুনমাসিই করে সব। তার আজকের এই ব্যস্ততা দেখে শুধু সুদর্শনই নয়, লাবণ্যও অবাক হয়। সরযুর প্রিয় পদগুলো সুদর্শন এবং লাবণ্যর চেনা। বাড়িতে কোনও উপলক্ষ না হলে সরযু নিজের হাতে এসব পদ রাঁধে না।

মায়ের গলা জড়িয়ে আদুরে ভঙ্গিতে শুধোয় লাবণ্য, 'তুমি আজ এতসব রাঁধছ কেন মা?'

'এমনি।' সরযুর সংক্ষিপ্ত জবাব।

'না, এমনি লয়। বল। আজ তো আমার জন্মদিন লয়। তবে?'

অনেকক্ষণ কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সরযু। মেয়ের কাছে কথাটা বলতে ইচ্ছে করছিল না তার। তবুও, লাবণ্যর পীড়াপীড়িতে এক সময় বলতেই হয়।

'তুয়ার মাস্টারমশাই যে আজ চল্যে যাবেক মা।'

কথাটা বুঝি মুহূর্তে বিঁধে যায় লাবণ্যর কচি বুকে। বেশ খানিকক্ষণ কিছুই বলতে পারে না সে। কোনদিনও ছেলেটার কাছে একদণ্ডও পড়েনি লাবণ্য। তবুও অনেক কথাই ভারি সংক্রামক। সকলের মুখে রোজ শুনে লাবণ্যর মনের মধ্যে এক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, ও লাবণ্যর মাস্টারমশাই। পড়াক বা না পড়াক, আলাপ হোক, না হোক, ছেলেটা লাবণ্যর মাস্টারমশাই। মা-ও তো আজ কেমন অনায়াসে বলল কথাটা, 'তুয়ার মাস্টারমশাই চল্যে যাচ্ছে মা।'

সুদর্শনই কথাটা সরযুকে বলেছিলেন গেল রাতে। 'অরিজিৎ চল্যে যাচ্ছে কাল।'

সহসা যেন আঁতকে উঠেছিল সরযু। বিছানায় উঠে বসেছিল চকিতে, ' কেন? চল্যে যাচ্ছে কেন?'

'আমিই উয়াকে চল্যে যেতে বলেছি।' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দেন সুদর্শন।

'কেন?' সরযু যেন ভীষণ অবাক হয়, 'কেন চল্যে যেত্যে বল্যেছেন?'

'যাক, চলে যাক।' নিভে আসা গলায় জবাব দেন সুদর্শন, 'পরের ছেইলার তরে অতখানি ঝুঁকি লিয়া ঠিক লয়। বলা নাই যায়, কখন কী হয়।'

সরযু অপলক তাকিয়ে থাকে সুদর্শনের মুখের দিকে। কথাটা একেবারেই বিশ্বাস হয় না ওর। সারা জীবন ধরে সে দেখছে মানুষটাকে। কোনও কিছুর ভয়ে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার মতো লোক যে তিনি নন, সেটা ভালই জানে সরযু। লণ্ঠনের মৃদু আলো পড়েছে বিছানার মধ্যে। সেই আলোয় সে অল্প ঝুঁকে পড়ে নিরীখ করতে থাকে সুদর্শনের সারা মুখ, মুখের প্রতিটি রেখা। এক সময় লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের বালিশে মাথা রাখে আবার।

একটু বাদে শুধোয়, 'কখন যাবেক উ?'

'কাল, খুব ভোরে।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটে।

পাশের পালঙ্কে লাবণ্য ঘুমিয়ে কাদা। সরযু ফের নিস্তব্ধতা ভাঙে। জেদী গলায় বলে, 'সকালে লয়, কাল বিকালে যাবেক উ।'

'বেশ।' পাশ ফিরে শোন সুদর্শন। এবং অনেকক্ষণ ধরে উপলব্ধি করেন, পাশটিতে সরযু শুয়ে শুয়ে উসখুস করছে কেবল।

সেদিন বুঝি সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি সরযু।

সারারাত না ঘুমোলেও পরের দিন খুব ভোর ভোর বিছানা ছেড়েছিল সরযু। সুদর্শন চোখ খুলেই দেখেছেন, সরযু পাশে নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছেন, পুবের জানালার ধারে স্থির প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পাট ভাঙা গরদের শাড়ি পরেছে। সাদা খোল, লাল পাড়ের শাড়ি। চুলের রাশ নামিয়ে দিয়েছে পিঠে। ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে চুলের ডগা বেয়ে। অর্থাৎ ওই সাত সকালেই সরযুর স্নান সারা।

ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে সারা পিঠে, সুদর্শনের কেন জানি বিশ্বাস হয়, তরুণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে তার বুকখানিও ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সেই সকালে সরযু নির্ঘাৎ কাঁদছিল।

ওই তিন-চার মাসে অরিজিতের সঙ্গে একদিনও কথাবার্তা হয়নি সরযুর। এ বাড়ির আভিজাত্যের প্রশ্ন ছিল সেটা। কিন্তু তবুও ওই সকালে সরযুর আচার-আচরণে মনে হচ্ছিল, যেন কোনও আপনার জনকে চিরদিনের মত বিদায় দিচ্ছে সে। সুদর্শনের মুখেই বহুবার শুনেছে সরযু, ছেলেটা ভীষণ বুদ্ধিমান আর অসম্ভব সাহসী। জমিদারী চালালে ও এক দুঁদে জমিদার হতে পারত। ওর কলিজায় জোয়ার খেলে সব সময়।

এমন একটা টগবগে ছেলে যে কেন এমন ঝঞ্ঝাটের পথে পা বাড়াল তাই ভেবেই মনটা ইদানীং খারাপ হয়ে যেত সরযুর।

'উয়াকে বুঝাই সুজাই এ পথ থিকে ফিরাই আনা যায় না?' একা হলে স্বামীকে ইদানীং প্রায়ই প্রশ্নটা করত ও। ছেলেটার জন্য এক ধরনের দুশ্চিন্তা, এক অজানা আশঙ্কা সব সময় গুরগুর করত ওর বুকের মধ্যে। তার খোঁজ রাখতেন শুধু সুদর্শনই।

পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে সরযু সেদিন একটু আগেভাগেই তুলে দিল সনাতনের হাতে।

বলল, 'বলিস, সবটাই যেন খেইয়ে লেয়। কিচ্ছুটি যেন পইড়ে না থাকে।'

দুপুরে ভাল করে ঘুমোয়নি সরযু। অনেক দিনের দিবানিদ্রার অভ্যাসটাতে ছেদ পড়ল সেদিন। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ গড়াতে থাকে আর মাঝে মাঝে চমকে উঠে বসে। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চারায় বাইরে, রোদ্দুর পড়ে এল কিনা। দুপুর থেকে লাবণ্যও শোবার ঘরে নেই। কোন গতিকে চাট্টি নাকে-মুখে গুঁজে দিয়েই সেই যে তেতলার ছাদে উঠেছে, বিকেল অবধি কোন সাড়া-শব্দ নেই মেয়ের। সারা দুপুর একলাটি ছাদে বসে কী যে করছে, কে জানে। সুদর্শনের একবার মনে হল, উঠে গিয়ে দেখেন, কী করছে মেয়েটা। পরমুহূর্তে সামলে নেন। খড়মে আওয়াজ তুলে নেমে আসেন একতলায়। সোজা চলে যান কাচারিঘরের দিকে।

বিকেল না পড়তেই তৈরি হয়ে নিল অরিজিৎ। ওর নিজের ধুতি এবং সার্টখানা পরে নিল। তারপর বারান্দা থেকে নেমে এসে উঠোনে দাঁড়াল।

বারান্দায় আরাম কেদারায় স্থাণুর মতো বসেছিলেন সুদর্শন। মনটা কেন জানি বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এসে অরিজিৎ আচমকা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল সুদর্শনকে। সুদর্শন থতমত খেয়ে সোজা হয়ে বসেন, থাক্, থাক্। সাবধানে যেইও। আর, সম্ভব হলে এ পথটা ছেড়ে দিবার কথাটা আর একবার ভেব্যে দেইখো।

আবার উঠোনে নেমে গেল অরিজিৎ। সুদর্শনের সঙ্গে শেষবারের মতো দৃষ্টি বিনিময় করে চকিতে মুখ তুলল দোতলার দিকে। বারান্দায় বসে বসেই সুদর্শন স্পষ্ট বুঝতে পারেন, ওপরে, দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সরযু পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে অরিজিতের দিকে। হয়ত বা এতক্ষণে তার দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেবেছে অবিশ্রান্ত। কারণ, এতদিনে সুদর্শনের তিলতিল বিশ্বাস জন্মেছে, কেবল ওঁর সামনে ছাড়া সরযু এখনও কারণে-অকারণে কেঁদে বুক ভাসাতে ভালই বাসে। শুধু দোতলায় নয়, অরিজিতের তাকানোর ধরন দেখে সুদর্শন আন্দাজ করেন, তাঁর ওপরে, এমনকি সরযুরও ওপরে দাঁড়িয়ে আরও একজন কালো চোখের তারা ভিজিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে উঠোনের দিকে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি তার মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে কয়েক কুচি ম্লান আলোর ফুল।

আকাশ থেকে চোখদুটি সরাসরি নিজের পায়ের তলায় নামিয়ে আনে অরিজিৎ। তারপর ভারি ভারি পা ফেলে বেরিয়ে যায় সদর দেউড়ির বাইরে।

সেদিন সারা সন্ধে গুম মেরে ছিল সরযু।

একটা কথাও উচ্চারণ করেনি। খুব সম্ভব ওই রাতে সে মুখে তোলেনি কিছুই।

সেদিন সরযু সুদর্শনকে বোধ করি কাপুরুষ ভেবে থাকবে। অন্তত সুদর্শনের মনে হয়েছিল তেমনটা। হয়ত তার বিশ্বাস হয়েছে, পুলিসের হযরানিব ভয়ে সুদর্শন অরিজিৎকে তাড়িয়ে দিলেন। লাবণ্যরও বড় গভীর অভিমান হয়েছিল বাবার ওপর। তার মাস্টারমশাইকে তাড়িয়ে দেওযার জন্য সে সুদর্শনকেই দাযী করেছে সর্বান্তঃকরণে। দু'চোখ দিয়ে তাঁর উদ্দেশে ঝরিয়ে দিয়েছে গাঢ় অভিমান। সে অভিমান তার বুকে বহুদিন ছিল। সুদর্শন জানেন না, আজও আছে কিনা।

যদিও সুদর্শন জানেন, সরযু আজ আর তাঁর কাছে কিছুই জানতে চাইবে না, তার সমস্ত কৌতূহলের উর্ধ্বে উঠে গেছেন তিনি, তবুও যদি আজ সরযু সত্যি সত্যিই জানতে চায়, তবে আসল কথাটা খোলসা করে বলতে আজ আব কোনও বাধা নেই সুদর্শনের। আসলে বহুদিন যাবৎ একজন যোগ্য উত্তরাধিকারী খুঁজছিলেন সুদর্শন। সিংহবাবু বংশের অর্থ-বৈভব, মান-সম্মানকে অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যাবে এমন একজন শক্ত-সমর্থ, ঋজু মেরুদণ্ডের অধিকারী মানুষ। লাবণ্যর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে সুদর্শন তাকে সিংহগড়ে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে চলেছিলেন বহুদিন। অরিজিৎ ছিল সব বিষয়ে একজন যোগ্য পুরুষ। তার দ্বারা সিংহবাবু বংশের অসম্মান হওয়ার কোনও সম্ভবনাই ছিল না। বরং সুদর্শন সিংহবাবুর জয়ধ্বজাটিকে সে আরও উচ্চে তোলার ক্ষমতা রাখত। তেমন যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু দীর্ঘ তিন-চার মাস তাকে নানা দিক থেকে নানাভাবে পবীক্ষা করে দেখেছেন সুদর্শন। না, আপাতদৃষ্টিতে এক রকমের মনে হলেও অরিজিৎ এক সম্পূর্ণ পৃথক ধাতুতে গড়া। ওই ধাতু দিয়ে সিংহবাবু বংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরি করা যেত না। টগবগে হলেও এ-এক অন্য রক্ত বইছে ওর শিরায়। এ রক্তে কুটিলতা নাই। ক্রুরতা, প্রভুত্বপরায়ণতাও অনুপস্থিত। মৃগয়ার আস্বাদ নেওয়ার কোন বাসনাই নেই যার, এমন মানুষ সুদর্শন সিংহবাবুর কোন কাজেই লাগবে না।

অরিজিৎকে, এ দেশের একজন রাজভক্ত জমিদার হিসাবে, পুলিসে ধরিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। সেটা না করে জীবনে বোধ করি ঐ প্রথম স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন সুদর্শন। অন্তত ইদানীং তেমনটাই মনে হয় তাঁর।

সরযুকে এ কথা কোনদিনও বলেননি সুদর্শন। বলবার প্রয়োজনই বোধ করেননি। কিংবা মনে হয়েছিল, সরযু ওঁর মনের কথাগুলো বুঝে ফেলেছিল আগেভাগেই। আজ সুদর্শনের বিশ্বাস হয়, সরযুর কাছে জীবনের কোনও কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারেননি তিনি।

বরং সরযুর বুকের মধ্যে জমে থাকা অনেক কথাই তাঁর জানা হল না।

১৮. চন্দ্রকান্তর নিয়তি

অবশেষে, কাশীধামে পৌঁছে একটা অচেনা ধরমশালায় উঠলেন দু'জনে। চন্দ্রকান্ত তখন অনেকখানি সামলে উঠেছে। আর সুদর্শনের প্রতি সৃষ্টি হয়েছে তার এক অন্ধ বিশ্বাস। খান, দান, ঘুমোন। সকাল-বিকাল গঙ্গার ঘাটে বসে থাকেন দু'জনে। আর সর্বক্ষণ, চন্দ্রকান্ত শুধু সরযুর কথায়, তারই স্মৃতিচারণে, ভরিয়ে দেয় গঙ্গার বাতাস।

চন্দ্রকান্তকে নিয়ে ঠিক কী করা যায় সেটাই যখন সুদর্শন ভেবে চলেছেন, অবিরাম, কিছুতেই যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, তখনই তাঁর ভাবনাখানি নিজের হাতে তুলে নিতে এগিয়ে এল স্বয়ং চন্দ্রকান্তর নিয়তি। একদিন গভীর রাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল ও। ঘন ঘন ভেদবমিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। জ্ঞান লোপ পেল এক সময়। সুদর্শনের কোন সন্দেহই রইল না, চন্দ্রকান্ত তার পাপের সাজা পেতে শুরু করেছে। অন্যের বাগদত্তাকে হরণ করে বিবাহ করবার শাস্তি শুরু হয়েছে তার।

পরের দিন দুপুর পর্যন্ত যমে-মানুষে লড়াই চলল। এক সময় ক্ষীণতর হয়ে এল নাড়ির গতি।

প্রবীণ পাণ্ডাঠাকুর ওর মুখে বাবা-বিশ্বনাথের চন্নামৃত ঢেলে দিতে দিতে বলল, জীবনে কোন মহাপাপ না করলে বাবা-বিশ্বনাথের ধামে ওলাওঠায় ধরে না কাউকে। এখানকার সবকিছুই বাবার প্রসাদ। আর, বাবার প্রসাদে রোগ বাধায় না, বরং মহাব্যাধি সেরে যায়। বিড়বিড় করতে থাকে পাণ্ডাঠাকুর, কোনও মহাপাপের সাজা পাচ্ছে বেচারা।

মহাপাপটি যে কী, তা সুদর্শন ছাড়া আর কেউই জানে না। সাজা পাওয়া নিয়ে পাণ্ডাঠাকুরের তত্ত্বর সঙ্গেও তিনি একমত। কিন্তু উপস্থিত জবাব দেন না। কেবল হাপুস-নয়নে কাঁদতে থাকেন। প্রিয়তম বন্ধু তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তিনি কাঁদবেন না?

পাণ্ডাঠাকুর সুদর্শনকে বলল, 'তুমি আর এখানে একত্রে থেকো না। অন্য ধরমশালায় চলে যাও। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ।' পাণ্ডাঠাকুরই আর একটা ধরমশালা ঠিক করে দিলেন। সুদর্শন চলে গেলেন সেখানে।

খুনের মত অপ্রিয় কাজটা নিজের হাতে করতে হল না ভেবে ভারি তৃপ্তি জন্মাল সুদর্শনের মনে। সে রাতে খুব গাঢ় ঘুম হল তাঁর। এবং খুব ভোরবেলায় প্রায় স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেলেন পাণ্ডাঠাকুরের আক্ষেপ, চন্দ্রকান্তর অন্তিম অবস্থা।

লোকজন দিয়ে চন্দকান্তকে নিয়ে আসা হল গঙ্গার ধারে। শুধু মাথা বাদে তার পুরো শরীরখানাই ডুবিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল গঙ্গার জলে। শেষ মুহূর্তে চন্দ্রকান্তর কব্জিতে হাত ছুঁইয়ে পরখ করেছিলেন সুদর্শন। খুঁজে পাননি নাড়ির স্পন্দন।

এরপর আর সামান্য কাজই বাকি ছিল সুদর্শনের। পাণ্ডাকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখালেন চন্দ্রকান্তর বাড়ির ঠিকানায়। চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-সংবাদ বয়ে নিয়ে চলল সে চিঠি। সুদর্শন চড়ে বসলেন সেইদিনই সন্ধের গাড়িতে। চারদিনের মাথায় পৌঁছলেন সিংহগড়ে। কাদম্বরী এ ক'দিন রাধামাধবের মন্দিরে মাথা ঠুকে ঠুকে ফুলিয়ে ফেলেছে কপাল। অনাহারে, অনিদ্রায়, স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কায় একেবারে আধখানা হয়ে গেছে সে। সুদর্শনকে দেখামাত্তর তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাতর ভিক্ষা প্রার্থনা করে সে, ওগো, যাকে ভালবাস উয়াকে এ ঘরেই লিয়ে এস। সতিনের সঙ্গ আমি খুব সইতে পারব। উই মেয়ার তরে সিংহগড় তিয়াগ কর্যে গৃহত্যাগী হও যদি, তবে আমি বিষ খাব। আশ্চর্য. কাদম্বরীর ধারণা হয়েছে, এ ক'দিন সুদর্শন পরযুকে নিয়ে অন্যত্র বসবাস করেছেন, যেটা ওর মতো সতী-সাধ্বীর বুকে শেল হয়ে বেজেছে। চতুর্দশ বৎসর সাবিত্রীব্রত পালন করবার পরও স্বামী যদি অন্য রমণীর সঙ্গলিপ্সায় গৃহত্যাগী হয়, তবে সতী-সাধ্বীর আত্মহত্যাই শ্রেয়।

সুদর্শন বলেন, খুব কোমল আন্তরিক গলায়, 'তুমি চাইলে সিটাই হবেক।'

চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-সংবাদ ডাকযোগে এসে পৌঁছুল প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন বাদে। সরযুর কানে পৌঁছল আরও পরে। তার আগেই, কাশী থেকে ফিরে, সুদর্শন দেখা করেছেন সরযুর সঙ্গে। তাঁকে দেখে শিউরে উঠেছে সরযু। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, সুদর্শনই চন্দ্রকান্তকে খুঁজে বের করে, এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে, তারপর দেখা করতে এসেছেন ভাল মানুষটি সেজে। সুদর্শন অনেক প্রবোধ দিয়েছেন সরযুকে। তিনি যে চন্দ্রকান্তকে খুন করেননি, তন্নতন্ন করে খুঁজেও যে ওর হদিস পাননি. বারবার বলেও তা বিশ্বাস করাতে পারেননি সরযুকে। তাঁর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি সরযু। তার দু'চোখের মণিজোড়ায় ছিল গাঢ় অবিশ্বাস।

চন্দ্রকান্তর মৃত্যুর খবরে সরযু অজ্ঞান হয়ে রইল প্রায় দু'দিন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে সে ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। চোখের মণিজোড়া ক্রমশ বোবা হয়ে এল। এক সময় বুঝি ভবিতব্যকে মেনেই নিল সরযু। ডাকযোগে পাণ্ডার চিঠিতে মৃত্যু-সংবাদ আসায় বোধ করি এক সময় মেনে নিতে বাধ্য হল সে। সুদর্শনের ঘাড় থেকে অপরাধের খাঁড়াটা বোধ করি নামল। সারা এল্লাকা ততদিনে বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছে। কত দূরে পালিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রকান্ত, ক-ত দূরে! একেই বলে মৃত্যুভয়। শাস্ত্রজ্ঞ সমাজপতির দল, বলে, যতদূরেই যাও বাবা, লিয়তি তুমার সঙ্গে যাবেক। লিয়তি কেন বাধ্যতে। ধর্মের কল বাতাসে লড়ে হে। অতবড় মহাপাপের একটা শাস্তি হব্যেক নাই? তাও কি হয়! দূরে পালাই গিয়ে শাস্তি এড়াবে তুমি! অত যদি সোজা হত। গায়ে গু মাখলেও কি ভূত ছাড়বেক হে!

চন্দ্রকান্ত আর ইহধামে নেই, এটা যখন সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল, তখন আর সরযুর কিছুই করবার রইল না। এবং কিছুদিন বাদে সরযু চলে এল সিংহগড়ে। কাদম্বরী মহা সমারোহে ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করল ওকে। সরযুর জন্য পৃথক মহল নির্দিষ্ট হল। সেই মহলেই সে আজ অবধি রয়েছে।

কাদম্বরীকে অবশ্য তারপর আর বেশিদিন সতিনের ভরভরন্ত সংসার দেখবার জন্য থাকতে হয়নি ইহলোকে।

১৯. শুঁয়োপোকার রূপান্তর পর্ব

শঙ্করপ্রসাদ আজকাল সুদর্শনের কাছে আসার সময় পায় না বড় একটা। সে এখন ভীষণ ব্যস্ত। ডিস্ট্রিক্ট বার্ডের সদস্য সে। তার অধিকাংশ দিনই বাইরে বাইরে কেটে যায়।

চারপাশে অনেক সুখ্যাতি শঙ্করের। লোকে বাড়ি বয়ে এসে তার প্রশংসা করে যায়। হরিণমুড়ি খালের ওপর পুলটা নাকি তারই চেষ্টায় হয়েছে। বিষ্টুপুর থেকে সোনামুখী যাবার একটা বড়সড় বাধা ঘুচেছে। রাধানগর থেকে সোনামুখী অবধি রাস্তাটাও নাকি তারই কীর্তি।

এ সব শুনে সুদর্শনের খুশি হবার কথা। কিন্তু ওর কর্মকাণ্ডের সুখ্যাতি শুনতে শুনতে তাঁর কান জ্বালা করে। কপালের রগ দপদপ করে। আর, বুকের মধ্যে শুরু হয় অব্যক্ত দহন। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে তুষের আগুন। আগুন, আগুন। একটা নিদারুণ পরাজয়বোধ সুদর্শনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে। দিন দিন ওই বোধটা প্রকট হচ্ছে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রথম নির্বাচনে যে সুদর্শন ওকে দাঁড় করিয়েছিলেন তার কারণ ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যুগের নীতিও বদলাচ্ছে। সিন্দুকে সিন্দুকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আর গোলায় গোলায় পাহাড়-প্রমাণ ধান থাকলেই চলবে না, ক্ষমতা চাই হাতের মুঠোয়। আর, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে আগামী দিনে অন্যত্র। সে ক্ষমতা অর্জন করতে হলে চাই অন্যতর এক যাদুকাঠি। যার নাম রাজদণ্ড। সুদর্শনের দ্বারা তা সম্ভব নয়।

শঙ্করপ্রসাদের হাতে সেই যাদুকাঠিটি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই বোর্ডের নির্বাচনে তিনিই দাঁড় করিয়েছিলেন শঙ্করপ্রসাদকে। না, শঙ্করের প্রতি কোনও স্নেহ কিংবা করুণাবশত তেমনটা করেন নি সুদর্শন। করেছিলেন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। এমনিতেই যা পরিস্থিতি, সুদর্শনের মৃত্যুর পর এলাকার কর্তৃত্ব আপ্সেই চলে যাবে প্রতাপলালের হাতে। সাবেক সিংহগড় নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তার ওপর, শঙ্কর না দাঁড়ালে, সেই শূন্যস্থান যদি প্রতাপলাল পূরণ করেন, তা হলে সর্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হবে। নিজ-বংশের মৃত্যু বাণটি নিজের হাতে শত্রুকে দান করবার মতোই হবে ব্যাপারটা।

কোনও আশা নেই, তাও রশিটাকে নিজের দিকে টেনে ধরবার প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন সুদর্শন। কিছু না হোক, অন্তত রাজদণ্ডটা ছুঁয়ে থাকুক শঙ্করপ্রসাদ। সামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি যদি তাও থাকে সাবেক সিংহগড়ের আয়ত্তে! অন্তত প্রতাপলালের হাতে যেন ওটা কিছুতেই না পৌঁছোয়।

এই এলাকায় যে কোনও নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করেন বকলমে সুদর্শনই। তিনি যাকেই ঠিক করবেন জেলা কংগ্রেস কমিটি তাকেই মেনে নেবে। সুদর্শন যে কংগ্রেসের কোন হোমরা-চোমরা, তা নয়। বরং অতিরিক্ত রাজভক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি বহুকাল ধরে খদ্দর আর টুপিওয়ালাদের এ তল্লাটে বংশ বিস্তার করতে দেননি। তবুও , তিনি চান বা না চান, কংগ্রেসিরা সর্বদাই তাঁর কাছে আসে, তাঁর কৃপা, অনুগ্রহ যাজ্ঞা করে। যে কোন নির্বাচনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক প্রার্থী সুদর্শনের এলাকায় প্রচারে নামার আগে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে আসবেই। বোর্ডের নির্বাচনের বেলায়ও তাই। সুদর্শন সিংহবাবু কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন, তবুও এ এলাকার প্রার্থী নির্বাচনের অলিখিত ক্ষমতা তাঁর উপরেই ন্যস্ত। কারণ, ওরা জানে, সুদর্শনের এলাকায় তাঁর একটি মুখের কথায় এখনও সব মানুষের ভোট পড়বে নির্দিষ্ট প্রার্থীর বাক্সে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রথম নির্বাচনে ওরা এসে সুদর্শনকেই ধরেছিল। কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে তাঁকেই দাঁড়াতে হবে। সুদর্শন অনেক কারণেই দাঁড়াতে চাননি। এই বয়েসে, তাঁর এই অহংপ্রিয় মানসিকতায়, হাটে-ঘাটে জনসেবা করে বেড়ানো, হাত জোড় করে ভোট ভিক্ষা করা, যাকে চাবকানোর জন্য হাত নিশপিশ করছে তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, পোষাবে না একেবারেই। তা ছাড়া, সুদর্শনের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাচারী মানুষ রয়েছে। কোনও কমিটিতে থেকে, স্রেফ সদস্য হিসেবে দলের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত মেনে কাজকর্ম করবার বেলায় সেই মানুষটা বারবার বিদ্রোহ করবেই। জীবনে নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে মোটেই অভ্যস্ত নয় সুদর্শনের কান। এ বয়েসে অভ্যাসটা পালটানো যাবে না একেবারেই।

তার চেয়ে এই ভাল। শঙ্করপ্রসাদই দাঁড়াক। সে সবদিক থেকেই এ যুগের যোগ্য হয়ে উঠুক। তাছাড়া, কেবল এই উপায়েই প্রতাপলাল এবং হরবল্লভকে আরও কিছুদিন হয়ত বা ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব।

সুদর্শন ওদের বললেন, 'আমি আর এ বয়েসে এ সবের মধ্যে ঢুকব নাই। ইখন একটু-আধটু ধর্মকর্ম কইর্‌ব বল্যে ভাবছি। তুমরা বরং শঙ্করপ্রসাদকে দাঁড় করাও।'

মনে মনে পছন্দ না হলেও, সুদর্শনের নির্বাচিত প্রার্থীকে বাতিল করবার ক্ষমতা ছিল না ওদের। তা হলে, শঙ্করের বদলে যে প্রার্থীই দাঁড়াক, তাকে আর এ তল্লাট থেকে জিততে হত না।

সে নির্বাচনে শঙ্করপ্রসাদই দাঁড়িয়েছিল। এবং জিতেছিল।

শঙ্করপ্রসাদ চিরকালই একটু মুখচোরা। বিশেষত সুদর্শনের সুমুখে সে প্রায় বোবার সামিল। আগে, দিনের মধ্যে যতবার খুশি ডেকে পাঠালে সে দৌড়তে দৌড়তে হাজির হত। ধমকধামক খেত এন্তার। মাথা নিচু করে ফিরে যেত। এখন সে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তার কাজকর্ম, ব্যস্ততা বেড়েছে। ঘনঘন তাকে সদরে যেতে হয়। দিনের অনেকখানি সময় তার বাইরে বাইরেই কাটে। অনেকদিন রাতে ফিরতেও পারে না। তার চেয়েও বড় কথা, তার মধ্যে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার মুখ ফুটেছে, চোখ ফুটেছে, আত্মমর্যাদা টনটনে হয়েছে। আগে সাত চড়েও রা বেরোত না মুখে। ইদানীং সামান্য অপমান করলে তার ফর্সা মুখখানা লাল টকটকে হয়ে ওঠে। কপালের শিরা টানটান, চোয়াল শক্ত, আর, দু-চোখে রোষের আভাস। কখনও সখনও সুদর্শনের মুখের ওপর জবাবও দিচ্ছে দু-একটা। ইদানীং তার নিজস্ব মতামত তৈরি হয়েছে। নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ। তৈরি হচ্ছে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব যা সুদর্শনের কাছে খুবই অস্বস্তিকর। তার কথাবার্তা চালচলনে চাকচিক্য এসেছে। সাধারণ মানুষের জন্য অনেক মন ভোলানো শব্দ, বাক্য, উপমাদি রপ্ত করেছে সে। দিনদিন বর্ণময় হয়ে উঠছে শঙ্করপ্রসাদ, যেমন করে শুঁয়োপোকা হয় রঙিন প্রজাপতি। সুদর্শনের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করে সে এমন দু'চারটি কাজ এই ক'বছরে করেছে, যা সিংহগড়ের দীর্ঘ ঐতিহ্যের বিরোধী। সবচেয়ে ভয়ের যা, সে সিংহগড়ের আভিজাত্যকে আর ততখানি সম্ভ্রমের চোখে দেখছে না। বিগত বছরগুলিতে একাধিকবার তার কথাবার্তা এবং আচরণে সেটা প্রকাশ পেয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

তবুও শঙ্করপ্রসাদের সাম্প্রতিক সব বেআদবি নীরবে সহ্য করেছেন সুদর্শন। ইচ্ছে করলে, যখন হাতির দাঁতদুটো পুরোপুরি ঠেলে বেরয়নি, ওর সমস্ত বেয়াদবি কর্মকাণ্ড এক হুঙ্কারে থামিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ, তিনি তো জানেন, এ এক পণ্ডশ্রম। চিরকাল তিনি থাকবেন না। তাঁর অবর্তমানে শঙ্করপ্রসাদকে যদি জনপ্রিয়তার নেশায় পেয়ে বসে, সুদর্শন তা ঠেকাবেন কী করে। জনপ্রিয়তার নেশায় সে যদি এই সিংহগড়ের তাবৎ বিষয়-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা খোলামকুচির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে শেষ করে দেয়, পরলোকের বাসিন্দা হয়ে সুদর্শনের কী-ই বা করার থাকবে। সব চেয়ে বড় বাধা, সুদর্শন এখন পাখনা-ছাঁটা পাখি। পায়ের তলায় মাটি থাকলেও সে-মাটিতে পা রাখবার উপায় নেই। কারণ, পা রাখবার পা দুটোই খোওয়া গেছে তাঁর। তবুও যতদিন বেঁচে আছেন সুদর্শন, যতক্ষণ তেলটুকু অবশিষ্ট রয়েছে প্রদীপের তলায়, ততক্ষণ আশা ত্যাগ করা অনুচিত। ওকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাটুকু না করলে তা হবে সুদর্শনের পক্ষে এক অমার্জনীয় গাফিলতি। আর, শঙ্করপ্রসাদের স্বধর্ম বলতে সিংহগড়ের চিরাচরিত ধর্ম। ওর নিজস্ব বংশধর্ম, টোলের আচার্যগিরি তো কবেই লুপ্ত হয়ে গেছে ওর জীবন থেকে।

অনেকদিন ধরেই ভাবছিলেন সুদর্শন। আর হুঙ্কার নয়। তার বদলে, মনের জায়গায় শঙ্করপ্রসাদকে একটা বড়সড় ধাক্কা দেওয়ার কথাটাই ভাবছিলেন তিনি। ওর এই অসার জনপ্রিয়তার মোহ প্রথম লগ্নেই ভেঙে দিতে হবে। এতদিন নিজের এবং সিংহগড়ের অপরিসীম ক্ষতি করেও এলাকায় তাকে ইচ্ছে মতো কাজ করতে দিয়েছেন সুদর্শন। না দিয়ে উপায় ছিল না। ফলে, ওর মনের মধ্যে যে বিষবৃক্ষটির অঙ্কুরোদগম ঘটেছে, দিন দিন ডালে-পালায় বেড়েছে, সুদর্শন জীবদ্দশায় তা উপড়ে দিয়ে যেতে চান। সিংহগড়ের অন্য তরফে প্রতাপলাল হু হু করে বাড়িয়ে নিচ্ছে তার ধন-সম্পদ। ওর ছেলে হরবল্লভ এই বয়েসেই

বেজায় চৌকস হয়ে উঠেছে। শঙ্করপ্রসাদ রাজদণ্ডটিকে এমন এলোমেলো ছুঁয়ে থেকে জ্ঞাতি শত্রুর প্রবল উত্থানকে রোধ করতে পারবে না। নিজের বেড়ার ওপারেই এমন মহীরুহকে বিশাল ডালপালা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুদর্শন এমনিতেই মনে মনে আতঙ্কিত। এই আতঙ্ক নিয়ে মরলে তিনি ওপারে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

বেশ ছিল শঙ্করপ্রসাদ। একজন বিনীত নম্রভাষী, বাধ্য নিরীহ গোছের মানুষ। তার মেয়েমানুষী নম্রতা সারাজীবন সুদর্শনের রোষের আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছে। তাকে সাবালক, সাবলম্বী করে তোলার জন্য শেষ বয়েসে সুদর্শনই তাকে ঠেলে দিয়েছিলেন বাইরের দুনিয়ায়। তিনিই তাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা অর্জন এবং ক্ষমতার স্বাদগ্রহণ করবার প্রবোচনা জুগিয়েছেন। সে এখন সুদর্শনকে এবং তাঁর সম্ভ্রমকে অবজ্ঞা করবার সাহস পেয়েছে বুকে। তার একজোড়া শক্ত সবল পাখনা গজিয়েছে। সে এখন অবিরাম উড়তে চায়। স্বরচিত স্বপ্নলোকে ভেসে বেড়াতে চায়। কাজেই সুদর্শন অনেক ভেবে দেখেছেন, শঙ্করপ্রসাদের মন থেকে নিজের হাতে পোঁতা বিষবৃক্ষটিকে জীবদ্দশায় উপড়ে ফেলে দিয়ে তবেই তাঁর মুক্তি। মুক্তি, মুক্তি।

মাস কয়েকের মধ্যেই আবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচন হবে। শুরু হবে প্রচার অভিযান, উত্তেজনা। কানাঘুসোয় সুদর্শন শুনেছেন, অন্নদা চক্রবর্তীর দল এবারও শঙ্করপ্রসাদকেই দাঁড় করাতে চায় নির্বাচনে। অবশ্য এখনও অবধি কেউ তাঁর কাছে প্রস্তাবটা নিয়ে আসেনি। না অন্নদা চক্রবর্তী, না শঙ্করপ্রসাদ।

২০. সরযুর কোমল জেদ

সেটা বোধ লেয় সন তেরশ আটচল্লিশ। কাঁড়ঘসার জঙ্গলের ওপারে হরিণমুড়ির পাড় ঘেঁসে কানশিক্ড়ার মহাশ্মশান। সেই শ্মশানে সাধুবাবা বসে বসে খলখল করে হাসেন। যখন-তখন, রাত-বিরেতে। বড় ভয়ঙ্কর সে হাসি। শুনলে অতি বড় সাহসীরও গা-হাত-পা অসাড় হয়ে আসে।

শ্মশানের ঈশেন কোণে ত্রেতা যুগের বট। তার অসংখ্য ডালপালা, কোটর...। বিশাল গুঁড়িটাকে মাঝখানে রেখে চারপাশে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে কতকাল ধরে। কালক্রমে সেই সব ঝুরি থামের মতো মোটা হয়ে উঠেছে। এমনিতর বিশ-পঁচিশটা থাম পুরো গাছটাকে বেড় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ওপর ভর দিয়ে মূল গাছটি তার বিশাল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে চারপাশে বহুদূর অবধি। যেন এক বিশাল সার্কাসের জরাজীর্ণ তাঁবু। গাছের তলায় আলোর বরাদ্দ কম। দিনের বেলায়ও সেখানে এক আলো-আঁধারির রহস্যময় জগৎ। সেই বটের তলায় বাস করছেন সাধুবাবা। জটাজুটধারী, পরনে রক্ত বসন, গলায় পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে বিশাল সিঁদুরের ফোঁটা। লাল ভাঁটার মতো এক জোড়া চোখ। এক অলৌকিক পুরুষ তিনি। এলাকার মানুষজনের তেমনই বিশ্বাস।

দশদিক থেকে রোজ লোক আসে পিলপিল। হত্যে দেয়, মানত করে, ওষুধ নেয়। অব্যর্থ সে ওষুধ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি নাকি যে কোনও লোকের অতীত বলে দেন ছবির মতো।

কোনকালেও সাধু-সন্তে তেমন ঐকান্তিক বিশ্বাস নেই সুদর্শনের। কাদম্বরীর যখন একযুগ বাদেও সন্তান হল না, তখনও তিনি কোন ঠাকুর-দ্যাবতা কিংবা জ্যোতিষীর পাশ

ঘেঁসেননি। তার বদলে ঘরে এনেছেন সরযুকে। অলৌকিক কিছুতে কোনদিনও তেমন প্রগাঢ় আস্থা নেই সুদর্শনের।

সরযুর মাথার রোগটা কিছুদিন যাবৎ বেড়েছে। সংসারে সবাইয়ের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে চায় সে। দিনের পর দিন উপোসী থাকে। রাধামাধবজির মন্দিরেই কাটায় দিনের অধিকাংশ সময়। দৈনিক বার তিনেক স্নান করে শুদ্ধ হয়। মাঝে মাঝে তার সামান্য ব্যাপারেও বড়সড় ভুল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে চিনতেই পারে না সুদর্শনকেও। লাবণ্য, প্রিয়ব্রতকেও না। আর, গভীর রাতে তেতলার ছাদে উঠে নিঃশব্দে লণ্ঠন দোলাতে থাকে। কোন কোন দিন তার মাথায় এক নিদারুণ যন্ত্রণা শুরু হয়। তখন সে কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান হারায়। তখন বিড়বিড় করে কত কিছু বকে। এই সব উপসর্গ ওর মধ্যে প্রথম দেখা গিয়েছিল চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পরপরই। এখনও সরযু সেই উপসর্গগুলিকে সযত্নে বহন করে চলেছে। দু'একবার আচ্ছন্ন অবস্থায় ওর বিড়বিড় কথাবার্তার সামান্য অংশ কানে এসেছে সুদর্শনের। শুনে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেছে। সরযু, আচ্ছন্ন অবস্থায়, তার অতীতকে আদর করছে। অতীত, অতীত।

সরযুর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখেননি সুদর্শন। বাঁকুড়া থেকে সাহেব ডাক্তার এনেছিলেন। সম্ভব-অসম্ভব সব চেষ্টাই করেছেন। সরযু তাঁর কোন চেষ্টাতেই বাধা দেয়নি। সুদর্শন যেখানে বলেছেন গেছে, যত ওষুধ এনেছেন, খেয়েছে, কিন্তু সেরে ওঠার বদলে সে এক দুরারোগ্য রোগের তিলতিল শিকার।

আজ পাঁচ বছর আগে, জীবনে ওই একবারের তরে বুঝি দুর্বল হয়েছিল সুদর্শনের মন। সরযুকে সুস্থ দেখবার আশায় তিনি তখন সর্বস্ব হারাতেও রাজি। সেই আর্তিতে, তাঁর আজন্মলালিত বিশ্বাসগুলো বুঝি টলে গিয়েছিল সামান্য ক্ষণের জন্য। আর সেটাই হল তাঁর কাল।

রোজ রোজ সাধুবাবার অলৌকিক কীর্তিকলাপের খবর পান সুদর্শন। এলেবেলে কেউ নয়, বেশ মানী জ্ঞানী, নির্ভরযোগ্য মানুষেরা শুনিয়ে যায় সে সব কথা। আর কিছু না হোক, লোকটার জ্যোতিষবিদ্যা আর দৈব-ওষুধ এক কথায় অনবদ্য! সুদর্শনের মনটা দুলে দুলে ওঠে। ভেতর থেকে কেউ ধারাবাহিক ওকালতি করে, দুনিয়ার সব কিছুই কি তুই জেনে-বুঝে বস্যে আছিস? কত অলৌকিক কাণ্ড ঘটে, কত অপার রহস্য জমে আছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খাঁজে খাঁজে, সব কিছু তোর বুদ্ধিগম্য হবেক? অত বুদ্ধি ধরিস তুই? সবাই পরামর্শ দেয় অবিরত, গিন্নীমাকে একটিবার উই সাধুবাবার পাশ লিয়ে যান হুজুর। একটিবার পরীক্ষা করে দেখুন।

'উয়াকে আনা যাবেক নাই, সিংহগড়ে?'

'অসম্ভব। ডেরা ছেড়ে এক পা-ও লড়েন না সাধু।'

শুনতে শুনতে সুদর্শনের নিজের ভেতরের বাধাগুলোকে যদিও বা কব্জা করা গেল, আসল প্রতিরোধ এল সরযুর কাছ থেকেই। একেবারে বেঁকে বসল সে।

একদিন ওকে সঙ্গোপনে বললেন সুদর্শন, 'চল, একবার ঘুর্যে আসি।'

সরযু সন্দেহের বিষ নিয়ে তাকায় স্বামীর দিকে। সুদর্শন বলেন, 'শুন্যেছি উঁয়ার অনেক ক্ষমতা। ভূত-ভবিষ্যৎ নখদর্পণে। আজন্ম ব্রহ্মচারী।'

'উয়াতে আমার কী?'

'তুমার ভাগ্যটা গণনা করাতে ইচ্ছা হয় সরযু।'

'আমার ভাগ্য গুনে কী বলবেক উ?' সরযু বাঁকা হাসি হাসে, 'গুনে দেখবার আছেই বা কী? কী জানতে বাকি আছে?'

সুদর্শন বলেন, 'উনি নাকি মানুষের অতীতটাও ছবির মতন বল্যে দেন।'

সরযু অচেনা দৃষ্টিতে তাকায় সুদর্শনের দিকে, 'লিজের অতীত অন্যের মুখ থিকে শুইনে কী লাভ?'

'ভবিষ্যতও বলতে পারে নির্ভুল।'

সরযুর ঠোঁটদুটো সামান্য বেঁকে যায়, 'যার কুনোও ভবিষ্যতই নাই, তার ভবিষ্যৎ বলবেক উই হা-ঘরে সাধু!'

'তবুও, চল না, যাই একটিবারের তবে।' সুদর্শন কিছুতেই হাল ছাড়েন না, 'শুনেই আসি, কী বলে! তাবাদে, তুমার উই মাথার যন্ত্রণাটা—, তুমার উই খামখেয়ালি পাগলামিগুলা—বলা যায় না, সেরো্য যেত্যেও পারে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সরযু। হা নিশ্বাস ফেলে। জানলা দিয়ে দৃষ্টিখানি বিঁধিয়ে দেয় দিগন্তের গায়ে।

বলে, 'আমার অসুখগুলা সেইরে উঠলে কার কী লাভ? না সারলেই বা কার কী ক্ষতি?'

ওকে রাতভর বোঝান সুদর্শন। পীড়াপীড়ি সাধ্যসাধনা করেন যথাসাধ্য।

অবশেষে এক সময় স্পষ্ট করেই বলল সরযু, 'আমি আর কুথাও যাব নাই। অসুখ সারিয়ে লাভ নাই আমার। আপনি আমাকে বিরক্ত কইর্‌বেন নাই।'

সুদর্শন বুঝলেন, সরযুকে আর তিলমাত্র টলানো যাবে না! সরযুর জেদটাকে তিনি আজীবনকাল ধরে চেনেন। সে জেদ তরল নয়, সহজে চেনা যায় না। এত নিঃশব্দে অন্তঃসলিলা বয়ে যায় সে জেদ, বাইরে থেকে তার অস্তিত্ব এবং তীব্রতার পরিমাণ আন্দাজ করাই যায় না। সুদর্শন জানেন, সরযু তেমন কিছু জেদ নিঃশব্দে বহন করে চলেছে আজ দীর্ঘকাল ধরে। সুস্থ হয়ে উঠবে না সে কিছুতেই,—এই তার প্রথম ও প্রধান জেদ। চিৎকার, চেঁচামেচি, ঝগড়াকলহ করে, অশান্তি বাধিয়ে, সে তার জেদ রক্ষা করে না কদাপি। তা হলে সুদর্শনের দিক থেকেও ধমক-ধমক আস্ফালনের সুযোগ থাকত। তার জেদ রক্ষা করবার পদ্ধতিটি এতই নিঃশব্দ, শান্তিপূর্ণ ও কোমল জাতের যে তার গায়ে কঠিন বস্তু দিয়ে জোরে আঘাত করতেও দ্বিধা হয়। ওই দিনই মাত্র সামান্য অসহিষ্ণু দেখাচ্ছিল সরযুকে।

২১. খাঁচার পাখির ডানায় আকাশের স্বাদ

সেদিন শঙ্করপ্রসাদ বাড়িতেই ছিল। সন্ধ্যের পর সুদর্শন ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। একটু দেরি করে এল শঙ্করপ্রসাদ। তেমনি মার্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়াল সুদর্শনের সুমুখে। সুদর্শন লক্ষ করলেন, ওর মার্জিত মুদ্রাগুলির সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন ভারিক্কিও লাগছে শঙ্করপ্রসাদকে।

সুদর্শন চোখ ফিরিয়ে নেন শঙ্করপ্রসাদের থেকে। গম্ভীর গলায় বলেন, 'বসো।'

শঙ্করপ্রসাদ বসল। মাথাটা অল্প নামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

গলাটা বারকয় ঝেড়ে নিয়ে সুদর্শন শুধোলেন, 'শরীবটা এমন লাইগ্ছে ক্যানে? অত রোগা লাইগ্ছে ক্যানে তুমাকে?'

শঙ্করপ্রসাদ জবাব দেয় না।

'ডাক্তার-টাক্তার দেখাও।' উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলেন সুদর্শন।

খুব বিনীত গলায় শঙ্করপ্রসাদ জবাব দেয়, 'আমি ঠিকই আছি।'

কথাটা সুদর্শনের কানে কেমন দুর্বিনীত শোনায়। ঈষৎ রূঢ় গলায় বলেন, 'না, তুমি ঠিক নাই। দিনরাত অত খাটাখাটনি তুমার সহ্য হচ্ছে নাই। তুমার কিছোদিন বিশ্রাম লিযা উচিত।'

কথাগুলো উপদেশের মত শোনালেও, সুদর্শন জানেন, এটা তাঁর নির্দেশ। শঙ্করপ্রসাদের তা জানা উচিত। সে তার শ্বশুরকে বহু বছর দেখছে।

'সামনে তো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোট।' সুদর্শন আসল কথাটা পাড়েন এবার।

মাথা নেড়ে সায় দেয় শঙ্করপ্রসাদ।

'আমি ভাবছিল্যম কি—।' সুদর্শন গলায় মৃদু গাম্ভীর্য এনে বলেন, 'তুমার এবার আর না দাঁড়ানোই ভাল।'

এতক্ষণে শঙ্করপ্রসাদ সরাসরি চোখ ফেলে সুদর্শনের মুখে। ওঁর মুখখানা সযত্নে জরিপ করতে থাকে সে।

'দিনরাত উ সব বাইরের ঝামেলায় মেত্যে থাইকলে এই অতবড় ইস্টেট কে দেখবেক, বল?' গলায় মমতা আর আন্তরিকতার মৃদু ছোঁয়া মিশিয়ে বলেন সুদর্শন, 'তুমার শরীরেও আর সইছে নাই অত ধকল।'

কথাগুলো নির্ঘাৎ ভারি অচেনা ঠেকছিল শঙ্করপ্রসাদের কানে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে শ্বশুরের দিকে।

'তুমি বরং ইবার থিক্যে আদায়পত্রের দিকটা ভাল কর্যে দেখাশুনা কর।' সুদর্শন মিষ্টি গলায় বলেন, 'আদায়পত্র এ ক'বছরে ভীষণ কইমে গেছে, জান তো?'

শঙ্করপ্রসাদ উসখুস করছিল। ব্যবস্থাটা ওর মোটেই মনঃপূত হচ্ছিল না, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না সুদর্শনের। কথা না বাড়িয়ে বলেন, 'এখন এস।'

শঙ্করপ্রসাদ তবুও বসে থাকে ঠায়। এই প্রথম সে সুদর্শনের হুকুম সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল। ওর ব্যবহারটা ভীষণ রকমের বেআদবি বলে মনে হল সুদর্শনের। ঈষৎ কঠিন গলায বলেন, 'কিছু বইল্‌বে?'

মৃদু গলায় শঙ্করপ্রসাদ জবাব দেয়, 'উয়ারা যে আমার নাম ঠিক করে ফেলেছে।'

বাইরে এলোমেলো হাওয়া। জানলা দিয়ে সেই হাওয়া ঘরে ঢোকে। বিষ্টুপুরী লণ্ঠনের আলোর শিখাখানিকে দুলিয়ে দেয়।

ততক্ষণে সুদর্শনের ব্রহ্মতালু জ্বলতে শুরু করেছে রাগে। ওর গালে সপাটে একখানা চড় কষিয়ে দেবার জন্য হাতটা নিশপিশ করতে থাকে।

নিজেকে বহুকষ্টে নিরস্ত করে ঠাণ্ডা অথচ কঠিন গলায় সুদর্শন বলেন, 'আমার সিদ্ধান্তটা উয়াদ্যার জানাই দিও।'

শঙ্করপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়। কোনও জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

যদিও পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে অন্নদা চক্রবর্তী বলল, 'দাদাকে দর্শন করতে এলাম, কিন্তু ওকে দেখা মাত্রই সুদর্শন বুঝেছেন, কেবল দর্শন করতেই আসেনি অন্নদা। অন্তরে আরও গূঢ় অভিপ্রায় রয়েছে। অন্নদার সঙ্গে আরও দু'জন কংগ্রেসের নেতা।

আজ সকাল থেকে আকাশের মুখ ছিল গোমড়া। কিছুক্ষণ হল রোদ্দুর উঠেছে। রোদের তাপও বেড়েছে খুব। এ সময়টায় সুদর্শনকে দোতলার পুবমুখো বারান্দায় এনে আরাম-কেদারায় বসিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ ভাল লাগে বসেন।

পাশটিতে বসে অনেক সুখ-দুঃখের গল্প করল অন্নদা। ওর দাদা রামজীবন চক্রবর্তী ছিল বিষ্টুপুরের নামজাদা মোক্তার। সুদর্শনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সিংহগড়ের সমস্ত মামলা মোকর্দমা ও-ই সামলেছে এককালে। ওদের সঙ্গে সিংহবাবুদের তিন পুরুষের পারিবারিক সম্পর্ক।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর অন্নদা আসল কথাটা পাড়ল।

'দাদা, আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে আঁইছি।'

ভিক্ষাটি যে কী, তা সুদর্শন আগাম বুঝতে পারছিলেন বিলক্ষণ। তবুও না বোঝার ভান করে বলেন, 'বল।'

'শঙ্করকে আর একবারের তরে চাই। এটা মনে করুন আপনার ছোটভাইয়ের আবদার।'

'চাই মানে?' সুদর্শন গলার রুক্ষ্ম ভাবখানা চেপে রাখতে পারেন না, 'খুল্যে বল, অন্নদা।'

সুদর্শনের দিকে সন্তর্পণে তাকায় অন্নদা। বলে, 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোট হবে, শুনেছেন তো। ওই ভোটে আমরা শঙ্করকে দাঁড় করাতে চাই। কেবল আপনার হুকুমটা পেলে।'

সুদর্শনের ভেতরে তখন রোষ জমতে শুরু করেছে। এদের ওপর নয়, তাঁর সমস্ত রোষ গিয়ে পড়েছে শঙ্করপ্রসাদের ওপর। এদের সঙ্গে না এলেও, এ ব্যাপারে যে ওর নীরব উসকানি রয়েছে, সেটা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না সুদর্শনের। রাগটাকে সরাসরি প্রকাশ করতে সম্ভ্রমে বাধে তাঁর। বরং নিতান্ত নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার কাছে আসার কোনই দরকার ছিল নাই তুমাদের। যে দাঁড়াবেক, উয়ার সাথে কথা বল। যারা ভোট দিবেক উয়াদার পাশ যাও। আমি তো উপরের দিকে পা বাড়াই রয়্যেছি।'

অন্নদা মৃদু হাসে। সুদর্শনের এই নির্লিপ্ত ভঙ্গির মধ্যে যে কতখানি ক্ষোভ আর উষ্মা লুকিয়ে রয়েছে, তা ওর অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে তৎক্ষণাৎ।

বলে, 'আমি ঠিক জায়গাতেই আঁইছি, দাদা। আপনি মুখ ফুটে না বললে, কি ক্যাণ্ডিডেট কি ভোটার, কেউই এক পা-ও এগাবেক নাই।'

'খুব এগাবেক, খুব এগাবেক। এগিয়ে বস্যে আছে।' সুদর্শন গলায় তীব্র উষ্মা ফুটিয়ে বলেন, 'আমার কথার কুনো মূল্য নাই, বুঝল্যে? পাখনা হারাঁই আমি স্থবির হয়্যে বসে রয়্যেছি আজ পাঁচ বছর। শাগ্‌নার মতো শ্মশান জাগছি। আমাকে বাহ্যি-পেচ্ছাব করাতে চারটা লোকের দরকার হয়। অমন মাইন্‌ষের মতামত যারা লেয়, উয়ারা ডাহা বোকা।'

অন্নদা চক্রবর্তী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ভারি অভিজ্ঞ ইন্দ্রিয়গুলি তার। সুদর্শনের গলার আওয়াজে সে প্রলয় ঝঞ্ঝার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে। নিঃশ্বাসে বাসুকি নাগের উষ্ণ বিষ।

দু'চোখে দুর্বাসার রোষ লুকিয়ে রয়েছে। আর. সারা মুখখানি যেন কালবৈশাখীর দিনে ঈশান কোণের মেঘ। মনে মনে বেজায় দমে যায় বেচারা। সুদর্শনের বিষাক্ত রোষকে সে আজীবনকাল ধরে চেনে। তার জাতই আলাদা। পৌরুষদীপ্ত রোষ থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বুকের অন্তর্গত ভয়টাকে প্রাণপণে চেপে রাখে অন্নদা। মুখে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে, 'তবুও, আপনি শুধু একটিবার হুকুমটা দিন।' বড়ই কাতর অনুনয় ঝরে পড়ে ওর গলা থেকে।

ওর কাতর কণ্ঠ সুদর্শনকে তিলমাত্র গলাতে পারে না। সুস্পষ্ট গলায় বলেন, 'হুকুমের কথাই যখন উঠল্যাক, আমি সাফ সাফ জানাই দিতে চাই, শঙ্করপ্রসাদ ইবারের ভোটে দাঁড়াক, ইট্যা আমি চাই না। ইয়ার সাথে আমার অনেক কিছু জড়াই আছে। তুমরা আমাকে আর এ ব্যাপারে অনুরোধ কইর্‌বে নাই।'

মুখ কাঁচুমাচু করে ফিরে গেল অন্নদা চক্রবর্তীর দল। মনে মনে যে বেজায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সেটা বুঝতে তিলমাত্র কষ্ট হয় না সুদর্শনের।

তখনও বোঝেননি সুদর্শন, যে পাখি একবার আকাশে ডানা মেলেছে, পেয়ে গেছে আকাশময় উড়ে বেড়াবার স্বাদ, তাকে ধরে রাখা মুশকিল। দিন কতক বাদে সুদর্শন খবর পেলেন, শঙ্করপ্রসাদ দাঁড়াচ্ছে। সুদর্শনও সে রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করেছিলেন মনে মনে। তবে ও যে দ্বিতীয়বার অনুমতি আদায়ের জন্য আসবেই না, এটা ছিল তাঁর কল্পনার অতীত।

শঙ্করপ্রসাদকে কিছুই বলেন না সুদর্শন। সরযুকেও না।

২২. সুদর্শনের সাধুদর্শন

সরযুর সন্ন্যাসীদর্শনে যাওয়ার আশা ত্যাগ করেছেন সুদর্শন। কিন্তু ততদিনে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে তাঁর নিজের না গিয়ে উপায় রইল না। একে তো সাধুবাবার অলৌকিক কাণ্ডকলাপ তাঁর মধ্যে তীব্র কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, তার ওপর এলাকার কিছু বিশ্বস্ত লোকের মারফত সুদর্শন খবর পেয়েছিলেন কানশিকড়ার শ্মশানে ঠাঁই নেবার পর থেকেই সাধুবাবা নানা জনের কাছ থেকে সিংহগড় সম্পর্কে হরেক খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। এবং সুদর্শন ও সরযুর ব্যাপারেই তাঁব কৌতূহলটা সবচেয়ে বেশি। সুদর্শনের আচম্বিতে অনেক কিছুই মনে হয়। সেই এক প্রলয় রাত্রির স্মৃতি মনের মধ্যে নিঃশব্দে পাক দিয়ে বেড়ায়, যে রাতে অরিজিৎ এল। আচম্বিতে মনে পড়ে যায় তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটিকে। তার বিদায়ের বিকেলটিও খুব টাটকা হয়ে ভাসে মনের আকাশে। এরপর আর না গিয়ে পারা যায় না। কাজেই একদিন সরযুর জন্য সাধুবাবার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে সুদর্শন হাজির হলেন কানশিকড়ার শ্মশানে।

সেদিনটা ছিল শনিবার। কানশিকড়ার শ্মশানের বটতলা লোকে লোকারণ্য। কৃষ্ণদাস আর সনাতনকে নিয়ে সুদর্শন হাজির হন বটতলায়। ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলে যেমনটা হয়, ওঁকে দেখে জমায়েতের অবস্থা দাঁড়াল সেই রকম। সিংহগড়ের বড় কর্তাবাবু স্বয়ং উপস্থিত্‌ কে যে কী করবে, দিক-দিশা পায় না যেন। মুহূর্তের মধ্যে বারোআনা মানুষ সরে যায় নিরাপদ দূরত্বে। দূর থেকে সসম্ভ্রমে দেখতে থাকে সুদর্শনকে। বটের ঝুরিবেষ্টিত কোটর থেকে সামান্য তফাতে গিয়ে দাঁড়ান সুদর্শন, অপেক্ষা করতে থাকেন সাধুবাবার জন্য।

কোটরের মধ্যেই বসে ছিলেন সাধুবাবা। সুদর্শনের দিকে পেছন ফিরে। তখন পুজোয় বসেছেন তিনি। পুজো শেষ হয়ে এসেছে, সুদর্শনের চারপাশে যে-সব মান্যগণ্যরা দাঁড়িয়েছিল,

তারাই জানাল, সাধুবাবার দর্শন দেবার সময় হয়েছে। একটু বাদেই বাইরে আসবেন উনি। সুদর্শন নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকেন।

খানিক বাদে উঠে দাঁড়ালেন সাধুবাবা। সামনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন অপেক্ষমান জনতার দিকে। দীর্ঘকায় শরীর, চুল-দাড়িতে মুখের বারোআনাই ঢাকা পড়ে গেছে। প্রশস্ত ললাটের তলায় এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ। পরনে রক্তাম্বর, ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, সব মিলিয়ে তাঁকে এক পিশাচসিদ্ধ কাপালিকের মতো লাগে। এক সময় সুদর্শনের সঙ্গে চকিতের চোখাচোখি হল সাধুবাবার। সুদর্শন মাথাটা সামান্য নুইয়ে অভিবাদন করেন ওঁকে। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁপুনি শুরু হয়েছে প্রবল উত্তেজনায়। কৃষ্ণদাস, সনাতন এবং উপস্থিত পুরো জমায়েত ততক্ষণে শরীর লুটিয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে।

দু'পা এগিয়ে আচমকা থেমে যায় সাধুবাবার পা। কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকন। তারপর সহসা পিছু ফিরে হাঁটিতে থাকেন। ঢুকে পড়েন ঝুরিবেষ্টিত কোটরের মধ্যে। অভিজ্ঞজন, যারা ইতিমধ্যেই সাধুবাবাব ধাতগুলো জেনে ফেলেছে, ফিসফিস করে বলে, 'ব্যস, হইয়েঁ গেল্যাক। আজ আর সাধুবাবা দর্শন দিবেন নাই।'

'ক্যানে?' মনের উত্তেজনা চেপে রেখে সুদর্শন শুধোন।

'সিট্টা বলা মুশকিল। তেবে মাঝে মাঝেই অমনটা করেন সাধুবাবা। ইচ্ছা হইল্যে তিনি দিনে দশবার দর্শন দিবেন, আবার কুনো কারণে রুষ্ট হইল্যে লাগাড়ে তিন-চারদিন দর্শনই দিবেন নাই।'

আজ কি তবে কোন কারণে রুষ্ট হয়েই দর্শন দিলেন না সাধুবাবা। চারপাশে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। সেটাই সম্ভব। কারণ দর্শাতে গিয়ে অনেকেরই চাপা ইঙ্গিত সুদর্শনের দিকে। সারা জমায়েত যখন ভূমিতে লুটিয়ে প্রণিপাত করল্যাক বাবাকে, বড় কর্তাবাবু ঠায় খাড়া রইলেন তো, সাধুবাবার রাগ হইয়ে গেলাক উয়াতেই। বড্ড ক্রোধী মানুষ তিনি। এমনিতেই শিশুর মতো সরল, কিন্তু কুনো কারণে রুষ্ট হইল্যে এক্কেরে দুর্বাসা মুনি।

সুদর্শনের ততক্ষণে সারা শরীর জুড়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে। এ কাকে দেখলেন তিনি। কার মুখখানি তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সাধুবাবার মুখে! এও কি সম্ভব! সুদর্শনের বুদ্ধিশুদ্ধি, যুক্তিবোধ কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। টলতে টলতে কোনও গতিকে ফিরে আসেন সিংহগড়ে। পরবর্তী তিনটি রাত বিনিদ্র কেটে যায় তাঁর।

২৩. শঙ্করপ্রসাদের নতুন চিকিৎসাপর্ব

নন্দ সরকার নির্দল থেকে দাঁড়াল।

ওর বাপ ভুবন সরকার ছিল সিংহবাবুদের তালুকের একজন সম্পন্ন চাষী এবং চিরকালই সুদর্শনের একান্ত অনুগতদের মধ্যে একজন। ওর বড়ছেলে নন্দ। বাপের মতোই তার সিংহগড়ের মূল তরফের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। সিংহগড়ের যে কোন কাজে-কর্মে, উৎসবে পার্বণে আগাম এসে হাজির হত বাপ-বেটায়। একেবারে বুক পেতে দিত। বেছে নিত সবচেয়ে জটিল আর ঝঞ্ঝাটের কাজগুলি। দিনরাত চোখের পাতা এক না-করে তুলে দিত কাজ। বিদায় নেবার কালে সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্বে নতজানু হয়ে সুদর্শনকে ভক্তিভরে প্রণাম করত। ভুবন মারা

যাবার পর নন্দ ওদের আর্থিক অবস্থা আরও মজবুত করেছে। মেয়েদের ভাল ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছে। ছেলেদের যতদূর সম্ভব লেখাপড়া শিখিয়েছে। সুদর্শন শুনতে পান, সামান্য মহাজনী-তেজারতিও নাকি করে আজকাল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার রাজভক্তিতে ভাঁটা পড়েনি একতিল এখনও দেখা হলে যথেষ্ট তফাত থেকে সর্বাঙ্গ নুইয়ে প্রণাম করে। পারিবারিক সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেবার আগে সিংহগড়ের 'বড়বাবুর' পরামর্শ এবং হুকুম নিয়ে যায়। সেই নন্দ সরকার যখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোটে দাঁড়াল, তখন এলাকার মানুষজনের আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ওদের অপার বিস্ময়ের কারণ মূলত দুটো। প্রথমত, আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভাল হলেও এলাকার জনপ্রতিনিধিত্ব করবার মতো উল্লেখযোগ্য মানুষ সে নয়। তার ওপর দাঁড়াচ্ছে কিনা সিংহগড়ের 'বড়বাবু'র একমাত্র জামাতা শঙ্করপ্রসাদ মহাপাত্রর বিরুদ্ধে, যা কিনা খোদ সিংহগড়ের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করবার সামিল। নন্দ সরকারের সাহস ও স্পর্ধা দেখে পুরো এলাকা তাজ্জব বনে গেছে। সুদর্শন সিংহবাবুর প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। একেবারে গুম মেরে গিয়েছেন তিনি। যে যা বলে, শুনে যান। জবাব দেন না কারও কথার। প্রতিক্রিয়াও জানান না কোন কিছুতেই। বলেন, জীবনের শেষ গাড়িটাতে টিকিট কেট্যে অপেক্ষা কচ্ছি, এখন শুধু নিঃশব্দ প্রতীক্ষা। গাড়িটা এইলেই চইড়্যে বুসি। খুব একান্তজনের কাছে এমনতর আক্ষেপ ঝরে পড়ে তাঁর গলা থেকে। বলেন, লিজের জামাই যিখ্যেনে কথা শুনে না, অবাধ্য হয়, সিখ্যেনে প্রজাদের কাছ থিকে আমি কতটুকু আনুগত্যই বা আশা করত্যে পারি। অতএব, যে যা কচ্ছে, করুক। আমার ইখন চইল্‌ছে শুধুই প্রতীক্ষা-পর্ব।

নন্দ সরকার একদিন ঘটা করে এল সুদর্শনের আশীর্বাদ নিতে। সুদর্শনও বুঝি মনে মনে তেমনটা আশা করছিলেন। শঙ্করপ্রসাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও সে একটি বারের জন্য তাঁর কাছে আসবেই, এমনটা বার বার মনে হচ্ছিল সুদর্শনের।

আভূমি লুটিয়ে প্রণাম করল নন্দ। বলে, 'আপনার অন্নে আমি মানুষ। আশীর্বাদ করুন, যেন জয়ী হই।'

সুদর্শন বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে শুয়ে রইলেন। তারপর খুব নিস্পৃহ গলায় বললেন, 'জয়ী হও।'

নন্দ জানে, এই কলিকালে এমন মৌখিক আশীর্বচন কোনও কাজে আসে না। আশীর্বাদটা যাতে ফলে, তার জন্যও ব্যবস্থা নিতে হয়। সে তাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সুদর্শনের সুমুখে।

অনেকক্ষণ বাদে সুদর্শন খুব মৃদু গলায় আশ্বাস দেন, 'দেখব, যা।'

সেই দিনই এলাকার তাবৎ মোড়ল, গ্রামপ্রধান এবং মান্যগণ্য লোকেদের কাছে সুদর্শন পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সিদ্ধান্ত। আমি চাই, তুমরা সবাই এ ভোটে নন্দ সরকারকে ভোট দাও। যে কোনও কারণেই হোক, আমি চাই না, শঙ্করপ্রসাদ এবারে ভোটে জিতুক। সেইমত ব্যবস্থা লাও সবাই।

কথাটা চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করপ্রসাদের মুখখানি বর্ষার মেঘের মতো কালো হয়ে গেল। কংগ্রেসের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সবাই তো জানে, এর পরিণতি কী হবে। এবার গাঁয়ে গাঁয়ে বৈঠক করবে মোড়লরা। কর্তাবাবুর হুকুম জানিয়ে দেবে সবাইকে। তারপর লাখ টাকা ছড়ালেও এলাকার একটা পক্ষী-পাখালকেও সেই সিদ্ধান্তের বাইরে আনা যাবে না।

এমনটা আশাই করেনি কংগ্রেসের লোকজন, শঙ্করপ্রসাদও নয়। ওরা ভেবেছিল, শঙ্করপ্রসাদকে কোনও গতিকে একটি বার দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে, প্রথম দিকে যতই না রুষ্ট হন সুদর্শন, শেষ অবধি মেনে নেবেন ওদের সিদ্ধান্ত। যতই হোক, শঙ্করপ্রসাদ তো তাঁর পর নয়। তাঁর একমাত্র রক্তের সম্পর্কটির সঙ্গে তার জন্মের গাঁটছড়া বাঁধা। সিংহগড়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ঘোষণায় একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছে ওরা। আড়ালে বলাবলি করছে, বুড়ার মাথাটা একেরে খারাপ হইয়্যে গেছে। সুদর্শনের কানে এসেছে ওদের মন্তব্যগুলো। শুনেও না শোনার ভান করেন সুদর্শন।

নন্দ সরকারের মনে স্ফূর্তির ইয়ত্তা নেই। বগল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে খোশমেজাজে। মাঝে মাঝে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঢুকে সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সিংহগড়ের কর্তাবাবুর সিদ্ধান্ত। কি হে, কর্তাবাবুর হুকুমটা মনে আছে তো?

ওদিকে শঙ্করপ্রসাদের নাওয়া-খাওয়া-ঘুম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। দিনরাত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে জোড়হাতে ব্যক্ত করছে তার আবেদন। প্রচার শেষ করে, কোনদিন বাড়ি ফেরে, কোনদিন ফেরে না।

দূর থেকে শঙ্করপ্রসাদকে দেখেন সুদর্শন। দিনরাত খেটে খেটে চামচিকার মত বদনটি হয়েছে ওর। জামা-কাপড় নোংরা। চোখের কোলে ঘন কালির প্রলেপ। হঠাৎ দেখলে চেনা মুশকিল। সুদর্শন মনে মনে হাসেন। পুরুত-বামুনের ছেলে ও, সিংহবাবু-বংশে বিয়ে না হলে তাকে তো এমনই খাটতে হত। খাটতে খাটতে এমনই বদন হত ওর। থাক, ভোটের পর দিনকতক বসে-শুয়ে, ক্ষীর-সর খেলেই ফিরে পাবে শরীরে আগের দিনের জৌলুস। ওকে একটা বড়সড় ধাক্কা দেবাব সাত্যিই প্রয়োজন ছিল। সুদর্শন এই ভাবেই দেখেন পুরো ব্যাপারটিকে। পুরো সিংহবাবু বংশের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁকে। এর সঙ্গে সিংহগড়ের ভবিতব্য জড়িত। ভোটে ও হারবেই। জিতবার কোনও উপায় নেই ওর। আর, একটিবার হারলেই সুদর্শন ওকে বোঝাতে পারবেন, মানুষের সেবা করে, ব্রীজ-রাস্তা বানিয়ে দিয়ে, ওদের মন পাওয়া যায় না। মানুষ পোকার জাত। তাকে নিজের দিকে টানতে হলে, নিজেকে উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো বাতি হতে হবে। সে বাতিতে আলো এবং উত্তাপ দুই-ই থাকবে। এখন না বুঝতে চাইলেও, পরাজয়ের পর এসব কথা সে বুঝবে বলে আশা করেন সুদর্শন। আসলে, মানুষকে সোজা দাঁড় করিয়ে কিছু বোঝাতে গেলে, সে বুঝতে চায় না। তার পাঁজর ভেঙে দিয়ে বোঝালে, তবে সে বোঝে। নিজের ধ্যান-ধারণার প্রতি প্রগাঢ় অবিশ্বাস জন্মালে, তবেই মানুষ অন্যের উপদেশ শোনে। সুদর্শনের অন্তত তেমনটাই মনে হয়।

তাঁর বিশ্বাস, এ সবই ঘটবে, একেবারে ছকে বাঁধা অঙ্কের মতো। নির্বাচনের পর সুদর্শন শঙ্করপ্রসাদকে নিশ্চয়ই বোঝাতে পারবেন, যতই সে ওড়াউড়ি করুক, এখনও অবধি তিনিই ওর ভাগ্যনিয়ন্তা। সুদর্শনের দৃঢ় বিশ্বাস, ওকে আবার বাঁধতে পারবেন তাঁর সিন্দুক এবং লাবণ্যর কাছাকাছি।

২৪. নীলরক্তের গোত্রান্তর

স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে যখন বাঁকুড়ার কলেজে ভর্তি হল প্রিয়ব্রত, সেটা বোধ হয় সন তেরশ পয়ঁতাল্লিশ। তেরশ সাতচল্লিশ নাগাদ, তখন সে মাত্র আঠার-উনিশ বছরের সদ্য যুবক, একদিন খবর পেলেন সুদর্শন, সে বাড়ি এসেছে। সঙ্গে এনেছে একটি মেয়েকে। ওর নাকি

বন্ধু। এ যুগের নিয়মগুলো ঠিক ঠিক মাথায় ঢোকে না সুদর্শনের। কিংবা বুঝেও বুঝতে চায় না সাবেককালের মন। প্রিয়ব্রত সুদর্শন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা তার। বর্ষার মেঘের মত টসটসে শরীর। যে কোন মেয়ে তাকে চাইতেই পারে। কিন্তু পুরুষ-নারীতে কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হয় সুদর্শনের। শরীরকে বাদ দিয়ে কোন যুবতী মেয়ের সঙ্গে নিছক বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভব? কিন্তু প্রিয়ব্রত নাকি তা সম্ভব করেছে বলে দাবি করে।

কেমন সে মেয়ে? কতখানি তার রূপ? কী নাম, কেমন বংশ, কী করে?— অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করেছিল সুদর্শনের মনে। বংশ-মর্যাদা ও আভিজাত্যের সূক্ষ্ম সুতোখানায় অদৃশ্য টান পড়েছিল। সিংহগড়ের আভিজাত্যটুকুকে দু'পায়ে দলতে চাইছে না তো প্রিয়ব্রত?

সন্ধেবেলায় সনাতন খবর দিল, মেয়েটির নাম নাকি দীপমালা। বাড়ি নাকি মেদিনীপুর জেলার কোন গাঁয়ে। নাকি শহরে। বাঁকুড়ায় পড়ে দাদাবাবুর চেয়ে দু'তিন ক্লাস নিচুতে। শুনে সহসা বুকের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বোধ করেছিলেন সুদর্শন। আরামকেদারায় টানটান হয়ে বসেছিলেন। কত কিছু মনে হয়। কত সন্দেহ, আশঙ্কা, প্রত্যাশা। মনের মধ্যে চলতে থাকে হাজার কিসিমের উবুর-ডুবুর খেলা। প্রিয়ব্রতর বান্ধবী ওই আগন্তুক মেয়েটাকে নিয়ে। এক ধরনের দুর্বার কৌতূহল। কেমন সে মেয়ে, যে কিনা এমন পাহাড়ী নদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার সাহস পায়। তার মনে কি ভয়-ডর নেই? প্রিয়ব্রতর মতো ছেলেকে সামলানো কি যে সে মেয়ের কাজ! সুদর্শনের একটিবারের তরে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে। কিন্তু বহুকষ্টে সামলে নেন নিজেকে। ক'দিন নানান ঝামেলায় সরযুর মহলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যখন সময় পেলেন, তখনই খবর পেলেন মেয়েটা এসেছে। এমন একটা রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার প্রিয়ব্রত ঘটিয়ে ফেলেছে, কে এক উঠতি বয়েসের মেয়েকে নিছক বন্ধু পরিচয়ে সিংহগড়ের একেবারে অন্দরমহলে এনে তুলেছে, এস্টেটের কর্তা হিসেবে সুদর্শনের বোমার মতো ফেটে পড়া উচিত ছিল। মেয়েটার সামনেই প্রিয়ব্রতকে কঠিন তিরস্কার করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক কিছুদিন যাবৎ মনের মধ্যে যা-ইচ্ছে-তাই করবার সেই আঠাল জেদ আর হিম্মতটাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না সুদর্শন। কেমন যেন ক্লান্ত লাগে ইদানীং। নিজস্ব অপছন্দের ঘটনাগুলিকে ক্রমান্বয়ে ঘটে যেতে দেখলেও আর দপ্ করে জ্বলে ওঠার উৎসাহ পান না ভেতর থেকে। শুধু কি তাই? সুদর্শন মনে মনে খুঁজতে থাকেন আরও কিছু কারণ। তাঁর মনে হয়, প্রিয়ব্রতর কোন কাজকর্মের প্রতিই ততখানি অকরুণ হয়ে উঠতে পারেন না তিনি। কোনওদিনই পারেননি। বরং তার অনেক আচরণ, যা সিংহগড়ের নিরিখে নিতান্তই বেমানান, অন্য কেউ ঘটালে কিছুতেই ক্ষমা পেত না সুদর্শনের কাছ থেকে, কেবল প্রিয়ব্রতর ক্ষেত্রে তা নিঃশর্ত মার্জনা পেয়ে গেছে। একি স্নেহ? অন্ধত্ব? নাকি অন্য কোনও জাতের অসহায়তা যাকে পুরোপুরি চিনতে পারেন না সুদর্শন, কিন্তু তার অস্তিত্ব সর্বক্ষণই টের পান। প্রিয়ব্রতকে কি মনে মনে ভয় পান সুদর্শন? কথাটা সচেতন মনের উপরিভাগে ভেসে উঠতেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন সুদর্শন। ভয়। ওইটুকু দুধের বাচ্চাকে! কিন্তু ওই আগন্তুক মেয়েটার ক্ষেত্রেও যে ঘটল ওই একই ঘটনা। সুদর্শন শুনলেন, গুম মেরে রইলেন, হজম করে ফেললেন। অন্যের ক্ষেত্রে যা অপরিসীম দুঃখের কারণ হত, প্রিয়ব্রতর ক্ষেত্রে তা পেয়ে গেল নিছক নিরাসক্তির আড়াল। সিংহগড়ের মহলে মহলে নিকটদূর মিলিয়ে কত আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিজন, অর্থী-প্রার্থী, নিরন্তর আসছে-যাচ্ছে, এস্টেটের কর্তাদের তার অনুপুঙ্খ খোঁজ রাখার ইচ্ছেও

নেই, সময়ও নেই। ওদের বারোআনাকেই চেনেন না সুদর্শন সিংহবাবু, চিনতে চানও না। ওরা কখন আসে, ক'দিন থাকে, কখন চলে যায়, তার খোঁজও অবধি পান না সুদর্শন। পেতে চানও না। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে আগন্তুক মেয়েটির ক্ষেত্রেও তেমন গোছের নিরাসক্তিব আড়াল তৈরি কবে সুদর্শন প্রিয়ব্রতকে হজম করছেন এ-কদিন। ভাবটা যেন, গাদা গাদা লোক আসছে-যাচ্ছে, এতে আর নতুনত্ব কী! এ সব নিয়ে অত মাথা ঘামাবার সময় কই তাঁর! সনাতন যখন মেয়েটার কথা সাতকাহন করে বলত, তখন এমনি গোছের ভাব দেখিয়ে মনের উথলে ওঠা উত্তেজনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন সুদর্শন।

কিন্তু চেষ্টা করলেই কি আর সব আগুন চাপা দেওয়া যায়? নাকি চাপা দিলেই সব আগুন নেভে! সুদর্শন চেষ্টা করেন, কিন্তু ভুলতে পারেন না কিছুতেই যে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে এক আশ্চর্য মেয়ে সিংহগড়ে এসেছে, সে আজ ক'দিন সরযূর মহলে রয়েছে, এবং তার সম্পর্কে এক দুরন্ত কৌতূহল, প্রতিদিনই , উথালপাথাল বাড়ছে সুদর্শনের মনে, যেমন করে ফি-বর্ষায় হরিণমুড়ি খালের গর্ভ থেকে উথলে পড়ে জল। হ্যাঁ, কেন জানি আগন্তুক মেয়েটাকে খুব আশ্চর্য অসাধারণ বলে মনে হয় সুদর্শনের। একটিবারের তরে, যে কোন অছিলায় সরযূর মহলে চলে গেলেই তো হয়। দু'একবার পলকের তরে এমন ভাবখানা এসেছিল মনে। অছিলারই বা প্রয়োজন কী? সরযূর মহলে যাবেন সুদর্শন সিংহবাবু, তার জন্য সময়-অসময়, কারণ-অকারণ এসব অবান্তর। তবুও, মূলত দুটো কারণে কিছুতেই আর পা চলে না সুদর্শনের, সরযূর মহলের দিকে। প্রথমত, ক্ষোভ, অভিমান এবং সুদর্শনের চিরকালীন অহংবোধ। প্রিয়ব্রতর বন্ধু পরিচয়ে একটি মেয়ে এল, ক'দিন এই সিংহগড়েই রইল, অথচ না প্রিয়ব্রত, না লাবণ্য, না সরযূ কেউই খবরটা জানাল না তাঁকে। ওদের যে-কোন একজন তো সামান্য সময়ের জন্য মেয়েটাকে সুদর্শনের নিজস্ব মহলে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়ে আনতে পারত। তার কোন প্রয়োজনই যখন বোধ করেনি কেউই, সুদর্শনই বা কেন আগ বাড়িয়ে হাজির হবেন ওদের সামনে। যেচে মান, আর কেঁদে সোহাগ আদায় করা, কোনটাই পছন্দ নয় সুদর্শনের। দ্বিতীয় কারণটা অবশ্যই আরও জটিল। এ সময়ে সরযূর মহলে গেলেই মেয়েটাকে দেখতে হবে। এবং জানাতে হবে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া, যা ওদের কারও পক্ষেই সুখকর হবে না। সুদর্শন যে-কোন কারণেই হোক ইদানীং এড়িয়ে যেতে চাইছেন তেমন পরিস্থিতি। কাজেই মেয়েটি এসেছে, থাকছে, সুদর্শন দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না তা। কিন্তু ওকে নিয়ে মনের মধ্যে দুর্বার কৌতূহলখানাও তিলমাত্র কমে না, বরং বেড়েই যায় দিনদিন।

সনাতনের মুখে দু'বেলা মেয়েটার সম্পর্কে অনুপুঙ্খ শোনেন সুদর্শন। মেয়েটি, কী যেন নাম, দীপমালা, সারাক্ষণ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সরযূর মহলে। লাবণ্য নাকি ওকে আদরে সোহাগে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সরযূর চোখের কোণেও নাকি বহুদিন বাদে এক সুখকর হাসির ঝিলিক। ভারি অবাক লাগে সুদর্শনের। প্রিয়ব্রত না হয় বেটা ছেলে, শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে সংস্কারমুক্ত, কিন্তু সরযূ! সে কী করে তার আজীবনলালিত সংস্কারগুলোকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলে। নিজের নাতির অবিবাহিতা মেয়ে-বন্ধুকে নিজের আঁচলের মধ্যে পুরে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? না, ভুল হল সুদর্শনের। আবার ভুল হল। সরযূ সম্পর্কে খুব সচেতন হয়ে না ভাবলে ভুল হয়ে যাবেই। সরযূর তো আসলে কোন সংস্কার নেই মনে। কোন কালেই ছিল না। সিংহবাবু-বংশের বধূ হিসেবে যত নিষ্ঠাভরেই সে ঘরকন্না করুক না কেন, তিনবেলা রাধামাধবের মন্দিরে যতই না

কেন গরদ পরে কাটাক ঘন্টার পর ঘন্টা, সরযু তো সঠিক অর্থে চিরকালই এক সংস্কারমুক্ত নারী। আজ থেকে বহু বছর আগে, এই পরাধীন গ্রাম্য দেশে, অবৈধ প্রেমে মজে গিয়ে সে একেবারে ভাঙচুর করে দিয়েছে সমাজ, সংসার, সংস্কার...।

একদিন নিঃশব্দে চলে গেল প্রিয়ব্রত আর দীপামালা। সনাতন মারফত খবরটা শুনে একেবারে গুম মেরে গেলেন সুদর্শন।

২৫. মনের মাধুরীর ফসল

আগামী কাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোট। প্রিয়ব্রত আজ শেষ রাতে চলে গেছে সিংহগড় থেকে। রুদ্র শিকারি মারফত খবর পেয়েছেন সুদর্শন। কালো চাদরে সারা শরীর ঢেকে পরীক্ষিত বাউরি লুকিয়ে ছিল শিবমন্দিরের কাছে বেলগাছের আড়ালে। প্রিয়ব্রত তার সঙ্গেই রওনা দিয়েছে শালুকার জঙ্গলের দিকে। মাস তিন-চার আগে প্রিয়ব্রত সিংহগড়ে এসেছিল। সঙ্গে এসেছিল ঐ দীপমালা নামের মেয়েটি। সেই তেরশো সাতচল্লিশে প্রথমবার এসেছিল, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সিংহগড়ে এল দীপমালা। মাত্র দু'তিন দিন ছিল ওরা। তারপর নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল। যেদিন ওরা চলে গেল, তার আগের সন্ধ্যায় সরযু খুব অপ্রত্যাশিতভাবে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল সুদর্শনের ঘরে। সুদর্শন প্রথমে ওর দিকে তাকাতে চান নি। তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারেন নি। দীপমালাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। একখানি চেনা, অতি চেনা মুখ যে হুবহু বসানো রয়েছে মেয়েটির মুখে। সরযুর ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি ছিল। সুদর্শন বহু কষ্টে প্রশ্ন করেছিলেন, একি সত্যি! বাস্তবিক, একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সুদর্শন।

এবারে অবশ্য প্রিয়ব্রতর সঙ্গে আসেনি মেয়েটি। একলা এসেছিল প্রিয়ব্রত। নিঃশব্দে এসেছিল, নিঃশব্দে চলে গেছে। খবরটা দিনভর সুদর্শনকে ভারী অস্থির আর অসহায় করে রেখেছিল। বিকেলে যখন বিষ্টুপুরের বড়-দারোগা সদলবলে এল, সুদর্শন তখনও তাঁর মনের বৈকল্যখানি কাটিয়ে উঠতে পারেননি পুরোপুরি। দারোগার চোখ-মুখ দেখে প্রত্যয় হয়েছিল সুদর্শনের, খুব নিশ্চিত খবর নিয়েই সে সিংহগড়ে ঢুকেছে। সুদর্শনের মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তির কথা স্মরণে রেখে সে হুড়মুড়িয়ে তল্লাশি শুরু করছে না বটে, তবে তার চোখের তারা শিকারি বেড়ালের মত ছুটে বেড়াচ্ছে সিংহগড়ের প্রতিটি মহলে। দৃশ্যমান প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রদেশে। সিংহগড়ের পক্ষে এটাও এক নিদারুণ মর্যাদাহানিকর ব্যাপার। থানার সামান্য দারোগা, সিংহগড়ে সুদর্শন সিংহবাবুর সামনে বসে সে দু'চোখ দিয়ে তল্লাশি চালাবে, এটাও কম অপমানজনক নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, বড় দারোগার এমনতর বেআদবির জন্য রোষে যতখানি জ্বলে ওঠার কথা ছিল, সুদর্শন জ্বললেন না। বরং দারোগাবাবুর ব্যাপারস্যাপার দেখতে খুব মজা লাগল তাঁর। মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলোর কথা, যখন অরিজিৎ আশ্রয় নিয়েছিল সিংহগড়ে এবং তার খোঁজে মাঝে মাঝেই আসত থানার দারোগা। সিংহগড়ের মর্যাদার কথা ভেবে আনুষ্ঠানিক তল্লাশি করত না বটে, তবে গল্পগুজবের আড়ালে চলত ধারাবাহিক জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। সে এক ভারী মজার পর্ব ছিল। ঠোঁটের কোনায় হাসিখানি ঝুলিয়ে রেখে দু'পক্ষই ঘন্টার পর ঘন্টা খেলে যেতেন ইঁদুর-বেড়াল খেলা। এক সময় বিফল, ভগ্নমনোরথ হয়ে বিদায় নিতেন দারোগাবাবু। সুদর্শনের ভেতর থেকে তখন কুলকুলিয়ে উথলে উঠছে হাসি।

বহুকাল বাদে তেমন এক ধরনের অনুভূতি আজ সুদর্শনের মনে। আজ আরও হাল্কা এই কারণে যে, প্রিয়ব্রত সিংহগড়ে নেই। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দারোগাটি যদি আচমকা কোন বেআদবি শুরু করে দেয়, প্রিয়ব্রতকে পাবে না কিছুতেই। সে ভোর রাতে রওনা দিয়ে শালুকার জঙ্গল ফুঁড়ে সম্ভবত চলে গিয়েছে আরও নিরাপদ কোন আস্তানার দিকে। আর, তার সঙ্গে রয়েছে পরীক্ষিত বাউরি। নিশান বাউরির ব্যাটা বলে তাকে যতই না ছোট নজরে দেখুন সুদর্শন, প্রিয়ব্রতর সাগরেদ বলে যতই না অন্ধ রোষ পুষে রাখুন তার ওপরে, মনে মনে তাঁকে স্বীকার করতেই হয়, এমন পাঁকাল মাছেব মতো পিচ্ছিল, হুঁড়ারের মতো সতর্ক, আর শেয়ালের মতো ধুরন্ধর মানুষ খুব কমই রয়েছে এই তল্লাটে। স্বদেশী করতে গিয়ে কত মানুষই না ধরা পড়ে গেল পুলিশের হাতে, কত রুই-কাতলা পড়ে গেল জালে, কিন্তু পরীক্ষিত এখনও অবধি রয়েছে ধুরন্ধর পুলিসবাহিনীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এমনকি সুদর্শন সিংহবাবু তাঁর নিজস্ব চরবাহিনীকে লাগিয়েও জোগাড় করতে পারেননি এমন একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র, যার ভিত্তিতে পুলিস তাকে অব্যর্থভাবে ধরে ফেলতে পারে। সহসা মনে মনে সামান্য আশ্বস্ত বোধ করেন সুদর্শন। তাঁর ভরসা হয়, পরীক্ষিত সঙ্গে থাকতে প্রিয়ব্রতর কেশাগ্র কেউ ছুঁতে পারবে না।

সুদর্শন জোরে হাঁক পাড়েন, 'সনাতন, আমাকে কাচারিঘরে লিয়ে যেতে বল্।' সঙ্গে সঙ্গে চারজন পাইক দোলা নিয়ে দৌড়ায়। সুদর্শনকে নামিয়ে আনে একতলায়।

সারা বিকেল বড়-দারোগার সঙ্গে ইচ্ছে করেই একটু বেশিমাত্রায় সেই খেলাটা খেললেন সুদর্শন। সেয়ানে সেয়ানে সেই ইঁদুর-বেড়ালের খেলাটা।

কিন্তু সারা সন্ধে জুড়ে প্রিয়ব্রত এবং অরিজিৎ, কেউই সুদর্শনের চোখের সুমুখ থেকে নড়ল না তিলেকের তরে। একটিবারের তরে দেখা না করে প্রিয়ব্রতর এমন চলে যাওয়ার বেদনাকে অতিক্রম করেও অন্যতর কিছু গূঢ় ভাবনা নিঃশব্দে খেলা করে চলল সুদর্শনের মগজে।

প্রিয়ব্রতর চোখে মুখে একটা অন্যতর ছায়া সেই ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছেন সুদর্শন। শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে তার কোনই সাদৃশ্য নেই। শঙ্করপ্রসাদের মত নিরীহ, শান্ত আর মুখচোরা নয় প্রিয়ব্রত। শঙ্করপ্রসাদের মধ্যে সর্বক্ষণ এক ধরনের হীনমন্যতা কাজ করে যেত। তেজী মানুষজনদের সে সর্বদা ভয় পেত ভীষণ। প্রিয়ব্রত ঠিক তার বাপের বিপরীত। ওর মধ্যে একটা দুর্বার তেজ রয়েছে। রয়েছে পাহাড়ী নদের মত ভাঙচুরের লালসা। ওই ভাঙচুরের বাসনা সুদর্শন নিজের রক্তেও বহন করে চলেছেন আজীবনকাল। কিন্তু আদলটা এক রকমের হলেও প্রিয়ব্রতর উদ্দামতা ঠিক সুদর্শনের মত নয়। প্রিয়ব্রত আভিজাত্যে বিশ্বাস করে না, আধিপত্যেও নয়। সে পরীক্ষিত বাউরির ঝুপড়িতে ওর সঙ্গে গা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে পারে। পরীক্ষিতের কুৎসিতদর্শন মায়ের হাতের রান্না করা আকাঁড়া চালের ভাত শাক-সিদ্ধ দিয়ে গপগপিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে ওদেরই ভাঙা তোবড়ানো সানকিতে। সেই সুদূর শৈশবে হাজার সাধ্য-সাধনা করেও সনাতনের পিঠে ঘোড়ায়-চড়া-খেলাটা কিছুতেই খেলানো যায়নি তাকে।

এক অন্যতর ব্যক্তিত্ব সঙ্গোপনে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে। এক অন্যতর মানুষের ছায়া, বহুকাল আগে এক ঝড়বৃষ্টির রাতে যার ছায়া দেখে সুদর্শনও চমকে উঠেছিলেন।

বলতে বাধা নেই, হুবহু অরিজিৎকেই প্রিয়ব্রতর মধ্যে দেখেন সুদর্শন। তেমনই ঋজু, সৎ, অভঙ্গুর এবং দৃপ্ত।

কিন্তু কী করে হয়? একটা মানুষের মধ্যে অন্যের তাবৎ বৈশিষ্ট্যগুলো হুবহু ঢুকে পড়ে কোন রহস্যময় রন্ধ্রপথ দিয়ে। প্রিয়ব্রত কী করে অরিজিৎ হয়ে যায়।

কত অদ্ভুত, অদৃশ্য কার্যকারণ সম্পর্ক যে নীরবে কাজ করে যায় মানুষের জীবনে। তল পাওয়া বুঝি দুষ্কর। অরিজিৎ যখন এ বাড়িতে আসে, তখন লাবণ্যর বয়েস দশ কি এগার। নামেই লাবণ্যের গৃহশিক্ষক ছিল সে, অরিজিৎ ওকে সতিসত্যিই পড়ায়নি কোন দিন। সুদর্শন যদ্দুর জানেন, লাবণ্যর সঙ্গে তার কথাবার্তা বা সামনাসামনি দেখাসাক্ষাৎও ঘটেনি কোন দিন। তবুও সুদর্শনের মনে হয়, লাবণ্য ওই কিশোরী বয়েসেই একটা সীমাহীন কৌতূহল আর সম্ভ্রম বয়ে বেড়াত অরিজিতের ব্যাপারে। অরিজিৎ চলে যাওয়ার পর, বেশ কিছুদিন মনমরা দেখাচ্ছিল ওকে। কিশোরী মনের কোনও গভীরে অরিজিতের ব্যক্তিত্ব যদি খানিক ছায়া ফেলে গিয়েও থাকে, সে কি লাবণ্যর পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে পারে? অবুঝ বয়েসে একখানা ছবি যদি বুকের মধ্যে ধরে রাখে কোনও কিশোরী, সেই ছবিখানি কি বীজ হয়ে উঠতে পারে, সেই বীজ কি কালক্রমে ফসল হয়ে উঠতে পারে? শাস্ত্র-পুরাণ নাকি তাই বলে। প্রত্যেক নারীর গর্ভের সন্তান তার বুকের স্তন্য এবং মনের মাধুরী নিয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে। পুষ্ট হতে হতে রূপ পায়। তা হলে লাবণ্যও কি— ! ছিঃ! নিজের কন্যার গোপন কামনা-বাসনা নিয়ে ভাবতেও তাঁর সংস্কারে বাধে। সুদর্শন মনে মনে লজ্জা পান।

সেই সন্ধ্যায় সনাতনকে ধমক দিয়ে আফিমের মাত্রাটা বাড়িয়ে নেন সুদর্শন। বিড়বিড়িয়ে সনাতনকে বলেন, 'খোঁজ লিস ত, নন্দটা ভোটের কাজকর্ম কদ্দুর কী কচ্ছে।'

২৬. আজ একটু বৃষ্টি হলে ভাল হয়

ভোটে জিতল শঙ্করপ্রসাদ।

সুদর্শন প্রথমটা বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি নিজের কানকে। এও কি সম্ভব।

ধীরে ধীরে সমস্ত প্রান্ত থেকে খবর পেতে লাগলেন সুদর্শন। তাঁর নির্দেশ মানেনি এলাকার অধিকাংশ মানুষ। মোড়লরা সব একে একে এল। উপস্থিত হল বিভিন্ন গাঁয়ের মান্যগণ্য মাতব্বর ব্যক্তিবর্গ। একা একা, দল বেঁধে। না, সুদর্শনের প্রতি অবহেলাবশত এ কাজ করেনি ওরা। আসলে, তাঁর ফতোয়াটাকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি কেউই। ওরা কল্পনাও করতে পারেনি, নিজের জামাই যেখানে প্রার্থী, সেখানে সুদর্শন সিংহবাবু মন থেকে অন্য কোন প্রার্থীকে ভোট দেবার ফতোয়া জারি করতে পারেন। সবাই ধরে নিয়েছিল, এটা কোন মতেই তাঁর অন্তরের কথা নয়। নন্দ সরকারকে আশীর্বাদ করে ফেলেছেন বলেই, এ তাঁর এক ধরনের লোক-দেখানো নির্দেশ। ফলে, অধিকাংশ ভোটই কার্যক্ষেত্রে শঙ্করপ্রসাদের বাক্সেই পড়েছে, সে জিতে গেছে।

ওদের কথাগুলো মনোযোগে সহকারে শুনতে থাকেন সুদর্শন। জবাব দেন না। জবাব দেবার কিছু নেইও। যে কারণেই ওরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করুক না কেন, তাতে এখন আর কিছু যায় আসে না। যা ঘটবার ঘটে গেছে। সুদর্শনের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও শঙ্করপ্রসাদ জিতে গেছে। কেবল, ওদের কথা শুনতে শুনতে এবং পরবর্তী সময়ে পুরো বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করে সুদর্শনের মনের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা হল, এটা কেবল নিছক ভুল বোঝাবুঝির ঘটনামাত্র নয়। অন্তরালে অন্য কিছু ঘটেছে, ঘটে চলেছে। তাঁর দিন সত্যিসত্যিই ফুরিয়েছে বুঝি। তাঁর ফতোয়া আজ ততখানি অমোঘ নয়। এবং সেই কারণেই, সুদর্শনের কেন জানি বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, শঙ্করপ্রসাদকে জেতাবার জন্যই ভোট দিয়েছে এরা।

ফতোয়ার আন্তরিকতা নিয়ে এখন যা সব বলছে, সেগুলো নেহাতই বাহানা, নিছক চক্ষুলজ্জা এবং ভয়-ত্রাসের তলানি, যা এখনও অবধি অবশিষ্ট রয়েছে সিংহগড়ের প্রতি এই এলাকার মানুষের মধ্যে। সুদর্শন ওদের মিষ্টি কথায় বিদায় করে দেন। পায়ের তলায় মাটি খুঁজতে গিয়ে আচমকা অনুভব করেন, পা-দুটোই নেই। তাই তো, তাঁর তো পা-দুটোই নেই। আজ পাঁচ বছর। কেমন করে ভুলে গিয়েছিলেন তা।

বিকেল বেলায় পায়ে পায়ে সরযু এল সুদর্শনের দোতলার বসবার ঘরে। সাদা গরদের লাল জরিপাড় শাড়ি পরেছে। পিঠ জুড়ে চুলের রাশ বেয়ে টপটপিয়ে জল ঝরছে। এই অবেলায় স্নান করেছে সরযু। কেন।

সরযুর হাতে একটা ঝকঝকে রেকাবি। তাতে ফুল, চন্দন, মিষ্টি। রেকাবিটা টুলের ওপর নামিয়ে দিয়ে সুদর্শনকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল সরযু। তারপর রেকাবি থেকে ফুল-চন্দন ছিটিয়ে দিল তাঁর মাথায়। এক টুকরো পেঁড়া ভরে দিল তাঁর মুখে।

প্রতিবাদ করবার কোন স্পৃহাই ছিল না মনে, সে ক্ষমতাও বুঝি হারিয়ে ফেলেছেন সুদর্শন। তবুও অবাক হয়ে শুধোন, 'কী ব্যাপার? অসময়ে ই সব ক্যানে? ই সব তো আমার সইন্ধ্যা বেলার প্রাপ্য।'

সরযুকে ভারী প্রসন্ন লাগছিল। কপালের মধ্যিখানে সিঁদুরের গোলাকার টিপটাকে খুব বড় আর উজ্জ্বল লাগছিল।

মৃদু গলায় বলে, 'শঙ্কর জিতেছে তো, তাই একটু পূজা দিয়ে এল্যম।'

একটু আগেই লাবণ্য এসেছিল। সুদর্শনকে ভক্তিভরে প্রণাম করে গেছে। কারণ শুধোতে মৃদু হেসেছিল কেবল। জবাব দেয়নি। সুদর্শনের মনে হয়েছিল অকারণে সেই প্রণাম। ভেবেছিলেন, ক্ষ্যাপা মায়ের ক্ষ্যাপা মেয়ে, কখন কী করে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এতক্ষণে বুঝলেন, সেও ওই একই কারণে এসেছিল। ওর স্বামী জিতেছে।

পেঁড়ার স্বাদটুকু মুখের থেকে হারিয়ে যায় দ্রুত। মনের মধ্যে হাজার বার বুক চাপড়াতে থাকেন সুদর্শন। আকুল গলায় বলেন, শুধু বিজয়ীর জন্য আনন্দ নয়, পরাজিতের জন্যও সমবেদনা দেখানো উচিত তোমাদের। তোমাদের কর্তব্য সেটা। আমি কি তোমাদের কেউ নয়। আমার পরাজয়টা কেন একটুও বিঁধছে না তোমাদের বুকে। আমি কি তোমাদের এতই পর। না, এ কথা শুনতে পায়নি সরযু। কারণ, এ কথা হাজারবার সুদর্শনের মধ্যে গুমরে বেড়ালেও গলা পেরিয়ে বাইরে আসেনি বারেকের তরে। উৎফুল্ল সরযু ভারি পায়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় বৈকালিক রোদ্দুরটুকু সর্বাঙ্গে মাখতে মাখতে সে সুদর্শনের চোখের আড়ালে চলে যায়। তার জরির আঁচল লুটোতে থাকে মেঝেয়। তার শরীরের তাবৎ অলঙ্কার এক নতুন রাগে বাজতে থাকে আজ।

এতক্ষণে যেন খেয়াল হচ্ছে সুদর্শনের, আজ সারাদিন লাবণ্যকে খুশি খুশি দেখেছেন। তার হাঁটায় চলায়, কথা বলায় ফুর্তির অন্ত ছিল না যেন। তার চোখের কোল অনেক ভরাট লাগছিল। সুদর্শন বিমূঢ় হয়ে ভাবেন, মনে মনে বলেন, এ কি তোর সত্যিকারের আনন্দ মা। আজকের দিনে কি তোর আনন্দ করা সাজে। সত্যি, মেয়েরা যে কোন্ চোখে দুনিয়াকে দেখে, তা সে ওরাই জানে। কিসে যে ওদের সুখ, অসুখ, এ এক অপার রহস্য। সুদর্শন তো দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, এই ক'বছরে লাবণ্য অনেক আটপৌরে হয়ে গেছে শঙ্করের কাছে। তার শত কাজের মধ্যিখানে লাবণ্যর স্থান ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। অথচ সুদর্শন তো ভালই জানেন,

এককালে লাবণ্যকে কী ভীষণ, ভীষণ, পাগলের মতো ভালবাসত শঙ্করপ্রসাদ। তার পুরো সত্তা জুড়ে লাবণ্যর জন্য বোধ করি বিছানো ছিল একটি কারুকার্যময় মহার্ঘ আসন। সুদর্শনের দিক থেকে এত অপমান, নির্যাতন যে সে সহ্য করে গেছে দিনের পর দিন, ফুঁসে ওঠেনি এক দিনের তরেও, কোনও বেসামাল ক্রোধের মুহূর্তে সে যে সিংহগড় ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারেনি, তার একমাত্র কারণ, অন্তত সুদর্শনের বিশ্লেষণে, লাবণ্যর প্রতি পাগলের মতো ভালবাসা। সেই ভালবাসাটুকু পুরোনো আতরের মতো গন্ধের তীব্রতা হারাচ্ছে দিন দিন। সুদর্শন অনুমান করেন, কর্মের হাজার প্যাঁচে নিজেকে জড়াতে জড়াতে একদিন লাবণ্য অনেক ফিকে হয়ে আসবে শঙ্করপ্রসাদের মনে। সেদিন ওর সঙ্গে একটা আটপৌরে গেরস্থালি সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সবকিছু নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কর্মযজ্ঞের আগুনে। সুদর্শন যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পান নিজের আত্মজার সর্বস্ব হারানোর দিনগুলিকে।

নিজের মেয়ে-জামাইয়ের একান্ত সম্পর্ক নিয়ে এসব গূঢ় ভাবনা ভাবতে সঙ্কোচ হয় সুদর্শনের। কিন্তু ভাবনা— ভাবনাই। সুদর্শন চান কিংবা না চান, ওরা মনের অগোচরে এসে জুড়ে বসবেই। জবরদখলের কায়দায় ঢেকে ফেলবেই মনের তাবৎ আকাশ। সুদর্শনের ভারি ভাবনা হয়, স্বামী-গরবে গরবিনী হওয়ার ফাঁকে ফাঁকে লাবণ্য এসব কথা ভাবছে তো? নাকি বাপ হয়ে এই শেষ বেলায় সেটাও ওকে ডেকে বুঝিয়ে বলে দিতে হবে।

সুদর্শন গুমরে গুমরে ভাবতে থাকেন। পরের ছেলেকে আপন করতে গিয়ে, নিজের বংশপঞ্জীতে ওর নামটা খোদাই করতে গিয়ে, পদেপদে পরাজয় স্বীকার করতে হল তাঁকে। জীবনের একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছে এতখানি পরাজয় সহ্য করেন এমন মানসিক শক্তি কি সুদর্শনের অবশিষ্ট রয়েছে!

ওদিকে আরও এক বিড়ম্বনা বেড়েছে সুদর্শনের। নন্দ সরকারকে টিটকিরি দিচ্ছে চারপাশের মানুষ। ভয়ও দেখাচ্ছে। সুদর্শন সিংহবাবুর জামাইয়ের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানোর প্রতিফল নাকি তাকে ভোগ করতেই হবে। শুনে বড় একটা বিস্মিত হন না সুদর্শন। নন্দ সরকারকে ভয় এবং বিদ্রুপ সইতেই হবে। এ তার ভবিতব্য। কিন্তু সুদর্শন এখন সবাইকে কী করে বোঝান, নন্দর কোনই দোষ নাই, উনিই তাকে গোপনে দাঁড় করিয়েছিলেন শঙ্করপ্রসাদের বিরুদ্ধে। ওর ভোটের যাবতীয় খরচা-খরচাও সুদর্শনই বহন করেছেন গোপনে। এ সব কথা কি মানুষ বিশ্বাস করবে এখন।

রাত কত হল! সরযু তার 'সান্ধ্য দর্শন' সেরে গেছে বহুক্ষণ। সনাতনও রাতের খাবার দিয়ে গেছে। কৃষ্ণদাস দৈনন্দিন হিসাবপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, সেও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। মধ্যরাত কি পেরিয়ে গেছে তবে। আজ কোন্ তিথি। শুক্লপক্ষের একাদশী কিংবা দ্বাদশী। তার মানে চাঁদ ওঠেনি এখনও? সাতভায়া তারা কি হেলে পড়েছে মধ্য গগন থেকে! সন্ধে নাগাদ সামান্য মেঘ করেছিল আজ। সরযু বলেছিল, আজ রাতে বৃষ্টি হতে পারে। মেঘ কি এখনও রয়েছে আকাশে। বৃষ্টিপাতের সব আয়োজন কি সম্পূর্ণ হল এতক্ষণে। আজ একটু বৃষ্টি হলে ভাল হয়। অনেকদিন বৃষ্টি ঝরেনি। বড় গুমোট গরম, ভেতরে-বাইরে। বড়ই অকারণ, অকরুণ খরা। বড়ই পিপাসা। পিপাসা, পিপাসা।

যে বিছানাতে আধশোওয়া হয়ে বসে রয়েছেন সুদর্শন তারই লাগোয়া একটা কুলুঙ্গিতে সনাতন সুদর্শনের জন্য আফিম রাখে। রোজ সন্ধ্যায় তার থেকে একটু একটু করে দেয়, সঙ্গে এক গ্লাস ঘন দুধ। সুদর্শন কুলুঙ্গিখানার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। সোজা হয়ে উঠে

বসেন। পাছা ঘষে ঘষে এগোতে থাকেন ওদিকে। আজ আর কিছুতেই ঘুম আসছে না তাঁর চোখে। আফিমের নেশায় সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবখানাও আজ পুরোপুরি উধাও। আফিমটা খাঁটি তো? নাকি সরযুর গোপন নির্দেশে আফিমের মাত্রাটা কমিয়ে দিচ্ছে সনাতন।

দিনকতক ধরে সরযু মাঝে মাজেই অনুযোগ করছিল, আফিমের মাত্রাটা দিন দিন বেড়্যে যাচ্ছে আপনার। বুড়া শরীরে অতটা সইবেক নাই। সুদর্শন কানে তোলেননি সরযুব অনুযোগ। সরযুকে অবজ্ঞা করবার জন্য নয়, আসলে সুদর্শনকে তো নিয়মিত লড়াই করতে হয় প্রতি সন্ধ্যায়, গভীর রাত অবধি, নিজের স্মৃতির রাজ্যের অবাধ্য প্রজাগুলোর সঙ্গে। নিজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, নিজের বংশ-মর্যাদা, আভিজাত্য এবং যুগপৎ আগন্তুক হাওয়ার সঙ্গে। হরিণমুড়ির খালের স্রোতস্বিনী ধারার সঙ্গে। ঠাকুরদার আমলের ওই দেওয়াল ঘড়ির সঙ্গে। কাদম্বরী, সরযু, শঙ্করপ্রসাদ, লাবণ্য, প্রিয়ব্রত, নিশান ও পরীক্ষিত বাউরি—এদের সঙ্গে সুদর্শনের যেন জন্ম-জন্মান্তরের বিরতিহীন, সন্ধিহীন লড়াই। ওরা যে প্রতি সন্ধ্যায়, সব কিছু শুনশান হলেই আসে সদলবলে। সশস্ত্র। ইচ্ছে না থাকলেও সুদর্শনকে লড়াইটা করতেই হয় ওদের সঙ্গে। পড়ে পড়ে মার খেতে আর যে-ই হোক সুদর্শন সিংহবাবু আসেননি এ দুনিয়ায়। সুদর্শন, কাজেই, লড়তে থাকেন প্রাণপণে। ওদের সম্মিলিত আক্রমণ ঠেকান, পালটা আক্রমণ রচনা করেন, আর, সে লড়াইতে আফিমই তাঁর একমাত্র অস্ত্র। ওরা দলেবলে যতই বৃদ্ধি পায়, ওদের অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা যতই বাড়ে, সুদর্শনও ততই বাড়িয়ে দেন তাঁর অস্ত্রের মাত্রা। এইভাবে, আজ কতদিন ধরে যে তাঁর লড়াই চলছে, সরযু তার বুঝবে কী! সুদর্শনের ইদানীং ঘোরতর সন্দেহ জাগে, সরযুই বুঝি সুদর্শনের শত্রুপক্ষের প্রধান সেনাপতি। ও তো নিজেই তাঁর কাছে এক জলজ্যান্ত স্মৃতির ভাণ্ডার। সুদর্শনের সন্দেহ জাগে, আফিমের মাত্রা কমিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে একদিকে ওঁকে নিরস্ত্র করে, অন্যদিকে শত্রুদের ওঁর দিকে পলেপলে লেলিয়ে দিয়ে, সরযুও কি জিততে চাইছে তার কোনও অসমাপ্ত লড়াই। কিংবা সরযুর স্মৃতির মধ্যে থেকে স্বয়ং চন্দ্রকান্ত আচার্য!

কুলুঙ্গির মধ্যে একটুখানি হাতড়াতেই সুদর্শন পেয়ে যান কৌটোটা। আজ তাঁর চারপাশে শত্রুর সংখ্যা অগুনতি। ওরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। সুদর্শন এলোপাতাড়ি অস্ত্র চালিয়েও ওদের একতিল কাবু করতে পারছেন না। অস্ত্রের পরিমাণ এবং তীক্ষ্নতা আজ না বাড়ালেই নয়। রাত পোহাতে এখনও ঢের বাকি। অতক্ষণ এই সামান্য অস্ত্র নিয়ে সুদর্শন ওদের ঠেকিয়ে যেতে পারবেন না কিছুতেই।

কৌটোখানা খুলতেই সুদর্শনের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণদাস বুঝি আজই গিয়েছিল বিষ্টুপুরে। সারা মাসের আফিম কিনে এনে ভরে রেখেছে কৌটোয়। সুদর্শন সবটুকু ঢেলে ফেলেন বাঁ হাতের তালুতে। দ্রুত গোলা পাকিয়ে নেন। তারপর দু-তিন কিস্তিতে পুরোটাই চালান করে দেন পেটে।

সারা শরীর পাক দিয়ে গুলিয়ে উঠছে। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তীব্র বিবমিষা। বিবমিষা, বিবমিষা।

২৭. নদী এক জলঘড়ি

বাইরে চলছে প্রলয় মাতন। হাওয়া বইছে সোঁ-সোঁ। কড়াক্-কড়াক্ করে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঝলাক ঝলাক। আজই কি পৃথিবীর শেষদিন। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই চরাচর।

সে রাতেও প্রকৃতি এমনই মরণ খেলায় মেতেছিল। বত্রিশভাগীর জঙ্গল থেকে ধেয়ে আসছিল বল্গাহীন উদোম হাওয়ারা। কানশিকড়ার শ্মশান এলাকা সেদিনও রুদ্ররূপ ধরেছিল গভীর রাতে। আর, শ্মশান জুড়ে উপস্থিত ছিল দু'জন মাত্র দ্বিপদ প্রাণী। এক ছিলেন সুদর্শন সিংহবাবু, দ্বিতীয় জন ছিল সাধুর বেশে চন্দ্রকান্ত। তখন প্রকৃতি রুদ্রলীলায় মেতেছে। সুদর্শন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলেছেন বটতলার দিকে। তাঁর ডান হাতে টোটাভর্তি দোনলা বন্দুক। সারা শরীর ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে। রক্তের মধ্যে অস্থির জিঘাংসা। বুকের ভেতর জমাট অন্ধকারে সরযু যেন ফিসফিসিয়ে জেরা করে চলেছে, কেন বলেছিলে, মানুষটা মরে গেছে? কেন সারাজীবন ধরে মিথ্যে বলেছ আমায়? কেন প্রতারণা করেছ? জবাবে, হাজারবার রাধামাধবের নামে শপথ করেন সুদর্শন, জানথ্যম নাই, বিশ্বাস কর সরযু, আমি জানথ্যম নাই। লোকটাকে মৃত জেনেই আমি কাশী ছেড়েছিল্যম। তাছাড়া পাণ্ডাঠাকুরও তো মিছা বলবার মানুষ লয়। সে-ও তো চিঠি লিখে জানিয়েছিল। আমরা দু'জনে মিলেই তো চন্দ্রকান্তর শরীরখানা থাপনা করেছিলাম গঙ্গার জলে। তখন তার নাড়িতে সাড় ছিল নাই। বিশ্বাস কর সরযু, এ সত্যি। তারপরে, কী করে যে মানুষটা ফের জীবন ফিরে পেল, সে তো সুদর্শনের কাছেও এক অপার রহস্য। এখন মনে হচ্ছে, নাড়ির স্পন্দন থেমে গেলেই মানুষ মরে যায় না। তাঁর উচিত ছিল চন্দ্রকান্তকে শেষ অবধি পরীক্ষা করে তার লাশের দাহকর্ম সেরে, তারপর কাশী ত্যাগ করা।

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঝুরিবেষ্টিত কুঠরির সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুদর্শন। নিকষ অন্ধকারে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যুতের অপেক্ষায়। এক সময় আকাশে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, এবং সেই আলোয় নিশানা ঠিক করে পরপর দু'খানা গুলি ছুঁড়লেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকার কুঠরি থেকেও গর্জে উঠল বন্দুক, পরপর দুটি, এবং তীব্র আর্তনাদ করে সুদর্শন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

পরের দিন সকালে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসে ভিড় করেছিল শ্মশানের বটতলায়। বাতাসে তখনও ভাসছিল বারুদের গন্ধ। বটের কোটরে সাধুবাবার শরীরখানি স্থির। আর অল্প তফাতে দু'খানি পায়ে গুলি খেয়ে অচেতন পড়ে রয়েছেন সুদর্শন সিংহবাবু।

দুটো ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারেননি সুদর্শন। এত কাছ থেকে চন্দ্রকান্ত কেন পরপর দুবারই ভুল করল নিশানা। কেন দুটি গুলিই লাগল সুদর্শনের পায়েই। আর, সরযু কেনই বা এতদিন বাদেও তেতলার ছাদে উঠে লণ্ঠন দুলোত গভীর রাতে। প্রথম প্রশ্নের জবাব বানিয়ে নিয়েছেন নিজের মতো করে। হাজার আক্রোশ থাকলেও চন্দ্রকান্ত বুঝি বা খুন করতে চায়নি সুদর্শনকে, পাছে সরযুকে বৈধব্য জীবন বহন করতে হয়। সে বোধ করি চায়নি, তার প্রাণের সরযু তার জন্যই বিধবার সাজ তুলে নেয় অঙ্গে। হাজার হোক, সরযুকে সে তো পাগলের মতো ভালবাসত। সুদর্শনের কোনও সংশয় নেই তাতে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটি তাঁর কাছে নিরাকার রহস্যই থেকে গেল। চন্দ্রকান্তর উদ্দেশেই যদি সরযু নিয়মিত আলোক সঙ্কেত পাঠিয়ে থাকে তেতলার ছাদ থেকে, তবে কি সরযু চিরকালই বিশ্বাস করত, চন্দ্রকান্ত মরেনি। এই পৃথিবীর কোনও প্রান্তে সে বেঁচে রয়েছে,অপেক্ষা করছে সরযুর জন্য। সে কি আগেভাগেই জেনে ফেলেছিল, চন্দ্রকান্তই সাধুবাবা। সেই জন্যই কি ফি-রাতে তেতলার ছাদে শুরু হয়েছিল তার সাম্প্রতিক পাগলামি। সেই জন্যই কি সাধুবাবার কাছে হাজার পীড়াপীড়িতেও যেতে রাজি হয়নি সরযু। এ সব প্রশ্নের জবাব আজ আর মিলবে না। জবাব পাওয়ার আর সময়ও নেই।

অনুশোচনায় ভরে যায় সুদর্শনের বুক। না, সরযুকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে নয়। চন্দ্রকান্তকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবার জন্যও নয়। অনুশোচনা শুধু এই কারণে যে সিংহ হয়ে তিনি শৃগালের মতো আচরণ করেছেন চন্দ্রকান্তর বেলায়। ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার ক্ষেত্রে। অনেক নাটক করেছেন, অভিনয়, প্রতারণা। সিংহবাবু-বংশের কোনও পুরুষকে এই শৃগালবৃত্তি মানায় না। তিনি তো সিংহ। সিংহগড়ের রাজা। কি ক্ষতি ছিল, বত্রিশভাগীর জঙ্গলে ঐ দিন চন্দ্রকান্তকে বন্দুকের গুলিতে মাটির বুকে লুটিয়ে দিলে। তারপর বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে সরযুকে বিয়ে করে সিংহগড়ে তুললে। সিংহর যোগ্য আচরণ হত সেটাই। কি প্রয়োজন ছিল সরযুর সঙ্গে এমন শৃগাল-সুলভ প্রতারণার। কিছু কি লাভ হল তাতে? ছলনার দ্বারা ভুলিয়ে কাশী নিয়ে গিয়ে, সেখানে মৃত কিংবা মৃতপ্রায় চন্দ্রকান্তকে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে আসা, পাণ্ডাকে দিয়ে ওর মৃত্যু সংবাদ জানানো এবং এতসবের মাধ্যমে সরযুর কাছে একটা বিষয়ই প্রতিষ্ঠা করা যে চন্দ্রকান্তর মৃত্যু হয়েছে এবং ঐ মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী নন, তিনি চন্দ্রকান্তর খুনী নন। প্রতিষ্ঠা কি করা গেছে? সরযু তো আজীবনকাল ধরে সুদর্শনের কোনও কথাই তিলমাত্র বিশ্বাস করে নি। তবে? কি লাভ হল শৃগালবৃত্তি করে? সিংহবাবু বংশের পুরুষেরা চিরকাল যা কিছু করেছে প্রকাশ্যে শত চক্ষুর সুমুখে বুক চিতিয়ে করেছে। দ্বারিকাপ্রসাদ মঙ্গল শিকারিকে প্রকাশ্যে জানোয়ার দিয়ে খাইয়েছেন। সুদর্শন স্বয়ং নিশান বাউরির বউকে লগদি দিয়ে তুলে নিয়ে গেছেন প্রকাশ্যে। বনের বাঘও আড়াল করে খায়, কিন্তু সিংহবাবু বংশের পুরুষেরা খান প্রকাশ্যে, বুক চিতিয়ে। এটাই তাদের রীতি, ধর্ম। সুদর্শনও আজীবনকাল সেই রীতি-ধর্মই পালন করে এসেছেন। কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই তাঁর অধঃপতন ঘটেছিল। সিংহ থেকে শৃগালে নেমেছিলেন তিনি।

আসলে তিনি চেয়েছিলেন চন্দ্রকান্তর নিরুদ্দেশ ও মৃত্যু নিয়ে সরযু সুদর্শনকে দোষী না ভাবুক, খুনী না ভাবুক। সুদর্শন ভেবেছিলেন দয়িতের খুনীকে সরযু কোনও দিনও ক্ষমা করবে না, প্রেম দেবে না। এটাই আসল কথা। কেবল স্বামী হিসেবে অখণ্ড আধিপত্য নয়, মনে মনে সরযুর প্রেম যাচ্‌ঞা করেছিলেন সুদর্শন। সরযুর প্রেম কামনায় নিজেকে শৃগাল বানিয়েছিলেন তিনি। সরযুর কাছে নিজেকে নির্দোষ, নিষ্পাপ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। নিজেকে ছলনার মাধ্যমে। প্রেম শৃগালকে সিংহ বানায়, সুদর্শনের ক্ষেত্রে সিংহকে শৃগাল বানিয়েছিল। হায়, সিংহবাবু বংশের পুরুষ হয়ে নারীর প্রেমের জন্য শৃগাল সাজা, এও এক বিষম লজ্জাব, পরাজয়ের। সেই পরাজয়ের গ্লানি সুদর্শন আজীবনকাল বহন করে গেলেন। কিন্তু কি লাভ হল তাতে? কি পেলেন? সরযুর প্রেম কিংবা বিশ্বাস কিছুই পান নি। চন্দ্রকান্ত এতদিন বাদে ফিরে আসায় তিনি সরযুর কাছে পুরোপুরি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলেন। শেষপর্বে চন্দ্রকান্তকে খুন করে সরযুর চোখে সেই খুনী হিসেবেই বেঁচে রইলেন, যে পাপ ধুয়ে ফেলবার জন্য তিনি এতখানি ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ঠাকুরদার আমলের দেওয়াল ঘড়িটা টিকটিক বেজে চলেছে রোজ দিনের মতো। কিন্তু সুদর্শনের মনে হয়, আজ আর অতখানি নিরাসক্ত নয় ওটা। মনে হয়, টিকটিক শব্দটা যেন দ্রুত লয়ে বাজছে আজ। তবলার লহরার মতো ক্রমশ যেন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ হচ্ছে তার লয়। অর্থাৎ সুদর্শনের মনে হয়, সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সুদর্শনের শিথিল আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতো ঝরে ঝরে পড়ছে তরল সময়। সুদর্শনের পক্ষে কোন কিছু জেনে বুঝে নেওয়ার সময় নেই আর।

কান পাতলেই শোনা যায়, বয়ে চলেছে হরিণমুড়ি। গভীর নিশাকালে তার ক্লান্তিহীন ঘুঙুর বেজে চলেছে অবিরাম। অনাদি অখণ্ড সময়কে প্রতি জলকণায় টুকরো টুকরো করে সে বইছে। বয়ে যাবে আরও বহু যুগ ধরে। সুদর্শন যেন মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি বসে রয়েছেন হরিণমুড়ির পাড়ে। তাঁর চোখের সুমুখে এক অনাদি অখণ্ড বহতা জলের ধারা। জলের ওপর স্রোতের টানে ভেসে চলেছে কতকিছু। ভাসমান বস্তুগুলি, কয়েক মুহূর্ত আগে যারা ছিল ভবিষ্যৎ, সুদর্শনের সামনে এসে হল বর্তমান, পর মুহূর্তেই ভাসতে ভাসতে সুদর্শনকে অতিক্রম করে অতীত হয়ে গেল। সুদর্শনের মনে হয়, এইভাবে অসংখ্য সময়ের পুঞ্জ হরিণমুড়ির জলের অসংখ্য বিন্দু হয়ে ভবিষ্যৎ থেকে ছুটে চলেছে অতীতের দিকে। সুদর্শনের মনে হল, অনাদিকালব্যাপী বহতা সময়ের এই বিরতিহীন স্রোতধারায় বুঝি বা তিনিও ভেসে চলেছেন একদলা পচা শ্যাওলার মতো। হরিণমুড়ির সময়-ধারায় আর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অতিক্রম করে যাবেন বর্তমানের সীমানা। প্রবেশ করবেন অতীতের রাজ্যে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন, পেছনে পেছনে ভেসে আসছে সরযু, লাবণ্য, শঙ্করপ্রসাদ, হরবল্লভ...। আরও পেছনে প্রিয়ব্রত, পরীক্ষিত বাউরি...। আরও অনেকানেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ। আসছে নুতন সময়কাল, নতুন মানুষ, নতুন নতুন উত্থান-পতন। সময়ের দোলায় দুলতে দুলতে তারাও চলে যাবে অতীতের দিকে। হরিণমুড়ির সময়-ধারায় ভাসমান এই অফুরন্ত জীবনস্রোতের মধ্যে নিজেকে তাঁর অতি সাময়িক, নগণ্য, ভঙ্গুর বলে মনে হয়।

নদী এক আশ্চর্য জলঘড়ি। সুদর্শনের বুকের ঘড়িটা খুব শিগগির বন্ধ হয়ে যাবে। ঠাকুরদার কেনা দেওয়াল ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে যাবে একদিন। কিন্তু সুদর্শনের কোনই সন্দেহ নেই, হরিণমুড়ি নামক আশ্চর্য জলঘড়িটি বুকে অখণ্ড সময়কে ধারণ করে বইতে থাকবে অনাদি অনন্তকাল। সুদর্শন নতজানু হন হরিণমুড়ির পাড়ে। নদীর কাছেই তো নতজানু হতে হয়।

কোথাও বুঝি ধূপ জ্বলছে। কাছাকাছি কোথাও। অনেকক্ষণ ধরে গন্ধ পাচ্ছিলেন সুদর্শন। কিন্তু গন্ধটার উৎস কোথায়, সুদর্শন বুঝতে পারছেন না কিছুতেই। এই ঘরের মধ্যে, নাকি বাইরে থেকে আসছে গন্ধটা। কাঁড়ঘসার জঙ্গলের মধ্যে চণ্ডীমাতার প্রাচীন মন্দিরের থেকে, নাকি কানশিকড়ার শ্মশানের সাধুবাবার ডেরা থেকে।

ধূপের গন্ধটা কিছুতেই সইতে পারে না সরযু। বলে, অসহ্য লাগে। মাথা ধরে যায়। বহু বছর আগে, এমনি এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে চণ্ডীমাতার পোড়ো মন্দিরের মধ্যে ধূপ জ্বালিয়েছিল চন্দ্রকান্ত। গন্ধর্ব-বিবাহের সংক্ষিপ্ত আয়োজনেরই অঙ্গ ছিল ওটা। সুদর্শন যখন মন্দিরের মধ্যে ঢোকেন, স্পষ্ট মনে আছ, ধূপের গন্ধটা তখনও ভাসছিল মন্দিরের গুমোট বাতাসে। ওই বায়বীয় গন্ধের আবরণ থেকে তিনি বের করে এনেছিলেন সরযুকে। তারপর থেকেই তার ধূপের গন্ধের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। ধূপের গন্ধের সঙ্গে সে অর্জন করেছিল এক হাড়-কাঁপানো অভিজ্ঞতা, এত বছর বাদেও বুঝি সে স্মৃতি মুছতে পারেনি। সেই থেকে ধূপের গন্ধটা তাকে আজীবনকাল তাড়া করে বেড়াচ্ছে বুঝি। সরযু প্রাণপণে ওই গন্ধের আক্রমণ থেকে পালাতে চায়।

সুদর্শনও চান। এই মুহূর্তে ভীষণভাবে চাইছেন ওই গন্ধের থেকে পালাতে। অনেক দূরে চলে আসতে পেরেছেন তিনি। গন্ধটা ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশ। ফিকে হয়ে আসছে হরিণমুড়ির একঘেয়ে বয়ে যাওয়ার আওয়াজ। অস্বচ্ছ হয়ে আসছে প্রিয়ব্রত এবং পরীক্ষিত বাউরির মুখগুলি।

সারা শরীর অসাড় হয়ে আসছে। ঘুম আসছে তাঁর, ঘুম। শরীর জুড়ে তাল তাল নিশ্ছিদ্র ঘুম...।

দহন পর্ব

২৮. মধ্যরাতের বায়োস্কোপ

মাঝরাতে অমন আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটির ঘরের দেওয়ালে বায়োস্কোপের ছবি।

একে তো অসুস্থ শরীরে দু'বেলা চলছে মৃত্যুদূতের আনাগোনা, তার ওপর দিনভর অক্লান্ত পরিশ্রম। কাটুল থেকে জুজুড় গাঁ, কম করেও বিশ-বাইশ মাইল হাঁটবার অবসাদ। অন্তত দু'রাত্তির নিদ-উপোসী শরীরটা এতক্ষণ তাই গাঢ় ঘুমে অচেতন ছিল। সহসা ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং মাটির ঘরের দেওয়ালে বায়োস্কোপের ছবি...। ছবি, ছবি।

খোলা রাস্তায় কিংবা মাঠ বরাবর হাঁটা এক, এ হল গহীন জঙ্গলে গো-বাথান ধরে ধরে হাঁটা। দু'পাশের ঝোপঝাড় সরিয়ে, শিয়াকুল গাছের কাঁটায় গা-হাত-পা ছড়ে, কোনও গতিকে পায়ে পায়ে এগোনো। এক ঘন্টার পথ তিনঘন্টা। তার ওপর দিনভর দানাপানি পড়ে নি পেটে। চুয়ামসিনার সিংহগড়ে মা লাবণ্যর হাতের ননী-মাখনে বেড়ে ওঠা শরীর অতখানি ধকল সইতে না পেরে ভেঙে পড়েছে বহুদিন আগে। দিনভর উপবাসে পুরো শরীরখানা তাই তিরতির করে কাঁপছিল। সেই উপোসী পেটে সন্ধে প্রহরে পড়েছিল ভূতমুড়ি ধানের লাললাল মোটা চালের গরম ভাত। সঙ্গে ফোড়ন দেওয়া ডিংলার ঝাল। বৈশাখের ঝকঝকে আকাশ, অসংখ্য তারার কুচি, মহাদেব টাণ্ডির উঠোনে ঝাঁকড়া মউল গাছের তলায় ফুরফুরে আদুরে বাতাস, ভরপেটে বার-দুই ঢেকুর তুলতে না তুলতেই সারা শরীর অসাড়। দু'চোখ জুড়ে তালতাল ঘুম। ঘুম, ঘুম।

মহাদেব টাণ্ডি বারংবার বলেছিল, ঘরের ভিতরে শুয়ে লিদান আইজ্ঞা। প্রিয়ব্রত কান দেয় নি। ঘরের মধ্যে একে তো ভাঁপ-গরম, তার ওপর ছারপোকার ডিপো। সবচেয়ে বড় কথা, সবগুলো পথ খোলা থাকা চাই। পালাবার সবগুলো দরজা। এ হল পার্টির নেতা মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জার প্রাথমিক নির্দেশ। যেখানে তুমি কাজ-কারবার করছ, আগে থেকে ঠিক করে রেখো, বেগতিক বুঝলে কোন পথে সটকাবে। মহাভারতের অভিমণ্যু যে আকামটি করেছিল ঐ সর্বনাশা ভুল কদাচ নয়। কেবল একটাপথ খোলা রেখে তুমি যদি ব্যূহের মধ্যে সেঁধাও, তবে কপালের ফেরে ঐ পথখানি বন্ধ করে দিতে এক শালা জয়দ্রথই যথেষ্ট। তখন তুমি হাজার পাহাল পাড়লেও ভীমের বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে ব্যূহ থেকে উদ্ধার করে। কাজেই, যেখানে বসবে, শোবে, মিটিং করবে, সব সময় তার চারপাশের দশটা দিকই খোলা রেখো। আটদিক নয়, দশদিকই। শিয়রে শমন এলে তখন একটা না একটা দিক তুমি খোলা পেয়ে যাবেই! কাজেই মহাদেব টাণ্ডির ঘরের সামনের উঠোনে, ঝাঁকড়া মউল গাছের অন্ধকার ছায়ায় দড়ির খাটিয়া পেতে শুয়েছিল প্রিয়ব্রত। পরীক্ষিত বাউরি চলে গিয়েছিল জুজুড় গাঁয়ের অন্যপ্রান্তে, অনন্ত মাদোড়ের ঘরে। কথা ছিল, সকালবেলায় ফিরে আসবে সে। পরবর্তী কর্মসূচী তৈরি হবে তখন। প্রিয়ব্রতকে নিয়ে পরীক্ষিত বাউরির মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। প্রিয়ব্রত জানে। এই ঘোর বিপদের দিনে প্রিয়ব্রতর একটা সুরাহা না হলে সে কিছুতেই অন্যদিকে নজর দিতে পারছে না। অথচ প্রিয়ব্রত তো বোঝে, পার্টির এই ঘোর সংকটের দিনে, যখন বাঁধগাবা আন্দোলনের বারোআনা নেতাই লুকিয়ে রয়েছে জয়পুরের কাছে সেনাপতির গহীন জঙ্গলে পরীক্ষিত বাউরির কাঁধে কতখানি গুরুদায়িত্ব। সেনাপতির জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা নেতাদের সঙ্গে বাইরের জগতের দৈনন্দিন যোগাযোগ ঘটানো, খাদ্য-ওষুধ সরবরাহ, গোপন

আদেশ-নির্দেশ পরিবহন—এসব পরীক্ষিত বাউরি ছাড়া আর কার পক্ষেই বা করা সম্ভব। কেই বা অমন হনুমানেব মতো তরতরিয়ে গাছে চড়তে পারে, পানকৌড়ির মতো ডুব-সাঁতারে পেরিয়ে যেতে পারে দ্বারকেশ্বর, খরগোশের মতো পলকের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে, কাঁটাঝোপের জঙ্গলে। অমন বিড়ালের মতো নিঃশব্দ গতি আর কারই বা রয়েছে। অমন কুকুরের মতো সজাগ কান, তীক্ষ্ণ নাক, পাতলা ঘুম, শেয়ালের মতো চতুর মস্তিষ্ক—না, পরীক্ষিত বাউরি ছাড়া আর কারো মধ্যেই দেখে নি প্রিয়ব্রত। অথচ সেই পরীক্ষিত বাউরি কিনা আজ আট মাসের ওপর কেবল প্রিয়ব্রতকে নিয়েই বিব্রত রয়েছে। অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসতই পাচ্ছে না বেচারা। প্রিয়ব্রত বেশ কয়েকবার বলেছিল,আমি লিজের ব্যবস্থা লিজেই করে লিব, ধরা পড়ি তো পড়ব, তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে লজর দাও, পরীক্ষিত দা। আমার নিবাপত্তার চেয়ে সেগুলো অনেক বেশি দামী। পরীক্ষিত বাউরি নিঃশব্দে হেসেছিল। জবাব ও দেয়নি, প্রিয়ব্রতকে ছেড়েও যায় নি।

প্রিয়ব্রত যতক্ষণ ঘুমোয় নি, মহাদেব টাণ্ডি, গোপীনাথ টাণ্ডি, সুবল লায়েক, পুরন্দর লায়েক—সবাই একবাক্যে অভয় দিয়েছিল, আপনি লিরালন্দে লিদান আইজ্ঞা, আমরা সতর্ রইল্যম্। সুবল আর পুরন্দর যে জেগে থাকবে না, মানে, থাকতে পারবে না, সেটা প্রিয়ব্রত আন্দাজ করেছিল। একে তো সেই রুইঘর থেকে জুজুড় অবধি জঙ্গলে জঙ্গলে প্রিয়ব্রত আর পরীক্ষিত বাউরিব সঙ্গে হেঁটে এসেছে ওরাও। তার ওপর সন্ধেবেলায় সখা-স্যাঙাতের ডেরায় রাত্রিবাস করবার সুবাদে বুঝি দু'ঢোঁক হাঁড়িয়া বেশি গিলেছে, কাজেই ওদের ওপর ভরসা করা মিছে। কিন্তু মহাদেব টাণ্ডি আর গোপীনাথ টাণ্ডির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রিয়ব্রতর মতো মানুষ কিনা আজ ডেরা নিয়েছে খোদ মহাদেব টাণ্ডির বাড়িতে, এই ভাবনাতেই তো মহাদেবের রাতভর ঘুম আসার কথা নয়। কারণ, কপালের ফেরে কোনও গতিকে প্রিয়ব্রত যদি মহাদেবের আশ্রয়ে থেকে ধরা পড়ে যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জার সামনে আর জন্মেও মুখ দেখাতে পারবে না মহাদেব। এবং চন্দ্র-সূর্য যদ্দিন বিদ্যমান, সাথী কমরেডরাও কেউ ওর মুখদর্শন করবে না। এইসব সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যেই গাঢ় ঘুম একেবারে গিলে ফেলেছিল প্রিয়ব্রতকে। এবং সে ঘুম ভাঙবারও কথা ছিল না মধ্যরাতে। কিন্তু তাও আচমকা ভেঙে গেল।

তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এমনটা প্রিয়ব্রতর জীবনে বহুবারই ঘটেছে। চরম বিপদের ঠিক আগের মুহূর্তে বহুবার এমনই আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেছে। পালাবার সময়টুকু মিলে গেছে। আর কয়েক মুহূর্তবাদে ঘুম ভাঙলে পালাবার আর কোনও উপায়ই থাকত না। ভেতর থেকে কিংবা বাইরে থেকে কে যে সর্বদাই তাকে অমন শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়, সেটা প্রিয়ব্রতর কাছে চিরকালই এক অতুল রহস্য। রহস্য, রহস্য।

মহাদেবের ঘরের মাটির দেওয়ালে এবং খড়ের চালে ভেসে উঠেছে বায়োস্কোপের ছবি। গাছগাছালির ছায়া দুলছে দেওয়ালে ও চালে। দুলছে, দুলছে। প্রিয়ব্রতর শরীরের প্রতি রোমকূপে সতর্কতার ঘণ্টাধ্বনি শুরু হয়। কী করা উচিত, ভেবে ওঠার আগেই দেওয়ালের গায়ে ফের বায়োস্কোপের ছবি। এবার ছবিখানা একটু ডাইনে হেলে পড়েছে। তেরচা চোখে তাকিয়ে প্রিয়ব্রত দেখল, গাছ-গাছালি ভেদ করে পাঁচ-সেলের টর্চের তীব্র আলো আসছে ঈশেন কোণ থেকে। পরমুহূর্তে আরও একখানা উজ্জ্বল আলো ঘরের পেছন দিক থেকে ছুটে

এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝাঁকড়া মউল গাছের চুড়োয়। বুঝতে দেরি হয় না প্রিয়ব্রতর, তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। কান দুটো সজাগ হয়ে ওঠে। তড়াক করে উঠে বসে প্রিয়ব্রত খাটিয়ার ওপর। দেখে, খাটিয়ার দু'দিকে দশাসই শরীর দুটো অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে। বুঝতে বাকি থাকে না, সুবল লায়েক আর পুরন্দর লায়েক মড়ার মতো নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের অসাড় শরীরে বার দুই টোকা মারে প্রিয়ব্রত। নিঃশব্দে। একটুও নড়াচড়া করে না ওরা। প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়ায় খাটিয়া থেকে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর সুবল লায়েককে দু'হাতে তুলে ধরে নিঃশব্দে ঝাঁকাতে থাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুবল লায়েক। আধো অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে।

সুবলের কানের মধ্যে মুখ সেঁধিয়ে প্রিয়ব্রত ফিসফিস করে বলে, 'পুলিশ। আমি চলল্যম্। তুয়ারা দু'জনে উঠে খাটিয়ায় শুয়ে থাক্। লচেৎ খাটিয়া দেখে শালাদের সন্দেহ হবেক।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে থাকে সুবল লায়েক। ঝটিতি উঠে দাঁড়ায় প্রিয়ব্রত। ঠিক সেই মুহূর্তে মউল গাছের ডালপালা ভেদ করে জোরাল টর্চের আলো পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাদেব টাঙির ঘরের লেপা-পুছা দেওয়ালে। শুরু হয় ফের বায়োস্কোপের ছবি।

পেতলে বাঁধান লাঠিখানা ডানহাতে বাগিয়ে ধরে প্রিয়ব্রত দৌড় লাগায়, উল্টো দিকে। অন্ধকারের বুক চিরে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়।

জুজুড় গাঁ-টার প্রায় তিন দিকেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো ডাঙা জমিন। কেবল পশ্চিম দিকে একখানা বিশাল ধুতমা কাঁকুরে ডিহি। প্রায় পুরোটাই ন্যাড়া। বড়সড় গাছপালা নেই বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে দু'চারটে বুনো ঝোপ। ডিহিখানা আসলে জুজুড়ের জঙ্গলেরই শেষভাগ। এক কালে হয়ত বা গাছগাছালি ছিল। এখন প্রায় পুরোপুরি ন্যাড়া। মহাদেব টাঙির ঘরখানা গাঁয়ের এক প্রান্তে, ডিহির গা ঘেঁসে। প্রিয়ব্রত ডিহি বরাবর ছুটতে থাকে। ডিহিটার গড়ন খানিকটা কাছিমের পিঠের মতো। কল্মাচ মাটি আর মাকড়া পাথরের নুড়ি-কাঁকরে বোঝাই। ডিহিখানা জঙ্গলের দিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সারা বর্ষার মরসুম ঐ জঙ্গল-ধোওয়া জল বয়ে যায় ঢালু ডিহির ওপর দিয়ে। দীর্ঘকাল বইতে বইতে সারা ডিহিময় অসংখ্য সঙ্কীর্ণ গভীর নালা তৈরি হয়েছে। সাপের মতো আঁকাবাঁকা শুয়ে রয়েছে ওরা ডিহি জুড়ে। ডিহি পেরিয়ে নালাগুলো এঁকেবেঁকে মিশেছে একটি খাল মতো বড় নালার সঙ্গে। খালটা গিয়ে পড়েছে দ্বারকেশ্বরে। ঐ রকম একখানা নালার কাছাকাছি কোন গতিকে পৌঁছুতে পারলে হয়ত বা এ যাত্রা বেঁচে যাবে প্রিয়ব্রত।

ন্যাড়া ডিহি ধরে ঠিক ছুঁচোর মতো নিঃশব্দে ছুটে যায় প্রিয়ব্রত। কপাল ভাল, একখানা নালাও পেয়ে যায়। জলের মুখটিতে এসে চ্যাং মাছেরা যেমনটি করে, ঠিক তেমন করেই শুয়ে পড়ে শরীরখানা গড়িয়ে দেয় নালার মধ্যে। নালাটা ওসারে হাত-দুই। গভীরতায় হাত-তিনেক। কিন্তু তাতে অসংখ্য বাঁক-ঢ্যাঁক। বুকখানা মোটাদানার বালি আর নুড়ি-কাঁকরে বোঝাই। তার ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে এগোতে থাকে প্রিয়ব্রত। তবু ভাল, একেবারে চোখা কাঁকরের ওপর দিয়ে যেতে হচ্ছে না। জলের সঙ্গে গড়িয়ে গড়িয়ে নালার বুকের বালি-কাঁকর সামান্য মসৃণ।

সঙ্কীর্ণ নালার মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগোতে এগোতে প্রিয়ব্রত ভাবছিল সুবল আর পুরন্দর লায়েকের কথা। এমনিতে পুলিশের থেকে ওদের কোনও ভয় নেই। ওরা পার্টির কোনও কাজ প্রকাশ্যে করে না। মিটিং-মিছিলে কদাচ থাকে না। ওদের থাকতে দেওয়া হয় না। ওরা মূলত পার্টির কুরিয়ার এবং গাইড। গোপন খবরাখবর এক ঘাঁটি থেকে অন্য ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়া, আর দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বহিরাগত পার্টি-কর্মীদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়াই এদের কাজ। জনসমক্ষে এরা নিরিহ মানুষের মতো ঘোরাফেরা করে। ক্যুরিয়ার এবং গাইডকে সর্বদা সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা হয়। পুলিশের খাতায় ওদের নামও থাকে না তাই। সেই কারণে, পুলিশ ওদের ধরলেও ছেড়ে দেবে। কিন্তু বিপদ আছে অন্যত্র। ঘুমের ঘোরে সুবল লায়েক, কি শুনতে কি শুনল, যদি প্রিয়ব্রতর কথাগুলো বুঝে উঠতে না পারে? তবেই হবে আসল বিপদ। পাশে খালি খাটিয়া, আর তোরা শুয়েছিস মাটিতে! খাটিয়ায় তবে কে শুয়েছিল, বল্। আর পুলিশ এমনই এক সন্দেহপরায়ণ প্রাণী, একবার কোনও ব্যাপারে সন্দেহ হলেই আঠারোর জায়গায় ছত্রিশ ঘা। কনুই আর হাঁটুতে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বালি-কাঁকরের সঙ্গে অবিরাম ঘসা খেয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে জায়গাগুলোতে। অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল প্রিয়ব্রত। কিন্তু ঐ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। তার মগজ জুড়ে তখন অন্য কিসিমের সর্বনাশের আশঙ্কা। বৈশাখের ভাঁপ-গরমে এমন খোলা মাঠের উদোম-সুদোম হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ে রাতের শমনেরা। সরসর করে নালা বেয়ে হাঁটতে থাকে কালকেউটের দল। গা-জুড়োনো বাতাসে খাদ্য সংগ্রহে বেরোয় ওরা। অন্ধকারে তাদের শরীরে গা ছোঁয়ালেই দেবে মৃত্যুছোবল। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহে যে বেরিয়েছে আরও এক শ্রেণীর জীব। তাদের পায়ে কড়া বুট। হাতে রাইফেল। প্রিয়ব্রতর বেশি আপত্তি ঐ জীবের খাদ্য হতে। কাজেই বাঘ-বরা, সাপ-খোপ, সব কিছু ছাড়িয়ে এই মুহূর্তে প্রিয়ব্রতর মগজ জুড়ে একটাই ভাবনা। পালাতে হবে। যেমন করেই হোক। ধরা পড়া চলবে না কিছুতেই।

এখন পার্টির ঘোর সঙ্কটের কাল। বাঁধগাবার লড়াইয়ের পর থেকেই সারা জেলার পুলিশবাহিনী হিংস্র হুঁড়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে কম্যুনিস্টদের ওপর। ধরাপাকড় চলছে অবাধে। পুরো জয়পুর আর বিষ্টুপুর থানা জুড়ে শুরু হয়েছে ওদের তাণ্ডব। আন্দোলনের নেতা মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা, মানিক দত্ত, বিমল সরকারেরা প্রায় হাজার মতো বাছাবাছা কর্মীসহ আশ্রয় নিয়েছেন সেনাপতির দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। যারা তা পারেনি, তারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। দিবাকর দত্তর মতো পার্টিনেতারা সবাই আন্ডার-গ্রাউন্ডে চলে গিয়েছেন। সেখান থেকেই পরিচালনা করছেন পার্টির কাজকর্ম। ফি-রাতে পুলিশ হানা দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কিছু কর্মীকে। বাধ্য হয়ে পার্টিকে সতর্ক হতে হয়েছে অনেক। কুরিয়ার মারফত খবর চলে গেছে চতুর্দিকে। রাতে নিজের ডেরায় থাকবে না কেউ। নতুন নতুন ডেরা নাও। এক ডেরায় দু'রাতের বেশি নয়। রাতে কোথায় থাকবে, সে খবর গোপন রাখ। কুরিয়ার নিঃশব্দে ছুটেছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। কাটুল থেকে রাণীবাঁধ। সন্ধিপুর-সারেঙ্গা থেকে পাত্রসায়েব-দীঘলগ্রাম। কাজ হয়েছে তাতে। গেল মাসে পুলিশ দু'একজনের বেশি ধরতে পারে নি। অথচ পুলিশের দিক থেকে আটঘাট বাঁধবার কোনই কমতি ছিল না। গোপনীয়তারও অন্ত ছিল না। রাত বারোটায় থানা মেসেজ পেল, গেট রেডি উইথ ফোর্স। রাত দুটোয় মেসেজ এল, রেইড

ভিলেজ মাঝিপাড়া, দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড হেড কোয়ার্টার অব দ্য কম্যুনিস্ট্স্। এত গোপনীয়তা এবং তৎপরতা সত্ত্বেও পুলিশ ফিরে এল খালি হাতে। কারণ, মাঝিপাড়া গাঁয়ে ঢোকার আগেই নেতাদের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে। পুলিশ আসছে। পালাও। তবুও মাঝে মধ্যে যে দু'একজন ধরা পড়ে যাচ্ছে, সেটা নিজেদেরই দোষে। পার্টির নির্দেশ পুরোপুরি না মেনে নিজেদের ডেরায় কিংবা একই ডেরায় দু'তিন রাত থাকছে ওরা। আত্মরক্ষায় আরও অনেক ধরনের ত্রুটি থেকে যাচ্ছে অনেকের। পার্টির ওপরমহল রেগে কাঁই। বাধ্য হয়ে নির্দেশ জারি করেছে, এরপর যারা পুলিশের হাতে ধরা পড়বে, তাদের পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হবে। এ সময়ে পরীক্ষিত বাউরির মতো মানুষের প্রয়োজন ছিল পার্টির। কিন্তু সে আজ আট মাসাধিক কাল প্রিয়ব্রতকে নিয়ে এমনই বিব্রত যে অন্য কোনও কাজে তেমনভাবে মনই দিতে পারছে না। প্রিয়ব্রতকে নিয়ে সে আট মাসাধিককাল বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ডেরা থেকে অন্য ডেরায়। প্রিয়ব্রতর জন্য একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দিতে না পারলে সে পুরোপুরি অন্য দিকে নজরই দিতে পারবে না।

সহসা এক ঝলক টর্চের আলো নালার ওপর দিয়ে চলে গেল। কে যেন একখানা ধারাল সান্দা চালিয়ে দেয় প্রিয়ব্রতর পিঠের ওপর। প্রিয়ব্রত চক্ষের পলকে শুয়ে পড়ে নালার মধ্যে। এবং সেই মুহূর্তে পেছনে, মহাদেব টাণ্ডির ঘরের দিক থেকে ভেসে আসে রাইফেলের আওয়াজ। পরপর দু'বার। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে যায় নিমেষে। এক ঠাণ্ডা হিমেল স্রোত বয়ে যায় প্রিয়ব্রতর শিরদাঁড়া বরাবর। প্রিয়ব্রত তাকিয়ে দেখে, বড় নালাটা আর মাত্র গজ দশেক দূরে। এক দৌড়ে সোজা ঐ নালায় ঢুকে পড়বার কথাটা বারেকের তরে মনে হয় তার। কিন্তু বিচক্ষণ মগজ সঙ্গে সঙ্গে ধমক লাগায়। নালার কাছেপিঠে শালাদের কেউ তক্কে তক্কে থাকলে তার রাইফেলের নাগালের মধ্যে পড়ে যেতে পারে প্রিয়ব্রত । যদি সেটা নাও হয়, স্রেফ ওদের নজরে পড়ে গেলেও ফল মারাত্মক হতে পারে। প্রিয়ব্রতকে ওরা ধরতে পারবে না, কিন্তু মহাদেব টাণ্ডি, সুবল লায়েকদের বিপদ বেড়ে যেতে পারে। পুলিশ ওদের ছাড়বে না কিছুতেই। অথচ পার্টির কর্মীদের যতদিন এবং যতদূর সম্ভব পুলিশের সন্দেহের বাইরে রাখা দরকার। কাজেই প্রিয়ব্রত তার ক্ষত বিক্ষত কনুই দুটোতে ভর দিয়ে পুনরায় শুরু করে নালা মাপবার কাজ। এক হাত, দু'হাত, তিন হাত— । নালাটা ক্রমশ মোটা হয়ে মিশে যাচ্ছে বড় নালার সঙ্গে। উজানের কই মাছের মতো বুকে হেঁটে প্রিয়ব্রত ঢুকে পড়ে বড় নালার মধ্যে। বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় ঐ ভাবে। তারপর নিঃশব্দে উঠে বসে।

দু'পায়ের আঙুলগুলো থেকে রক্ত ঝরছে। হাঁটু, কনুই, বুক ছড়ে ছিঁড়ে একাকার। পেটের পেশীতেও যেন বন-বরা আঁচড়েছে। বুকখানা খেলনা বাঁদরের মতো তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। হাঁ করে ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে প্রিয়ব্রত। কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে।

বিপদটা আপাতত কেটে গেছে। বসে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে উপস্থিত দুটো ভাবনা মগজের মধ্যে কামড়াতে লেগেছে। এক, পরীক্ষিত বাউরির কোনও বিপদ হল কিনা। পুলিশ মহাদেব টাণ্ডির বাড়ির আশেপাশে লুকিয়ে থাকলে শেষ রাতে ওখানে এলেই ধরা পড়ে যেতে পারে পরীক্ষিত। এবং দুই, পুলিশ এমন নিশ্চিত সন্ধান পেল কি করে। কে অত চটজলদি খবরটা দিল পুলিশকে।

আজ ভোররাতে প্রিয়ব্রত কাটুল ছেড়েছিল। সঙ্গে ছিল রাজু লায়েক আর পচা লায়েক। দুপুর নাগাদ কুমারডুবি গাঁয়ের মাদল মহাদশুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের কথা ছিল। কিন্তু গাঁয়ে ঢুকতে গিয়েই কেমন যেন অন্যরকম মনে হল। আকাশটা যেন বেয়াড়া রকমের থমথমে। যেন ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। কাজেই, ঝটিতি ফের জঙ্গলে ঢুকে পড়া। এবং জঙ্গলের পথ ধরে পুনরায় হাঁটতে থাকা। খানিক বাদে রুইঘর গাঁয়ে এসে গাইড বদলে গিয়েছে। রাজু-পচার বদলে সঙ্গ নিয়েছে সুবল এবং পুরন্দর লায়েক। তারপর প্রায় পুরো দিনটাই কেটে গেছে জঙ্গলের শুঁড়িপথে। সন্ধ্যার আঁধারটি যখন ঝুপ করে নামল, তখনই আঁধারে গা মিশিয়ে ওরা নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে জুজুড় গাঁয়ে মহাদেব টাঙির ঘরে। তবে? যে খবর কাকে-পক্ষীতে টের পাওয়ার কথা নয়, সে খবর পুলিশ অত জলদি অত নিশ্চিতভাবে পায় কী করে? কে অত জলদি অত অব্যর্থভাবে গুহ্য খবরটা ঢেলে দিয়ে এল পুলিশের কানে? কে? কে? কে?

আচমকা যেন নালার উঁচু কাঁকুরে পাড়ের আড়ালে একটা ছায়া মূর্তিকে দেখতে পায় প্রিয়ব্রত। চকিতের তরে দেখা দিয়ে মূর্তিটা ফের মিলিয়ে যায়। ততক্ষণে প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়তে শুরু করেছে। হুঁকুর দুম, হুঁকুর দুম। সারা শরীর জুড়ে বেজে উঠেছে সতর্কতার ঘন্টা। প্রিয়ব্রত পুনরায় কাঁকুরে নালার বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নিঃশব্দে কান পাতে চারপাশে। গভীর রাতে ডিহিময় ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য নিশাচর প্রাণী। পায়ে, নখে, দাঁতে হাজার কিসিমের শব্দ তুলেছে ওরা। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে না, ঐ শব্দগুলোর মধ্যেই ওর আততায়ীর পায়ের শব্দও মিশে রয়েছে কিনা।

বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর পুনরায় সচল হয় প্রিয়ব্রত। বুকে ভর দিয়ে সরীসৃপের মতো এগোতে থাকে নালা বরাবর। আর হাত বিশেক দূরে দ্বারকেশ্বর নদী। প্রিয়ব্রত এগোতে থাকে নদীটার দিকেই।

একেবারে দ্বারকেশ্বরের মুখে গিয়ে থামে প্রিয়ব্রত। নালাটা এখানে সামান্য ভিজে। দু'ধারে উঁচু কাঁকুরে পাড়। প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়ায়। দু'ধারে সাত-আট ফুট উঁচু কাঁকুরে দেওয়াল। প্রিয়ব্রত একদিকের দেওয়ালের এবড়ো খেবড়ো পাথরে পা রাখে। বুক সমান উঁচুতে আর একখানা পাথরকে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে। তারপর পায়ের ওপর ভর দিয়ে এক ঝটকায় উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যায় নালার বালি-কাদায়। ঠিক সেই মুহূর্তে পাথুরে দেওয়ালের মাথায় দেখা দেয় সেই ছায়ামূর্তি। কালো হাতখানা প্রিয়ব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, আমার হাত ধইর‍্যে উইঠ্যে আসুন, আইজ্ঞা। প্রিয়ব্রত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছায়ামূর্তির দিকে।

পরীক্ষিত বাউরি।

পরবর্তীকালে পরীক্ষিত বাউরি বিতাং করে শুনিয়েছিল পুরো ঘটনাটা। অনন্ত মাদোড়ের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল পরীক্ষিত। আচমকা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। সামনের সরু পায়েচলা পথ মাড়িয়ে এক ডজন বুটের আওয়াজ। পাঁচসেলি টর্চের আলো। পায়ের শব্দগুলি চলেছে নির্দিষ্ট নিশানায় পূর্ব দিকে। যেখানেই ব্যথা, সেখানেই হাত পড়ে যায় প্রথমেই। পূর্ব দিকে যে মহাদেব টাঙির বাড়ি। সেখানে যে...। পলকের মধ্যে ধনুকের ছিলার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল পরীক্ষিত। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে জঙ্গল পথেপথে হাজির হয়েছিল মহাদেব টাঙির ঘরের উঠোনে। কিন্তু ততক্ষণে মউল গাছের তলায় খাটিয়া খালি। এবং চারপাশ থেকে খাঁকি কুত্তার দল ঘিরে ফেলছে মহাদেব টাঙির বাড়িখানা। এক দৌড়ে কাঁকুরে ডাঙার ওপর

চলে এসেছিল পরীক্ষিত। এবং একসময় ঐ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও টের পেয়েছিল, ডাঙার মাঝ বরাবর শুকনো নালার মধ্যে বুকে -পেটে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে একখণ্ড কালো সচল বস্তু। পরীক্ষিত বাউরির কোনই সন্দেহ ছিল না, ঐ কালোপানা বস্তুটাই প্রিয়ব্রত। নালার ধারে ধারে গুঁড়ি মেরে মেরে, ঝোপেঝাড়ে শরীরখানাকে আড়াল করে প্রিয়ব্রতকে নিঃশব্দে অনুসরণ করতে থাকে পরীক্ষিত এবং একেবারে দ্বারকেশ্বরের পাড়ে গিয়ে ওকে গভীর নালার খাত থেকে শক্ত হাতে তুলে নেয়।

কিন্তু দ্বারকেশ্বরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন অত কথা বলবার সুযোগ ছিল না পরীক্ষিত বাউরির। কারণ পেছনে, উদোম ডাঙা ভেঙে ছুটে আসছিল শমনের দল। একাধিক টর্চের আলো ছিঁড়ে খানখান করছিল রাতের গাঢ় অন্ধাকারকে। পেছন থেকে ভেসে আসছিল অনেক বুটের আওয়াজ। কাঁকুরে ডাঙার বুকে সে আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন ধাক্কা মারছিল পরীক্ষিতের বুকে। পরীক্ষিত অন্ধকারের মধ্যেও বেশ দেখতে পাচ্ছিল, সারা ডাঙা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশ। তারা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে নদীর দিকে।

এমনিতে চোত-বোশেখে দ্বারকেশ্বর নদীটা খোলস-ছাড়া সাপের মতো সর্বাঙ্গ এলিয়ে শুয়ে থাকে নিথর হয়ে। দু'ধারে বিস্তীর্ণ বালির চর। মাঝে মাঝে কাশ আর বেনা-ঘাসের ঝোপঝাড়। ঐ চরের মধ্যিখানে নদীটা এঁকেবেঁকে শুয়ে রয়েছে। প্রতিটি বাঁকের একদিক ঠেকেছে শক্ত ডাঙাজমির গায়ে। ঠিক বিপরীতে এলিয়ে শুয়ে রয়েছে দিগন্ত ছোঁয়া চওড়া বালির চর। জুজুড় গাঁয়ের কাছটিতে পৌঁছে দ্বারকেশ্বর নিয়েছে তেমনই এক ভরাট বাঁক। বাঁকের মাঝ বরাবর উচুঁ পাড়ের গা ঘেঁসে থই থই জল। সেই মুহূর্তে প্রিয়ব্রত আর পরীক্ষিত বাউরি দাঁড়িয়েছিল ঐ উচুঁ পাড়ের ওপর, দু'জনেরই পায়ের তলায় ঘুরঘুট্টি কালো জল।

নদীর জল পেরিয়ে পরীক্ষিত বাউরির দৃষ্টি ছুটে যায়। ওপারে বিস্তীর্ণ বালুচর পেরিয়ে একেবারে দিগন্তের গায়ে গিয়ে থামে। নদীর ওপারে নন্দুর গাঁ। সেই মুহূর্তে গাঁ'খানা পরীক্ষিতের চোখের সুমুখে যেন একতাল কালো কালির পোচ। মুহূর্তের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল পরীক্ষিত বাউরি। প্রিয়ব্রতকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্বারকেশ্বরের উঁচু পাড়ের ওপর। পর মুহূর্তে দু'জনেই সশব্দে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে।

দ্বারকেশ্বর সাঁতরে পার হয়ে, ওপারে আধ-মাইল বালির চর ভেঙে ওরা শেষরাতে টোকা মেরেছিল নন্দুর গাঁয়ের বঙ্কিম লাড়ুর দরজায়। অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে চমকে উঠেছিল বঙ্কিম লাড়ু। অস্ফুট গলায় বলে উঠেছিল, কোকিল, তুমি!

প্রিয়ব্রতর তখন জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না। ওর সারা শরীর জুড়ে তখন শুরু হয়েছে হাজার হাজার বৃশ্চিকের অবিরাম দংশন। সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। মাথাটা বুঝি ছিঁড়ে পড়তে চায় যন্ত্রণায়।

শরীরের যন্ত্রণাগুলির সঙ্গে শুরু হয়েছিল বুকের মধ্যে একাধিক মোচড়। কানে বাজছিল বঙ্কিম লাড়ুর কথাগুলি, কোকিল, তুমি!

ঘটনাটা প্রিয়ব্রতর জীবনে ঘটেছিল অনেক বছর আগে। ১৯৫০ সালের এপ্রিলে। আজ, এত বছর বাদেও চোখ মুদলেই কানে ভাসে বঙ্কিম লাড়ুর সেই বিস্ময় ও শঙ্কা মাখানো উক্তি, কোকিল, তুমি।

কোকিল। কোকিল। কোকিল।

২৯. একটি কোকিলের গল্প

কোকিল! কোকিল! কোকিল!

আসল নাম প্রিয়ব্রত মহাপাত্র। দাদু সুদর্শন সিংহবাবু আর দিদিমা সরযুবালা ডাকতেন, দাদুভাই। মা লাবণ্যপ্রভা আর বাবা শঙ্করপ্রসাদ ডাকতেন, খোকা। সুদর্শনের খাস চাকর সনাতন শিকারি ডাকত, খুকাবাবু। আর সিংহবাবুদের ছোট তরফ, প্রতাপলাল সিংহবাবু, তার ছেলে হরবল্লভ, এবং দেখাদেখি ঐ মহলের নায়েব, গোমস্তা মায় ঝি-চাকরেরা অবধি তাকে 'কোকিল' বলে ডাকত। অবশ্য মুখের সামনে নয়, আড়ালে। কাকের বাসায় প্রিয়ব্রত নাকি কোকিল। কোকিল যে নিজে বাসা বাঁধতে পারে না, ওরা যে কাকের বাসায় লুকিয়ে ডিম পাড়ে, কাকেরা যে বুঝতে না পেরে ওই ডিম ফোটায় এবং কোকিলের ছানারা যে গলার স্বর ফোটা অবধি কাকের বাসাতেই বড় হয়, এত কথা ছেলেবেলায় জানা ছিল না প্রিয়ব্রতর। ওরা সবাই যে সেই ছেলেবেলা থেকে ওকে 'কোকিল' বলে ডাকে সেটা প্রিয়ব্রতর কানে এসেছিল, কিন্তু কেন ডাকে সেটা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বড় হয়ে অবশ্য বুঝতে পেরেছিল তার মর্ম। যদিও চুয়ামসিনার সিংহগড়ে এক সিংহীর গর্ভে তার জন্ম, এবং বেড়ে ওঠা, যদিও সেই সিংহগড়ের তাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিল সে-ই, তবুও সে সিংহ ছিল না কোনও অর্থেই। সে প্রিয়ব্রত মহাপাত্র। চারপাশের সবাইয়ের চোখে সে চিরকাল এক কোকিল পাখি। জন্মাবধি নিজের বাড়ি দেখেনি প্রিয়ব্রত। অন্যের জমিতে শিকড় চারিয়ে বেড়ে উঠেছে। সিংহগড়। সেটা ছিল তার মায়ের বাবা সুদর্শন সিংহবাবুর গড়। এলাকার মানুষজন বহুদূর থেকে গড়ের দিকে দু'হাত তুলে প্রণাম করত। প্রিয়ব্রত তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বহুবার তেমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। সুদর্শন সিংহবাবু ছিলেন সে কালের ডাকসাইটে জমিদার। চুয়ামসিনার চারপাশের গ্রামগুলো, লোখেশোল, জয়রামপুর, শালকাঁকি, বৈঢ্যা, অর্জুনপুর, লাযেকবাঁধ, শালুকা, এমন কি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন থানায় তাঁর তালুক ছড়িয়ে ছিল। সুদর্শন সিংহবাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাদম্বরীর কোনও সন্তানাদি ছিল না। দ্বিতীয়পক্ষ হয়ে এসেছিলেন সরযুবালা। তাঁরই একমাত্র মেয়ে লাবণ্যপ্রভা, প্রিয়ব্রতর মা। প্রিয়ব্রতর বাবা শঙ্করপ্রসাদ মহাপাত্র ছিলেন মশিয়াড়ার বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত জানকীনাথ মহাপাত্রর নাতি। সুদর্শন সিংহবাবুর জমিদারীর মধ্যে ছিল মশিয়াড়া। শঙ্করপ্রসাদকে ঘর-জামাই করে এনেছিলেন সুদর্শন। সেই সূত্রে সিংহগড়েই প্রিয়ব্রতর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। সেই অর্থে তাকে কাকের বাসায় ডিম ফোটা কোকিল বলা চলে। পাখনা গজালে কোকিলেরা নিজেরাই উড়ে পালায় কাকেদের সংসার থেকে, কিংবা গলায় স্বর ফুটলে কাকেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাড়িয়ে দেয় ওদের। প্রিয়ব্রতর ক্ষেত্রে প্রথমটা ঘটেছে। সেই কারণেই বোধ করি ডানা গজাবার পর থেকে আশৈশব সে সিংহগড় ছেড়েছে এবং যেহেতু কোকিল কোথাও বাসা বাঁধে না, উড়ে বেড়াচ্ছে আজীবনকাল। সেই কারণেই তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেবার মুহূর্তে দলের নেতা মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা যখন বললেন, আমরা সবাই ছদ্মনামে কাজ করি। এ বড় কঠিন জীবন। কি নাম নিতে চাও? তিলমাত্র দ্বিধা না করে প্রিয়ব্রত বলেছিল, কোকিল। সেই থেকে দলের মধ্যে 'কোকিল' নামেই পরিচিত হয়ে রইল সে। একটা অপমানকর নামের বোঝা স্বেচ্ছায় তুলে নিল ঘাড়ে।

বয়ে বেড়াল আজীবনকাল। প্রিয়ব্রতর মানসিক অবস্থাটা সম্ভবত লাবণ্য বুঝতেন। কিন্তু কনকপ্রভাকে সেটা তিলমাত্র বোঝাতেই পারে নি প্রিয়ব্রত। ফলে, কনকপ্রভা ওকে চিরকাল ভুলই বুঝে গেল।

মশিয়াড়া ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বহু বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের বসবাস। প্রিয়ব্রতর খুব ইচ্ছে করত পূর্বপুরুষের গ্রামখানিকে একটিবারের জন্য স্বচক্ষে দেখে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই নাড়ির টানে কিংবা নিছক কৌতূহলবশত সে যতবারই মশিয়াড়ায় যেতে চেয়েছে, পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং সুদর্শন সিংহবাবু। চিরকালের জন্য যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি পিতৃকুলের মানুষজন এবং পিতৃপুরুষের ভিটের টানে দু'চারদিনের জন্য মশিয়াড়ায় পাঠাতেও তাঁর ছিল পাহাড়-প্রমাণ আপত্তি। কেবল প্রিয়ব্রতই নয়, ওর মা লাবণ্য, তিনিও জীবনে একটিবারের তরে দেখেন নি তাঁর শ্বশুরকুলের ভিটে। কাজেই নিজের শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ প্রিয়ব্রতর পিতৃকুলের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে তিনিও প্রিয়ব্রতকে তেমন কিছু বলতে পারেন নি। প্রিয়ব্রত শুনেছে, তার বাবা শঙ্কর মহাপাত্র, যাঁর নামের সঙ্গে বাড়তি আভিজাত্য যোগ করবার উদ্দেশ্যেই দাদু সুদর্শন সিংহবাবু 'প্রসাদ' যোগ করেছিলেন, তিনি সিংহগড়ে বরের সাজে আসেন নি। তাঁর বিবাহের বরানুগমন করেন নি শঙ্করপ্রসাদের কোনও আত্মীয়-স্বজন কিংবা মশিয়াড়ার কোনও মানুষ। আসেন নি তাঁর পিতৃকুলের কেউই। শঙ্করপ্রসাদের জন্য বাঁকুড়া সদর থেকে কিনে আনা হয়েছিল মহার্ঘ বরের সাজ। সেই সাজ তিনি পরেছিলেন সিংহগড়ের দোতলার একটি ঘরে। বিয়ের পর বৌ-ভাতও হয়েছিল সিংহগড়েই। বেশ ঘটা করেই হয়েছিল বৌভাত। ফুলশয্যা, চৌঠীর শ্রাদ্ধাদি, যা বরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, সবই হয়েছিল সিংহগড়ে। এমন কি, কালরাত্রিতেও নববধূ লাবণ্য আবদ্ধ ছিলেন দোতলার একটি ঘরে, আর শঙ্করপ্রসাদকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল একতলায়। বিয়ের পর, শুধু লাবণ্যই নয়, শঙ্করপ্রসাদও একদিনের তরে যেতে পারেন নি তাঁর বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেতে। দাদুর কঠিন নিষেধ ছিল সে ব্যাপারে। এমন কি, নিজের ঠাকুর্দা এবং ঠাকুরমার মৃত্যুকালেও শঙ্করপ্রসাদ সিংহগড়েই অশৌচ পালন করেছেন। শ্রাদ্ধাদিও এখানেই। এ নিয়ে ওঁর মনে কোনও ক্ষোভ কিংবা যন্ত্রণা ছিল কিনা বুঝতে পারে নি প্রিয়ব্রত, তবে ওর দাদু সুদর্শন সিংহবাবুর মনে অপরাধবোধের লেশ ছিল না। তিনি নাকি শঙ্করপ্রসাদকে তাঁর কন্যার স্বামী হিসেবে নির্বাচনের সময়েই শঙ্করের ঠাকুরদার সঙ্গে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট এবং পাকাপাকি চুক্তি করে নিয়েছিলেন। এমন কঠিন, নিদারুণ চুক্তি তাঁরা কেনই বা মেনে নিয়েছিলেন, তা বাবার মুখ থেকে প্রিয়ব্রত জানতে পারে নি কোন দিনই। জন্মভূমি এবং পিতৃকুল থেকে চির-নির্বাসিত হয়ে শঙ্করপ্রসাদের মানসিক অবস্থাখানি কেমন হয়েছিল সেটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, মায়ের মনখানা প্রিয়ব্রত পড়তে পারত সেই ছেলেবেলা থেকেই। নিজের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে আজীবনকাল ধরে এক সীমাহীন কৌতূহল ছিল লাবণ্যর মনে।

শুধু যে মা-বাবাকে একটি দিনের তরেও মসিয়াড়াতে যেতে দেন নি দাদু, তা নয়। প্রিয়ব্রতর বাবার বংশের কাউকেও ভুলেও পা ঠেকাতে দেন নি সিংহগড়ে। তাঁর জীবদ্দশায়

একদিনের তরেও ঘটেনি তেমন অঘটন। শঙ্করপ্রসাদের পিতৃকুল ছিল পণ্ডিত বংশ। বেদ, পুরাণ এবং জ্যোতিষবিদ্যায় ছিল তাঁদের বংশানুক্রমিক ব্যুৎপত্তি। তাঁরা আর্থিক দিক থেকেও স্বচ্ছল ছিলেন। কিন্তু সিংহবাবুদের মতো তাঁদের বনেদিয়ানা ছিল না, আভিজাত্য ছিল না, পালকি, পরীযান, ঝাড়-লণ্ঠন, লগদি-পেয়াদাও নয়। রাতের বেলায় নিত্য-নতুন শয্যাসঙ্গিনী ভোগ করতেন না তাঁরা। তাঁদের পুরুষদের চক্ষু অষ্টপ্রহর রক্তবর্ণ হয়ে থাকত না। তাঁদের পরিবারের মেয়েদের পরনেও মহার্ঘ পরিচ্ছদ কিংবা অঙ্গে অলঙ্কারের বোঝা ছিল নিতান্তই কম। পাছে ওরা হাজির হলে সিংহগড় এবং তার চারপাশের মানুষজন অন্তরালে হাসাহাসি করে, (প্রকাশ্যে হাসবার তখনও অবধি সাহস ছিল না কারও), সেই কারণে সুদর্শনের জারি ছিল ঐ জাতীয় কঠোর নিষেধাজ্ঞা। বিশেষ করে তাঁর ছোটভাই প্রতাপলাল, প্রতাপলালের ছেলে হরবল্লভ এবং তাদের পরিবারবর্গ, লোকলস্করের সামনে নিজেকে কোনও দিক থেকে সামান্যতম খাটো করাকে মৃত্যুর সমান জ্ঞান করতেন দাদু। কিংবা এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। দাদুর হয়ত বা আশঙ্কা ছিল, নিজের পরিবেশের সঙ্গে ক্ষীণতম যোগাযোগ থাকলে তা শঙ্করপ্রসাদের সিংহগড়ের যথাযোগ্য হয়ে ওঠার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বাবাকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা ভোলাতে চেয়েছিলেন দাদু, তাঁর মধ্যে জন্মান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন পুরোপুরি।

অথচ, সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রিয়ব্রত উপলব্ধি করত, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেওরদের নিয়ে ওর মায়ের ছিল আজীবনকাল ধরে এক সীমাহীন ঔৎসুক্য। শুধু ঔৎসুক্যই নয়, এক ধরনের ব্যথা ও বঞ্চনার বোধ তিনি নিঃশব্দে বহন করেছেন চিরকাল। দুনিয়ার সমস্ত নারী একটা বয়সে পৌঁছে বরের হাত ধরে দুরুদুরু বুকে শ্বশুরবাড়ি যায়। আজন্ম লালিত জন্মভূমি, তার চেনা অনুভূতিগুলি, তার একান্ত আপনার জনগুলিকে ছেড়ে সে পা রাখে এক অচেনা ভূমিতে। অর মধ্যে বুঝি বিয়োগবেদনা এবং প্রিয়সঙ্গমের আনন্দখানি একইসঙ্গে বাজে। একটা অপরিচয়ের রাজ্য, কিছু অপরিচিত মানুষ, স্বামীই কেবল সংযোগসূত্র সেখানে, সেই সংযোগসূত্রখানি অনুসরণ করে সে এগোতে থাকে। ধীরে ধীরে সুখ-দুঃখ, মমতা ও স্নেহহীনতার মিশেলে অচেনা সেই ভূমিখানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে। ক্রমশ দৃঢ়তর এবং অচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে সম্পর্কগুলি। কালক্রমে স্বামীর ভিটেখানি হয়ে ওঠে, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি সহ, তার জন্ম-জন্মান্তরের একান্ত আশ্রয়। ক্রমশ শিথিল, ঝাপসা হয়ে আসে জন্মভূমি, পিতৃকুলের ভিটে। যে আশ্রয় ছেড়ে একদিন অশ্রুতে কপোল ভাসিয়ে সে পাড়ি দিয়েছিল এক অচেনা জগতের উদ্দেশ্যে, সেই আশ্রয়খানিকে কেমন পরবাস মনে হয়। এইসব ব্যথাদায়ক অথচ সুখকর অনুভূতিগুলোর সঙ্গে মায়ের পরিচয় ঘটল না কোনদিনও। প্রিয়ব্রতর মনে হত, মা চিরদিনই এই সবের জন্য এক লালায়িত জীবন কাটিয়েছেন। সে ঐ সব অনুভূতির জন্য এক ধরনের কাঙালপনা লক্ষ্য করেছে মায়ের মধ্যে। চারপাশের গাঁ-গঞ্জে, বাউরী-বাগদিদের পাড়াগুলোতে বিয়ে হচ্ছে, ওদের মেয়েরা তাঁতের লাল শাড়ি পরে, নিতান্তই নিরাভরণ, চলেছে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে, নিতান্তই অনাড়ম্বর সে যাত্রা, অতি সাদা-মাটা, আটপৌরে, চুয়ামসিনার ডাঙায় পায়ে হেঁটে কিংবা গরুর গাড়িতে চলেছে বর কনে, তাদের

আগু-পিছু জনাকয় লোক, দু'একটি মাদল, সানাই, লাকড়া,—লাবণ্য সিংহগড়ের তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত হ্যাংলার মতো দেখছেন সেই দৃশ্য। পলকহীন তাঁর চোখ, সারা মুখে গাঢ় বিষাদ। বিষাদ, বিষাদ। এমন দৃশ্য প্রিয়ব্রতর অনেকবার দেখা।

শুধু বিষাদ আর হ্যাংলামোই নয়, প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছে, বাবার প্রতি মায়ের, কেবল এই একটি মাত্র কারণেই, একধরনের অপরাধবোধ ছিল। বাবাকে যে তাঁরই জন্যই আজীবনকাল বহন করতে হয়েছে মান-মর্যাদা ও শেকড়হীন এক অবাঞ্ছিত জীবন, তার জন্য মনে মনে নিজেকেই অপরাধী ভাবতেন লাবণ্য।

৩০. আত্মহননের মনস্তত্ত্ব

প্রিয়ব্রতর দাদুর কিন্তু স্পষ্টতই এ ব্যাপারে কোনও অপরাধবোধ ছিল না। তিনি ছিলেন ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষ। তিনি তখনকার পরিমাপে অনেক শিক্ষিত ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করে তিনি ফিরে এসেছিলেন সিংহগড়ে। তাও, এ তল্লাটে তাঁর অধিক শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল না তেমন কেউ। তিনি যে এ দুনিয়ার কত কিছুই জানতেন, তার খোঁজ প্রিয়ব্রত পেত পদে পদেই। কিন্তু তাঁর সমস্ত অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, সবকিছুই পরিচালিত হত তাঁর নিজস্ব দর্শনে। চারপাশের সবকিছুর সঙ্গে তাঁর দর্শন মিলছে কিনা সে ব্যাপারে তাঁর কোনই মাথাব্যথা ছিল না। তিনি সারাজীবন এমন এক তীব্র অহংবোধ এবং মদমত্ততা বহন করতেন যে তাঁর চারপাশে কাউকেই নিজের চেয়ে বড় বলে ভাবতেই পারতেন না। সবাইকে ছোট দেখতে, ছোট করে রাখাতেই তাঁর আনন্দ ছিল। তাঁর চারপাশে সবাই, সবকিছু, বামনাকার হয়ে থাকবে এবং ওই বামনলোকে তিনিই হবেন একমাত্র গ্যালিভার, এটাই ছিল তাঁর আজীবনের স্বপ্ন এবং সাধনা।

মনে পড়ে, খুব ছোট বেলায়, একবার মা এবং দাদু-দিদিমার সঙ্গে প্রিয়ব্রত সার্কাস দেখতে গিয়েছিল বাঁকুড়া শহরে। ওর বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। সার্কাসে একপাল বামন-মানুষ জোকার সেজে সমানে হাসাচ্ছিল। সার্কাস শেষ হলে পর, দাদু দেখা করলেন ম্যানেজারের সঙ্গে। সার্কাসের সব ক'টি বামন-জোকারকে তিনি কিনে নিতে চান। ম্যানেজার তো হেসেই খুন, কিছুতেই বিক্রি করলেন না বামনদের। বিফল মনোরথ হয়ে দাদু জানতে চাইলেন, বামনদের পাওয়া যাবে কোন্ মুলুকে? ওদের কোনও বাজার-টাজার আছে নাকি, যেখান থেকে তিনি কিনে আনতে পারেন বেশ কিছু বামন। ওরা সারাক্ষণ তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করবে, ওঁকে বেষ্টন করে থাকবে, এই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। সার্কাসের ম্যানেজার যখন আর একপ্রস্থ হেসে জানান, তেমন কোনও বাজার নেই। মানুষ কেনা-বেচার বাজার বহুদিন উঠে গেছে এ দেশ থেকে, তখন তার দিকে দাদু এমন অবিশ্বাস এবং রোষের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, যাতে মানুষ ভস্ম হয়ে যেত সত্যযুগ হলে। তাঁর দৃষ্টিখানাকে অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, ছোকরা, কতটুকু জান হে তুমি, এ দুনিয়ার! মানুষ কেনা-বেচা বন্ধ হয়ে গেছে! সব জান্তা!

এমন একজন আকাশস্পর্শী মানুষ, যিনি চারপাশের কাউকেই, সে প্রজা হোক, কর্মচারী হোক, স্ত্রী কিংবা আত্মজ হোক, পোকামাকড়ের অধিক কিছুই ভাবতে পারতেন না, তিনি যে প্রিয়ব্রতর বাবা কিংবা তাঁর পুরুত-পণ্ডিত পিতৃকুলের কারোরই মনের ব্যথা-বেদনাকে তিলমাত্র

মর্যাদা দেবেন না তাতে প্রিয়ব্রত অবাক হয় নি মোটেই। কেবল, তেমন মানুষ যখন একেবারে নিঃশব্দে, প্রায় সাধারণ মানুষের মতোই এক ডেলা আফিম খেয়ে আত্মহত্যাব পথ বেছে নেন তখন প্রিয়ব্রতর মনে বিস্ময়ের কোনও সীমা-পরিসীমা থাকে না। আত্মহত্যা এক ধরনেব অসহায়তার প্রকাশ। এক ধরণের পবাজয স্বীকার। নিঃশব্দে, নিঃশর্তে। কিন্তু প্রিযব্রত আজ অবধি ভেবে ভেবে হযরান হয়, কাব কাছে পরাজয় স্বীকার করে এমন প্রবল প্রতাপান্বিত মানুষটি নিঃশব্দে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন? বাস্তবিক, কার কাছে পরাজয় ঘটেছিল তাঁব, এমন লজ্জাজনক পরাজয়? সরযুবালার কাছে? শঙ্করপ্রসাদের কাছে? লাবণ্যব কিংবা প্রিযব্রতর কাছে? নাকি নিজের সঙ্গে তাঁর ছিল একান্ত গোপন কোনও আপোসহীন লড়াই?

রহস্যময় মানুষটি একরাশ বহস্যে নিজেকে মুড়ে রেখে চলে গেছেন ওপারে, শুধু মনে পড়ে, মৃত্যুর পব তাঁর শয্যার তলায় পাওয়া গিয়েছিল এমন একখানি চিঠি, যা লেখা হয়েছিল সরযুবালাকে তাঁর বাপেব বাড়ির ঠিকানায়। এবং লিখেছিল জনৈক চন্দ্রকান্ত আচার্য, বেনারস থেকে। কোনভাবে সে চিঠি হস্তগত হয়েছিল সুদর্শনেব, কিন্তু সরযুবালা সে চিঠিব খোঁজ পান নি কোনও দিনও। সুদর্শনের মৃত্যুর পর সে চিঠি যখন সরযুবালার হাতে পৌঁছুল, তাঁর লাল টকটকে মুখখানি রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। কারণ, চিঠির শেষে ঐ ব্যক্তি লিখেছিল, 'তোমার হতভাগ্য স্বামী চন্দ্রকান্ত আচার্য।'

৩১. লাবণ্যর স্বপ্নের পুরুষ

চন্দ্রকান্তর পরিচয় পরবর্তীকালে নানা সূত্রে জেনেছিল প্রিয়ব্রত। পূর্ণাঙ্গ নয় সে পবিচয়, খাপছাড়া, টুকরো-টুকরো, অগাধ রহস্যে মোড়া। প্রিয়ব্রতর দিদিমা সরযুবালা ছিলেন সুদর্শনের দ্বিতীয় পক্ষ। রাধানগরের সুরেশ চক্রবর্তীর মেয়ে ছিলেন তিনি। ঐ গ্রামেরই চন্দ্রকান্ত আচার্য নামে এক সুঠাম, স্বাস্থ্যবান, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত যুবককে তিনি আশৈশব ভালবেসেছিলেন। সকলের অজান্তে চন্দ্রকান্ত ওঁকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে সুদর্শনের নজর পড়ে গিয়েছে সরযুবালার ওপর। বিয়ের রাতেই সরযুবালাকে নির্মমভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সুদর্শন। এবং চন্দ্রকান্তকে চাতুরির দ্বারা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কাশীতে। কাশী থেকেই চন্দ্রকান্ত একখানা চিঠি লিখেছিলেন সরযুকে। তারপর আর তাঁর কোনও খোঁজই পাওয়া যায় নি। বহুবছর বাদে নাকি চন্দ্রকান্ত ফিরে এসেছিলেন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সুদর্শনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে এবং এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির রাতে সুদর্শনের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। যদিও তাঁর বন্দুকের দু'দুটো গুলিও সুদর্শনকে তাঁর জীবনের শেষ পাঁচটি বছর পঙ্গু অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করে।

এ সব প্রিয়ব্রতর শোনা কথা; কিংবদন্তিতুল্য। এসব কথা কতখানি সত্যি তা নির্ণয় করা প্রিয়ব্রতর পক্ষে দুঃসাধ্য। চন্দ্রকান্ত তার কাছে চিরকালই এক রহস্যময় পুরুষ।

সরযুর নামের সঙ্গে যেমন একজন রহস্যময় মানুষের নাম যুক্ত হয়ে রয়েছে, চন্দ্রকান্ত আচার্য, ঠিক তেমনই লাবণ্যর সঙ্গেও মিশে রয়েছেন আর এক রহস্যময় মানুষ। লাবণ্যর মাস্টারমশাই।

প্রিয়ব্রতর সেই ছেলেবেলায় মা লাবণ্য মাঝে মাঝেই একজন মাস্টার মশাইয়ের প্রসঙ্গ তুলতেন। খুব এলোমেলো ধোঁয়াশায় ভরা সে কাহিনী। তিনি নাকি প্রিয়ব্রতর মায়ের

মাস্টারমশাই ছিলেন। সে যুগে সিংহবাবুদের মত অভিজাত বাড়ির মেয়েরা পড়াশুনো করবার জন্য ঘরের বাইরে পা দিতে পারত না। বিশেষ করে সিংহবাবুদের মত রক্ষণশীল পরিবারে তো নয়ই। প্রিয়ব্রতর দাদু, সুদর্শন সিংহবাবু, লাবণ্যকে পড়ানোর জন্য বহাল করেছিলেন ঐ মাস্টারমশাইকে। তাঁর সম্পর্কে প্রিয়ব্রতর সুমুখে কোনদিনই তেমন কিছুই ভেঙে বলেন নি মা। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মোড়কে পুরো ব্যাপারটাকে ভরে রাখতে বড়ই ভালবাসতেন তিনি। পরে, বড় হয়েও, ঐ মাস্টারমশাই সম্পর্কে অনেকদিন অবধি তেমন কিছুই জানত না প্রিয়ব্রত। শুধু এটুকুই বুকের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল, ঐ রকম একজন মাস্টার থাকলে, প্রিয়ব্রতর মায়ের ভাষায়, যে কোনও বাচ্চার ভবিষ্যত নিয়ে আর ভাবনার কিছুই থাকে না। মনে পড়ে, প্রিয়ব্রতর সেই শৈশবে, মা বারবার একটা কথাই বলতেন একান্তে, জানিস খোকা, উ থাকলে তুয়ার কোনও চিন্তাই থাকতো নাই। পরে, প্রিয়ব্রতর মেয়ে কুন্তীর ক্ষেত্রেও মা একই কথা বলতেন, ঐ মাস্টারমশাই থাকলে নাকি আর দেখতে হত না।

ঐ মাস্টারমশাই লাবণ্যকে কী পড়াতেন এবং কতদিন পড়িয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয় নি প্রিয়ব্রতর। কোনদিনই সে কথা পরিষ্কার করে খুলে বলেন নি লাবণ্য। ওঁর প্রসঙ্গ উঠলেই কেমন এড়িয়ে যেতে চাইতেন তিনি। কিন্তু ঐ সময়টায় ওঁর মুখমণ্ডলে প্রিয়ব্রত এমন এক উজ্জ্বল আভা দেখেছে, যা মেয়েদের মুখে লেপটে থাকে তাদের অত্যধিক সুখের মুহূর্তে।

বিভিন্ন সময়ে মায়ের মুখের টুকরো টুকরো কথা থেকে যা ফুটে উঠেছে তা অন্তত আর যাই হোক, ঐ মাস্টারমশায়ের কোনও পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। তবে সিংহগড়ের অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন যে সব তথ্য পেয়েছে প্রিয়ব্রত তা একসঙ্গে যোগ করলে দাঁড়ায় এইটুকু যে, ঐ মাস্টারমশাই ছিলেন এক রূপবান যুবক, স্বাস্থ্যে বীর্যে ভরপুর, তাঁর সারা মুখে ছিল সূর্যের দীপ্তি, আর পুরো জীবনখানা ছিল রহস্যে ভরা। তিনি এক প্রলয়ের রাতে একেবারে ধূমকেতুর মতো হাজির হয়েছিলেন সিংহগড়ে এবং সুদর্শন সিংহবাবু কোন্ এক রহস্যময় কারণে তাঁকে মাস কয়েক আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর গড়ে। লাবণ্যকে কখনোই কেউ পড়তে দেখে নি তাঁর কাছে, তবুও কেমন করে যেন তিনি হয়ে উঠেছিলেন লাবণ্যর মাস্টারমশাই। এবং সেই কথাটি লাবণ্য আজও, এই এত বছর বাদে, স্মরণ করেন চোখে মুখে উজ্জ্বল আভা ছড়িয়ে। প্রিয়ব্রত শুনেছে, তিনি নাকি এক স্বদেশী-বিপ্লবী ছিলেন। বিত্তশালী পরিবারে একমাত্র সন্তান হয়েও তিনি আজীবনকাল ছুটে বেড়িয়েছেন দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে। প্রিযব্রত এখনও মনে মনে ঐ রহস্যময় পুরুষকে খোঁজে।

৩২. পুণ্যতোয়া আগুনের স্রোত

সিংহগড়ের অন্দরমহলের একতলায়, এক্কেবারে শেষের ঘরখানায় প্রিয়ব্রত শুয়ে রয়েছে নিভৃতে।

সদর মহলের কোনও একটা ঘরেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু কনকপ্রভার প্রবল আপত্তিতে তা হয় নি। তা বলে, কনকপ্রভা যা চেয়েছিল, দোতলায় গিয়েও থাকে নি প্রিয়ব্রত। মাঝামাঝি এই ব্যবস্থা, অন্দরমহলের একতলার এক্কেবারে দক্ষিণের ঘরখানি। লাবণ্য বেঁচে

থাকলে দেওয়ালে মাথা খুঁড়তেন। নিজের পেটের ছেলেকে তিনি প্রাণ থাকতে এমন একঘরে করতে পারতেন না। কিন্তু কনকপ্রভা তো লাবণ্য নয়। সে অনেক বাস্তব। প্রিয়ব্রতর বর্তমান অবস্থায় তার সঙ্গে একত্রে থাকবার কথাটা ভাবতেও পারে না সে। নিজের কথা যদি নাও ভাবে, একমাত্র আত্মজার কথা তাকে ভাবতেই হয়। সন্তানের ব্যাপারে দুনিয়ার সব প্রাণীরই মায়েরা বুঝি এমনই কঠোর, স্বার্থপর। কনকপ্রভার এমন মনোভাবকে মনে মনে সমর্থন করে প্রিয়ব্রত। তার শরীরের (এবং মনের) দুষ্ট ক্ষতগুলি কোনওভাবে কনকপ্রভা ও কুন্তীর মধ্যে সংক্রামিত হয়, এমনটা সে কোনমতেই চায় না। সেই কারণেই সে সদরমহলেই থাকতে চেয়েছিল, কনকপ্রভা রাজি হয় নি।

কনকপ্রভাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে চাওয়ার মধ্যে কোনও অসূয়া ছিল না। এমন নয় যে কনকপ্রভাকে ঘৃণা করে প্রিয়ব্রত। আসলে শরীরের ছোঁয়াচে রোগের চেয়ে মনের অবিশ্রাম দহনটাকে নিয়েই তার আশঙ্কা ছিল বেশি। যে বুকে জন্মাবধি নিরন্তর দহন চলেছে, সেই বুকখানি প্রিয়জনের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়াতে প্রবল সঙ্কোচ ছিল তার। জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গে স্থায়ী বসবাস কি কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব?

বুকের মধ্যে এক নিরন্তর দহন। প্রিয়ব্রতর।

সেই ছেলেবেলায় যে এক অদৃশ্য আগুনে জ্বলতে শুরু করেছিল, সেই আগুনটি বুকের মধ্যে নিভল না একটি দিনের তরে। বাবা, শঙ্করপ্রসাদকে ওর চিরকালই মনে হয়েছে একটুকরো নিভন্ত কাঠ-কয়লার মতো ঠাণ্ডা ও মলিন। দাদু, সুদর্শন সিংহবাবু, অষ্টপ্রহর তাঁর ওপর নিদারুণ জুলুম চালাতেন। নাগালের মধ্যে পেলে তাঁর গালে ঠাস ঠাস চড় কষাতেন। বিনা বাক্যব্যয়ে সবকিছু হজম করতেন শঙ্করপ্রসাদ। নিঃশব্দে সরে যেতেন দাদুর সামনে থেকে। কিন্তু তাঁকে দেখতে দেখতে প্রিয়ব্রতর বুকের অঙ্গারে ফু লেগেছে বারবার। সেই আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সিংহগড়-বিরোধী রাজদ্রোহে সামিল হয়েছে সে। প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছিল তার বাপ-ঠাকুর্দা পিতৃকুলের প্রতি সিংহগড়ের যাবতীয় নির্যাতনের উপযুক্ত জবাব দেওয়া যাবে এভাবেই, শঙ্করপ্রসাদ তাঁর জীবদ্দশায় একদিনের জন্যও যা পারেন নি। পরে, অনেক পরে, প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছে, শঙ্করপ্রসাদও প্রতিশোধ নিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর তরিকা ছিল স্বতন্ত্র। খালি চোখে সহসা তা বোঝা যায় না। প্রিয়ব্রতও অনেকদিন যাবৎ সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। হয়ত কোনদিনও পারত না, যদি দীপমালা না অমন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাত। দীপমালা। এই ছোট জীবনে প্রিয়ব্রতর অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছে সে। খুলে দিয়েছে ওর চোখের সুমুখ থেকে অনেক ভ্রান্ত ধারণার ঠুলি। শেষ ঠুলিটি যেদিন সরাল, উনিশ শো ছাপান্ন সালের এক বর্ষামুখর রাতে, সেটা ছিল প্রিয়ব্রতর জীবনে এক প্রবল রক্তক্ষরণের রাত।

স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে একেবারে আছড়ে দিয়েছিল প্রিয়ব্রত। প্রাথমিক পর্যায়ে দীপমালাও ছিল পাশে পাশে। একদিন সে অকস্মাৎ হারিয়ে গেল। কিন্তু তখন কে পাশে রয়েছে, কে নেই, দেখবার মতো ফুরসত নেই প্রিয়ব্রতর। সে তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের এক উন্মত্ত কর্মী। তারপর এল উনিশশো চল্লিশের মহাষ্টমীর সেই ঘুরঘুট্টি রাত। প্রিয়ব্রত ধরা পড়ল।

ক'দিন থেকে কেমন যেন মনে হচ্ছিল প্রিয়ব্রতব, আজ হোক, কাল হোক, ধরা সে পড়বেই। তখন সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তাথৈ-তাথৈ প্রলয়-নাচন। থানা আক্রমণ, ডাকগাড়ি লুট, রেললাইন তুলে ফেলা, কাতারে কাতারে মিছিল, যত্রতত্র সুবিধা মতো জাতীয় পতাকা উত্তোলন...। চলছিল শহরের রাস্তায় রাস্তায় সত্যাগ্রহীদের বিদেশী কাপড় পোড়ানোর ধুম। তখনই একদিন বাঁকুড়ায় থাকতেই খবরটা পেয়েছিল প্রিয়ব্রত। পুলিশ ওকে আতিপাঁতি খুঁজছে। দীপমালাই এক গোপান সূত্র থেকে খবরটা পেয়ে এক বিশ্বস্ত কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল তা। খবরটার সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে এবং বাড়তি কিছু তথ্য পাওয়ার আশায় কিংবা বলা যায় এমন চরম সঙ্কটের মুহূর্তে দীপমালার সান্নিধ্যে খানিক বাড়তি সাহস ও বল পাওয়ার উদ্দেশ্যেই একদিন গাঢ় অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে প্রিয়ব্রত গিয়েছিল দীপমালার মামার বাড়িতে। কিন্তু ওখানে আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। দীপমালা সেখানে নেই। অন্তত সাতদিন আগে কাউকে কিছু না বলেই সে কোথায় যে চলে গেছে, কেউ জানে না। প্রিয়ব্রত ঝটিতি যোগাযোগ করল শ্যামাপদদার সঙ্গে। তিনিই যুগান্তর দলের স্থানীয় নেতা। কিন্তু শ্যামাপদদার তখন নিঃশ্বাস ফেলবারও অবসর নেই। গ্রেপ্তারির খাঁড়া ঝুলছে ওঁর ওপরও। আত্মগোপন করেছে যুগান্তর দলের প্রায় সবাই। গোপন ডেরা থেকে সুবিধা মতো চালাচ্ছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ, বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ। দীপমালার সম্পর্কে কিছুই স্পষ্ট করে বললেন না শ্যামাপদদা। কিন্তু প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছিল, তিনি সবই জানেন, কিন্তু বলতে চান না। সে ছিল এক প্রবল মন্ত্রগুপ্তির দিন। কাজেই প্রিয়ব্রতও আর জানতে চায় নি দীপমালার সন্ধান। সেদিন কোন কারণে খুব ব্যস্ত ছিলেন শ্যামাপদদা। তার মধ্যেও খুব দৃঢ় গলায়, নির্দেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, তুই এখন খুব সাবধানে তোর গ্রামে ফিরে যা। লুকিয়ে থাক্ ক'দিন। পরবর্তী নির্দেশ যথাসময়ে পাবি। কিন্তু গ্রামের পথ ধরলেও শেষ অবধি চুয়ামসিনায় আর ঢোকে নি প্রিয়ব্রত। যদিও চুয়ামসিনার মতো প্রত্যন্ত গ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ নেই বললেই চলে, বিশেষ করে সিংহবাবুরা চিরকালই এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বাইরে, বরং বলা যায়, ওরা জেলার রাজভক্তদের মধ্যে প্রথম সারিতেই পড়ে, তবুও প্রিয়ব্রতর বারবার মনে হয়েছিল, ওখানে গেলে সে ধরা পড়ে যাবেই। অনেক ভেবেচিন্তে শালকাঁকির পরীক্ষিত বাউরির ঝুপড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল সে।

যেদিন শেষরাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল পরীক্ষিত বাউরির ঝুপড়িখানা, সে রাতে প্রিয়ব্রত জেগেই ছিল। কিছুক্ষণ আগে সুদর্শন সিংহবাবু এবং তাঁর ভাইপো হরবল্লভ সারা বাউরিপাড়া জুড়ে চাবুক আছড়ে হল্লা তুলেছিল। মানুষগুলোর অপরাধ, তারা বিনা নিমন্ত্রণে সিংহগড়ে মহাষ্টমীর ভোজ খেতে যেতে রাজি হয় নি। ছোটলোকদের এমন সিদ্ধান্তে অপমানিত সিংহগড় চাবুক আছড়ে, তেলমাখান লাঠির ডগায় সমগ্র বাউরিপাড়াকে মুক্তকচ্ছ হয়ে সিংহগড়ের দিকে দৌড়ুতে বাধ্য করেছিল।

সে রাতে সুদর্শন আর হরবল্লভ যখন শালকাঁকির ডাঙায় চাবুক আছড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রিয়ব্রত ঘুমোচ্ছিল পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়িতে। হৈ-হল্লায় আচমকা ঘুমটা ভেঙে যায়। প্রিয়ব্রত লক্ষ করে পরীক্ষিত বাউরি ঘরের মধ্যে নেই। কী ঘটছে

বাইরে, দেখবার জন্য, ঝোপড়ির আগড়খানা খুলে মুখখানা সবে বের করেছে, অকস্মাৎ সুদর্শন সিংহবাবুর হাতের টর্চ সরাসরি আলো ফেলল ওর মুখে। বিপদের মুখে কচ্ছপেরা যেমনটি করে, চকিতে নিজের মুখখানা ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল প্রিয়ব্রত। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

সুদর্শন সিংহবাবু অবশ্য আব এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি সেখানে। 'এ ঝুপড়িতে কেউ নাই। চল্, উদিগে চল্' বলতে বলতে তিনি লগদিদের নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যদিকে। প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছিল, ঐ চকিত আলোয় একমাত্র সুদর্শন ছাড়া আর কেউই দেখতে পায়নি ওকে। আর, সুদর্শন সিংহবাবু হাজার স্বদেশী-বিরোধী হলেও নিজের আদরের নাতিকে যে কোন মতেই ধরিয়ে দেবেন না এ ব্যাপারে এক প্রকার নিশ্চিত ছিল প্রিয়ব্রত। সেই কারণেই, সে রাতে, হল্লা থেমে যাওয়ার পর পরীক্ষিতের ঝোপড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথাটা মনে হয়নি ওর। কিন্তু যা আশঙ্কা করে নি, সে রাতে তাই ঘটেছিল। শেষ রাতে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছিল পরীক্ষিত বাউরির ঝুপড়ি। বিষ্টুপুর থানাব বড়বাবু সদলবলে সে রাতে এসেছিলেন সুদর্শনের গড়ে নেমন্তন্ন খেতে আরপ্রতাপলালের গড়ে যাত্রা শুনতে। নিছক ফুর্তি করতে এসে যে আচমকা এতবড় দাঁওখানা মারা যাবে সেটা বোধকরি উনিও ভাবেন নি। ঝুপড়ির ভেতর থেকে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বাইরে চোখ চাবিয়েছিল প্রিয়ব্রত। এবং পুলিশ বাহিনীর থেকে সামান্য তফাতে একটা চাকোল্‌তা গাছেব তলায় হববল্লভকে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। বাকি অঙ্কখানা মিলিয়ে নিতে কোনই অসুবিধা হয নি ওর। মাঝরাতে, তুমুল হল্লার সময়ে, সুদর্শনের টর্চের ঐ চকিত আলোয় প্রিয়ব্রতকে সুদর্শন ছাড়াও দেখে ফেলেছিল আরও দু'জন। হরবল্লভ আর রুদ্র শিকাবি। রুদ্র শিকারি পরবর্তীকালে স্বীকার করেছিল সেটা, কিন্তু কসম খেয়ে বলেছিল, সে প্রাণ থাকতেও ওকথা ফাঁস করত না কাকপক্ষীর কাছেও। কিন্তু হরবল্লভ, সুদর্শন সিংহবাবুর ভাই প্রতাপলালের বড় ছেলে, এমন সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারে তিলমাত্র গড়িমসি করে নি।

দুটো ধন্দ নিয়ে প্রিয়ব্রত চলে গেল ইংরাজের জেলে। এক, দীপমালা অকস্মাৎ কোথায় হারিয়ে গেল? কেন? কি করেই বা তা সত্ত্বেও প্রিয়ব্রতকে সতর্ক করে খবর পাঠাতে পারল? দুই, দীপমালা যার মারফৎ খবরটা পাঠিয়েছিল সেই কুরিয়ারটি আর কেউ নয়, শালকাঁকির পরীক্ষিত বাউরি। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে না, এমন উথালপাথাল সময়ে পরীক্ষিত বাউরি কেনই বা গিয়েছিল বাঁকুড়া শহরে? দীপমালার সঙ্গেই বা তার কোন সূত্রে আলাপ হল? সত্যি, প্রিয়ব্রতর কাছে মানুষটা আজীবন এক জীবন্ত প্রহেলিকা।

পরীক্ষিত বাউরির সঙ্গে প্রিয়ব্রতর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল একটু একটু করে। পুরোপুরি চিনে উঠতে সময় লেগেছিল আরও ঢের বেশি। এবং পুরোপুরি চিনে ওঠার পরও প্রিয়ব্রতর ঐ একই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে, মানুষটি এক জীবন্ত প্রহেলিকা। প্রিয়ব্রতর আজ আর স্বীকার করতে তিলমাত্র কুণ্ঠা নেই যে, ওর দেখা আশ্চর্য চরিত্রগুলির মধ্যে পরীক্ষিত বাউরি অন্যতম।

পেটে এক অক্ষর বিদ্যে ছিল না তার, কিন্তু এমন এমন কথা বলত, যেন মহাপণ্ডিতকেও হার মানায়। কোত্থেকে সে শিখেছিল এসব কথা, কে জানে। শুধোলে খুব সরল

হাসি উপচে পড়ত তার দু'ঠোঁট বেয়ে। টই-টম্বুর মৌচাক থেকে যেমন ঝরে পড়ে বাড়তি মধু। কোনও অহমিকা নেই, আত্মশ্লাঘাও নয়, বড়ই সরল লাজুক হাসি। কোনও বিনীত অহঙ্কার নয় সেটা। নম্র-বিনীত অহংকারকে প্রিয়ব্রত চেনে।

রামায়ণ-মহাভারতের অধিকাংশ কাহিনী পরীক্ষিতের ঠোঁটের ডগায় থাকত। বর্ণনায় একটু আধটু স্থূলতা কিংবা কোন কোনও ক্ষেত্রে সামান্য অসংলগ্নতা থাকলেও মূল কাহিনী থেকে বিচ্যুতি বলা যেত না তাকে। অথচ সে রামায়ণ-মহাভারত কস্মিনকালেও পড়েনি। এসব নিয়ে কিছু শুধোলেই সে কেবলই হাসত। বলত, বই ত আইজ্ঞা সেদিনের বিত্তান্ত। মাইন্‌ষের গিয়ান তারও অনেক আগেকার। কেতাবী জ্ঞানের অসারতা এবং অর্বাচীনতাকে সে এমনি-ধারা একটি কি দুটি বাক্যেই প্রকাশ করত। খুব ছেলেবেলা থেকেই খুব ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছে পরীক্ষিত বাউরি। খুব এলোমেলো ভবঘুরে ছিল তার জীবনপঞ্জী। রামায়ণগান, কথকতা, যাত্রা-অপেরা, কবিগান,—চারপাশের এমনতরো সব আসরেই তার উপস্থিতি ছিল বাঁধা। এমনিভাবেই, মৌমাছি যেমন তিল তিল মধু সঞ্চয় করে হরেক এলাকার হরেক ফুলের থেকে, তেমনি করেই সে তিল তিল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছিল এই পৃথিবী এবং তার মানুষকে নিয়ে তাবৎ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান। অথচ ঠিক জ্ঞানের রূপ ধরে নয়, কখনো বা বিশ্বাস কিংবা সংস্কারের রূপ ধরে বেরিয়ে আসে ওগুলো। আসলে হজম করে ফেলেছে পরীক্ষিত বাউরি, তাবৎ আহরিত জ্ঞান মিশিয়ে ফেলেছে রক্ত, মেদ, মজ্জার সঙ্গে। তাই সে যখন কোনও জ্ঞানের কথা বলে, তখন প্রথম শ্রবণে মনে হয় অতি সাধারণ কথা এটা, কিন্তু পর মুহূর্তে চমকে উঠতে হয়। আরে, এমন গভীর জ্ঞানের কথা কোথায় শিখল লোকটা। কে শেখাল।

—দুনিয়ায় গুরুর অভাব নাকি, বাবুমশয়? দুনিয়াময় শয়ে শয়ে টোল, দেখত্যে লারেন? আকাশ এক টোল, বাতাস এক টোল, মাটি-ধরিত্রী-বসুমত্তা এক টোল, গাছ-গাছাল, লদী-খুলিয়া, জীবজন্তু, পাইখ-পাখাল—সবই এক একটি চালু টোল।

বাউরি জাতের উৎপত্তি, বিবর্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়েও তার ছিল প্রগাঢ় জ্ঞান। পরীক্ষিত বাউরিই প্রিয়ব্রতকে শুনিয়েছিল এ জেলার চুয়াড়-বিদ্রোহ, পাইক-বিদ্রোহ, সাঁতাল বিদ্রোহের কথা। কী নিপুণ সে বর্ণনা, কত অনুপুঙ্খ তাতে, আর কী সঠিক আর আন্তরিক সে বিশ্লেষণ। পরীক্ষিতই প্রিয়ব্রতর মগজে প্রথম ঢুকিয়েছিল গ্রামবাংলার উৎপাদন-ব্যবস্থা ও শোষণের মূল সূত্রগুলি। মানুষ ও ভূমির পারস্পরিক ও পারম্পরিক সম্পর্ক। কোনও জটিল বাক্যবন্ধ দিয়ে নয়, বুঝিয়েছিল তার নিজের ভাষায়, উপমায়, একেবারেই নিজের মতো করে। বলত, জমিনের লড়াই, আইজ্ঞা, দুনিয়ার প্রাচীন লড়াই। মাহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের লড়াইটাও তো উই জমিনের লড়াই। বলত, ভূমিহীন লড়ছে জোতদারের সাথে, জোতদার গাঁতিদারের সাথে, গাঁতিদার তালুকদারের সাথে, তালুকদার জমিদারের সাথে, জমিদার রাজার সাথে...। কিন্তু ভূমিহীন, আঁধিয়ারদের জব্দ কইর্‌বার বেলায় জোতদার থিক্যে রাজা সব্বলেই এককাট্টা। এককুলি ধানে আড়াই পাই, আর এক কুলি কলাইতে দশসের সুদ লিবার ব্যালায় সব্বলেই এক।

স্বদেশী আন্দোলনে, অথবা পরবর্তীকালে তেভাগার লড়াইতে, রাঢ়ভূমির অরণ্য, জনপদ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার দিনগুলিতেও পরীক্ষিত বাউরিকে চিরকাল দেখা গেছে একেবারেই অন্যতব ভূমিকায়। সে সব কিছুতেই রয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনও কিছুতেই নেই। আন্দোলনের স্বার্থে সবচেয়ে ঝুঁকি নিচ্ছে ও-ই, সবচেয়ে জটিল কাজটি সবচেয়ে দায়িত্বের সঙ্গে পালন করছে। কিন্তু একেবারে নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আবার কাজটি শেষ করেই সে নিরাসক্তভাবে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে দৃশ্যপট থেকে, নির্মমভাবে মুছে দিচ্ছে নিজের অস্তিত্ব ও উপস্থিতির যাবতীয় নিশান। কেবল জীবনে একটিমাত্র ঘটনায় সে চলে এসেছিল প্রেক্ষাপটে, সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে।

সন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে সারা বাংলায় নেমে এসেছিল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। গ্রামে-শহরে নিরন্ন মানুষ 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' রোল তুলেছিল। পোকামাকড়ের মতো মরছিল প্রতিদিন। ভয়াল যুদ্ধ চলছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। এদেশের যাবতীয় খাদ্য-বস্ত্র চলে যাচ্ছিল যুদ্ধরত সৈনিকদের কাছে। মানুষ খাদ্যবিহনে মরছিল। সেই ভয়ঙ্কর সংকটকালে পরীক্ষিত বাউরি এলাকার তাবৎ উপোসী মানুষকে জড়ো করে নিয়ে সিংহগড়ে এসেছিল খাদ্যশস্যের আশায়। বাবুদের কাছে এক অভিনব প্রস্তাব রেখেছিল সে। চুয়ামসিনা, রাধানগর, অযোধ্যা, লোখেশোল... চারপাশের গাঁয়ের জমিনদার, জোতদার, গাঁতিদাররা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান দিক নিরন্ন প্রজাদের। সেই ধানে লঙ্গরখানা চালাবে ওরা, আধপেটা ফেনাভাত খেয়ে চালিয়ে নেবে একটা বছর। সামনের বছর সুদিন এলে খাটাবাটা করে যেভাবেই হোক শুধে দেবে বাবুদের কর্জ। বাবুদের সুমুখে হাঁটু গেড়ে দু'হাত জড়ো করে বলেছিল পরীক্ষিত বাউরি, সেই আদিকাল থিক্যে আপনাদিগ্‌কে অন্ন জুগাচ্ছি, আইজ্ঞা, বেগার বলুন, ভাতুয়া বলুন, মাইন্দার বলুন, আমরাই যুগ যুগ ধ্বরে আপনাদিগের অন্নদাতা। বিনিময়ে শুধু একটা বচ্ছর আমরা আধাপেট অন্ন মাগছি আপনাদিগের পাশ।

—তুয়ারা আমাদের অন্নদাতা? বাবুরা তো হেসেই খুন।

—হ্যাঁ, অন্নদাতাই। সিট্যা হাড়ে হাড়ে মালুম পাবেন, যদি সত্যি সত্যিই আমরা এ বচ্ছর সবংশে মর্যে যাই। যদি সত্যি সত্যিই একজনও না বেঁচ্যে থাকি। আইছে বছর ফের সুবর্ষণ হবেক, মাটি অধীর হয়্যে থাকবেক, ঋতুমতী হয়্যে ধরিত্রী নিঃশব্দে কাঁদবেক। আপনারা কিছুই করত্যে পারবেন নাই। শুধু অক্ষম মরদের পারা খাড়াই খাড়াই দেখবেন তা। দেখবেন, আর হা-হুতাশ করবেন, কিন্তু মাটির বুকে হালের বোঁটা শক্ত হাতে চেপে ধরা, সে আপনাদিগের কম্ম লয়।

সিংহবাবুরা একদানাও ধান দেন নি পরীক্ষিতদের। দেয়নি চারপাশের গাঁয়ের কোনও সম্পন্ন মানুষই। তারা পাগলের মতো মজুত করেছে ধান। প্রাণের সুখে মহাজনী আর তেজারতি চালিয়ে অল্প দিনেই ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে। আর,এলাকার বাউরি, বাগদি, শিকারি, লোহার, মাদোড়—ঝাড়ে-বংশে নিকেশ হয়ে গেছে হাজারে হাজারে। দুর্ভিক্ষের সময়ে জমিদার-জোতদারদের মহাজনীর এক ডগোমগো ছবি এঁকেছিল পরীক্ষিত। প্রিয়ব্রত শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল। এমনিতে বাঁকুড়ার দীর্ঘকালের 'বাড়ি প্রথা'য় এক গুলি অর্থাৎ

কুড়িসের ধানে আড়াই পাই অর্থাৎ আড়াই সের ধান সুদ দিতে হত। কলাইয়ের ক্ষেত্রে সেটা ছিল একমনে কুড়ি সের সুদ। দুর্ভিক্ষের সময় সেই সুদ বেড়ে দ্বিগুণ হল। তাও আবার কেবল সম্পন্ন মধ্যবিত্ত চাষীদের ক্ষেত্রে। গরীব-গুরবোদের বেলায় বাড়িপ্রথা অচল হয়ে গিয়েছিল। চাইলেই বলত, চাষীরা মইর্‌লে উয়াদ্যার জমিনগুলান থাইক্‌বেক। তুয়ারা মইর্‌লে ত আমার সব দাদন জলে। গরীবরা ধান পেত গরু-ছাগল এবং গেরস্থালি তেজসপত্রের বিনিময়ে। তার হিসেবটা ছিল এই রকম। প্রথমে পশু কিংবা সামগ্রীটির দাম স্থির হত। বলাই বাহুল্য, ন্যায্য দামের সিকি কিংবা অর্ধেক দামের ওপরে কিছুতেই উঠতেন না বাবুরা। এবার, একটাকা সের ধানের দাম ধরলে ঐ পশু কিংবা সামগ্রীর জন্য যতটা ধান প্রাপ্য হয়, তার থেকে কয়ালের মজুরি বাবদ প্রতি সেরে আধ পোয়া ধান কেটে নিয়ে বাকিটা পেত ঐ গরীব মানুষটি। অথচ সে সময়ে ধানের বাজার দর ছিল বড় জোর আট আনা সের।

দুর্ভিক্ষের সেই করাল রূপ প্রিয়ব্রত প্রত্যক্ষ করেনি সেই অর্থে। সে তখন পালা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইংরাজের জেলে। শীতে বরফজমা পাহাড়ে, গ্রীষ্মে বিহার মুলুকের কোনও উত্তপ্ত অগ্নিবর্ষী শেলের মধ্যে তার দিন কাটছে, রাত কাটছে, মাস বছর কাটছে। এইভাবে ঋতুচক্রে পাক দিতে দিতে পরিক্রমা চলছে প্রিয়ব্রতর। বুকের মধ্যে ক্ষয় রোগ, বুঝি বাসা বেঁধেছিল তখনই, সময় বুঝে ফনা তুলতে সে দ্বিধা করে নি।

জেল থেকে প্রিয়ব্রত ছাড়া পেয়েছিল উনিশ শো পঁয়তাল্লিশে। ততদিনে দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ। জেল গেটে উপস্থিত ছিল দু'জন। পরীক্ষিত বাউরি আর দীপমালা। দু'জনেই ওকে নিতে এসেছিল। অকস্মাৎ হারিয়ে যাওয়া দীপমালাকে পুনরায় ফিরে পেয়েও মনটা আনন্দে নেচে ওঠে নি, কারণ ততদিনে প্রিয়ব্রতর বুকের আগুনটা আরও গনগনে হয়েছে, আর তারও বেশি দহন শুরু হয়েছে পুরো জঙ্গলমহল জুড়ে।

জঙ্গলমহল ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে। জেলে বসেই তার খোঁজ পেয়েছিল প্রিয়ব্রত। জেলে ওর সঙ্গী হিসেবে ছিল এমন অনেক মানুষ, যাদের বুকেও নিরন্তর বইছিল এক পুণ্যতোয়া আগুনের স্রোত। জেলের মধ্যে, পার্টি-ক্লাসে, ওরাই ওকে একটু একটু করে জানিয়েছিল সেই দহনের ইতিবৃত্ত। পরতে পরতে খুলে দিয়েছিল এক সর্বগ্রাসী খাণ্ডব দহনের পূর্ণাঙ্গ প্রেক্ষাপট।

৩৩. বিপিন লায়েকের মাতৃবিয়োগ

জঙ্গলমহল পুড়ছিল। বহুযুগ ধরে। ধিকি ধিকি।

১৭৯৮ সালের চুয়াড় বিদ্রোহ, পরবর্তী পাইক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৮৫ সালের লায়েক বিদ্রোহ...। ধিকি ধিকি আগুনের মধ্য দিয়ে পথ করে করে হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ব্রত দেখেছে, বাঁকুড়ার পুরো জয়পুর থানা, বিষ্ণুপুর থানার বাঁকাদহ, মড়ার, বেলগুলিয়া, দ্বারিকা, গোঁসাইপুর, উলিয়াড়া এলাকা, কোতুল থানার প্রায় অর্ধেক, এর সঙ্গে মেদিনীপুরের গড়বেতা থানা..., রাঢ় ভূমির এই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জঙ্গলমহল আজও পুড়ছে। পুড়ছে, পুড়ছে।

ওদিকে সোনামুখী-ধনসিমলার জঙ্গল, তারপর একে একে বত্রিশভাগী, দাপানজুড়ির জঙ্গল, জয়পুরের তাঁতীপুকুরের জঙ্গল, সেনাপতির জঙ্গল, বেদ্‌রির ঘন ঘোর জঙ্গল, সেটা

শেষ না হতেই লটাহীড়ের জঙ্গল, হেড়ে পর্বতের জঙ্গল, খড়িকাগুলি-খড়কাটা, পানশিউলি, দাগাশোল, ভালুকা, কাউয়াশোল, পিয়ারডোবার ধারাবাহিক জঙ্গল,...একেবারে মেদিনীপুর জেলার সীমান্ত অবধি এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলভূমি। মেদিনীপুরে পা দিতে না দিতেই সন্ধিপুরের জঙ্গল, শালবনি-জামবনির জঙ্গল...। একেবারে মিশে গিয়েছে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলের সঙ্গে। ঝাড়গ্রাম, চিঁচড়ার জঙ্গল, বিনপুর, হাতীবাড়ী, বেলপাহাড়ী হয়ে একসময় উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বারিপাদার জঙ্গলকে ছুঁয়েছে। সে এক সীমাহীন, অন্তহীন অরণ্যের পৃথিবী। মনে হয়, শুধু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই এক সময় পৃথিবীর ওপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যাবে। এই এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সবুজ সুগভীর শাল-মহুয়ার অন্তরালে এক দীর্ঘস্থায়ী আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে পুরো শতাব্দী জুড়ে। কিংবা তারও আগে থেকে। এদিকে শ্যামনগর থেকে ওদিকে বাঁশদা-মোহনপুর পর্যন্ত এক ঠাসবুনোট ধারাবাহিক জঙ্গলের শেকল। আজকের দিনের জঙ্গলের কংকাল নয়, সে ছিল এক স্বাস্থ্যবান বিভীষিকাময় জঙ্গলের যুগ। পুরোনো দিনের গুঁড়িসার বট-অশথ, মোটা মোটা শাল, পিয়াশাল, মহুল, পিপুল, ছাতিম, চিকুম, কুসুম, ভুয়াশ, আম, কুড়চি, বেল, তেঁতুল, জংলি জাম, কাদাজাম, হর্তুকি, বহেড়া, কেঁদ, শিমূল, চাকোল্তা, ক্ষীরনি, পলাশ,—আরও কত নাম না জানা গাছ-গাছাল, ঝোপ-জঙ্গল। মোটা মোটা চেনা-অচেনা লতা বড় গাছের কাণ্ড পেঁচিয়ে উঠে গিয়েছে চূড়োয়। সেখান থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে ছোট ছোট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ফুল-ফল। গাছের তলায় তলায় আঁকো, মনতা, বৈঁচি, টককুল, সিয়াকুল, ময়নাকাঁটা, আর লাড়ো কুলের অজস্র ঝোড়। ভুঁড়ুর, ভেলাইয়ের ঝোপ। প্রাচীন উইঢিবি, সারবন্দী। তাতে হরেক জাতের ছাতু। জঙ্গলের অন্ধকার খাঁজে-ভাঁজে ভালুক, হুঁড়ার, বনবরা। নানান জাতের বিষধর সাপ। খরগোস, বনমোরগ, তিতির, কোয়েল, ময়ূর, গুঁড়ুর, ঘুঘু, হরিয়াল... সে এক বিচিত্র পৃথিবী। এক অলৌকিক জগৎ...।

শেকলের মতো লাগোয়া জঙ্গলগুলোর মাঝে মাঝে চাকবন্দী বাইদ জমিন। রুক্ষ মাকড়া পাথরে মোড়া কল্লাচ ডাঙা। উঁচু নীচু আদিগন্ত ডিহি। খাঁ-খাঁ। ভূতুড়ে। মাঝে মাঝে দু'চারটা তাল কিংবা বাবলা। এরই মধ্যে, জঙ্গলের গা ঘেঁষে ছোট ছোট বসতি। গ্রাম। লায়েক, লোহার, খয়রা, বাউরি, সর্দার, শিকারি আর মাদোড়দের পুরুষানুক্রমে বসবাস।

জঙ্গলের প্রসঙ্গ উঠলে বেদরি গাঁয়ের নির্মল লায়েকের ঠাকুর্দা বিপিন লায়েকের চোখ-মুখের ভাষা মুহূর্তে বদলে যায়। ঠিক যেন অনেকক্ষণ বাদে মাকে দেখে কচি শিশুর উজ্জ্বল মুখের আকুলি-বিকুলি। জঙ্গলের প্রসঙ্গ উঠলেই বিপিন লায়েকের বুকখানা উথলানো দুধের মতো ফেনিয়ে ওঠে আবেগে। গাঢ় স্বরে জঙ্গলের মহিমা কীর্তন করতে বসে সে। সময় বয়ে যায় নিঃশব্দে, সে বুঝতেই পারে না।

এই পুরো জঙ্গল মহল জুড়ে লায়েক-লোহাররা বিষ্টুপুর রাজার সর্দার কিংবা ঘাটোয়াল ছিল। রাজার হয়ে ঘাঁটি আগলাতো ওরা। বিপদের দিনে রাজার হয়ে যুদ্ধ করত। শয়ে শয়ে প্রাণ দিত। এমনি করে, যুগ যুগ ধরে, মুসলমান হানাদারদের ওরা ঘেঁষতে দেয় নি। বর্গীদেরও ঠেকিয়েছে বহুদিন। বিনিময়ে ওরা ভোগ করত নিষ্কর জমিন আর জঙ্গল। ঐ সব সাজোয়ালি, ঘাটোয়ালি জমিন-জঙ্গল নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল লায়েক, লোহার, খয়রা, মাদোড়ের জাত। জঙ্গলেই

তাদের সুখ, তাদের শান্তি। জঙ্গলই বাপ-মা, সখা-স্যাঙাত, স্বজন। ক্ষুধার খাদ্য, বিপদের আশ্রয়। জঙ্গলই ছিল ওদের স্বদেশ। জঙ্গলের সবুজ রক্ত ওদের ধমনীতে যুগ যুগ বইছে। ওদের অস্থি, মজ্জা, ত্বকে জড়িয়ে রয়েছে শাল-পিয়াল-মউল-ভুঁড়ুরের নির্যাস। সে এক রহস্যময় ছায়া-ছায়া জগৎ। ছায়া, ছায়া। আলো-আঁধারি। স্নিগ্ধ, শীতল, মায়াময়। চারপাশে অজস্র পাখি-পাখালের ডাক। থানে থানে মহিষ-কাঁড়ার বাথান। দিনভর তাদের গলার ঠরকার ঠর..র..র, ঠর্..র্..র... আওয়াজ। নিঝ্‌ঝুম দুপুরে দীর্ঘক্ষণ সে আওয়াজ শুনলে কেমন নেশা ধরে যায়। ঘুম পায়। ঘুম জঙ্গলের মধ্যে বিশাল গর্ত খুঁড়ে শালের গুঁড়ি কেটে ভরে দেওয়া হত সেই গর্তে। আগুন দেওয়া হত শাল কাঠে। ধিকিয়ে ধিকিয়ে সে আগুন জ্বলত সারা রাত। আগুন নিভলে কাঠ-কয়লাগুলোকে গর্ত থেকে তুলে নিয়ে ডাঁই করা হত পাশে। শহর থেকে দালাল আসত। তারপর কোথায় চালান হয়ে যেত ঐ পাহাড়-প্রমাণ কাঠ-কয়লা, কে তার হদিশ রাখে। কোলকাতা, হাওড়া, আরো কত দূর-দুরান্তে। পাহাড়-প্রমাণ শালপাতা সেলাই-ফোঁড়াই হত নিমকাঠি দিয়ে। খাবার পাত, খলা, বাটি, ঠোঙা,—সব কিছুই শালপাতা দিয়ে তৈরি। মাদোড়রা এ কাজে ছিল ওস্তাদ। এ ছিল তাদের বংশের ধারা। তাদের তৈরি শালপাতার বাটি দিয়ে ঝোল গলে না। জঙ্গল মহল থেকে সেই সব পাত, খলা, বাটি, ঠোঙা, চালান হয়ে যেত লাখে লাখে। পণ গুনতিতে। সম্বৎসর লায়েক, লোহার, মাদোড়দের ঘরে ঘরে চলত সে কাজ।

বনে কত জাতের গাছ। তাদের থেকে কতকিছু উপকরণ সংগ্রহ চলত সম্বৎসর। বৈশাখে শালবীজ, বাবলা আঠা। আষাঢ়-শ্রাবণে নিম-কুসুম-কচড়ার বীজ। কালো মেঘ আর বাসক পাতা। ভাদ্র অবধি চলত। তারপর শুরু হত বহেড়া, হত্তুকি, কুড়োনোর ধুম। বাদলকোলা, বেল,—এসবও চলত। গায়ে শীতের হাওয়াটি লাগা মাত্তর শুরু হত কুচলা, গণ্ডগোলা, বহেড়া-আঠা সংগ্রহের হিড়িক। মাঘে নিমের কাঠি, ইন্দ্রযব। ফাগুন-চৈত্রে মউল আর শিমূল তুলো। বেদ্‌রির বিপিন লায়েক বলে, সারা বচ্ছর জঙ্গল শুধু দু'হাত ভরে তিয়ার। যত্ত লিত্তে পার। লাঙ্গলের ঈশ লাও। মুড়া লাও। রাঁধবার লেগে ঝাঁটিকাঠ। খাদ্য নাই ঘরে? ত' জঙ্গলে যাও। কোদো ঘাসের চাল তুলে আন। ফুটিয়ে খাও। তা বাদে, জঙ্গলে আছে পাখ-পাখাল, জীবজন্তু, অভাব কিহে তুমার? রাজা-রাজড়ার ঘর থিক্যে খালি পেটে ফিরে আসে মানুষ। কিন্তু একটিবার জঙ্গলে যাও দেখি। জঙ্গল তুমাকে কেমন খালি পেটে ছাড়ে। জঙ্গলময় কেঁন্দু, কয়েৎ, মিঠাবেল, ভুঁড়ুর, ভ্যাঁচ, ক্ষীরকুল...। টসটইস্যা মউল। গাঢ় মধু। জাম, লাড়ো, আাকো... আরো হাজার জাতের ফল-ফুলারি, কন্দ-মূল, হরেক জাতের আলু,... খাও না হে, যত্ত মন চায়। জঙ্গল-মা তো 'লয়' বইলতে নাই জানে। মা, মা। রোগের তাড়াসে মরত্যে বসেছ? যা না একটিবার জঙ্গলের পাশ। বাসক, কালোমেঘ, শতমূল, হাড়ভাঙা, অনন্তমূল, মুথাঘাস, হিমসাগর, উলোটকম্বল, বনতুলসী, হাতিশুঁড়, আকন্দ, অর্জুন—কত নাম শুনবি? হাজার জাতের ওষধি গাছ মা'টি আমার পুঁইত্যে রেখেছেন জঙ্গলময়। সব ধন্বন্তরী। বিশল্যকরণী। যমের দুয়ার থিক্যে ফিরে আইবেক রুগী। বলতে বলতে নির্মল লায়েকের ঠাকুর্দা বিপিন লায়েক ঘোলাটে চোখে আকাশ নিরীক্ষণ করে। বলে, অমন মা'র ছামুখানেতে

ছিল্যম আমরা আইজ্ঞা। চাষ কর্থ্যম জঙ্গল ঘেঁষা বাইদ-কানালি জমিন। কুনো খাজনা লাইগ্থ নাই সে জমিন চষতে। বর্ষার মরসুমে জঙ্গল ধোয়া জল, গাছের তলায় তলায় পাতা পচানি সার, সব পইড়্থ উই জমিনে। আর, দেইখ্বি ত আয়, হাতি-ঠেলা ধান সে জমিনে! তেবে, যাই বল, তাই বল, হাজাব জমিন চষলেও আমাদ্যার আসল লজবটা থাইক্থ সর্বক্ষণ জঙ্গলেরই উপর। উয়ার পাশই যত আবদার। বলতে বলতে বিপিন লায়েকের চোখের বাতি ধীরে ধীরে নিভে আসে। বিষণ্ণ হয়ে যায় মুখ। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে সারা মুখে। বলে, উই জঙ্গলটাকে হারাল্যম। মা'কে হারাল্যম। গলা ধরে আসে বিপিন লায়েকের। সহসা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সে। মধ্য আকাশে অনেক উঁচুতে যে দুটো চিল কালো বিন্দুর মতো উড়ছিল অনেকক্ষণ, ওদের আঁতিপাতি খুঁজতে থাকে ওর বাহাত্তুরে চোখের মণি। খোঁজে, খোঁজে।

প্রিয়ব্রত মগ্ন হয়ে শুনছিল। তারও বুঝি চোখে মুখে ঘোর লেগেছে এতক্ষণে। জঙ্গল-মা'কে নিয়ে বেদরির লায়েকদের যাবতীয় আবেগ, বিষাদ সবই বুঝি সংক্রামিত হচ্ছে তারও রক্তে। শৈশব থেকে জঙ্গলের পাশাপাশি বসবাস তারও। চুয়ামসিনার চারপাশে অগাধ, অফুরন্ত জঙ্গল। বত্রিশভাগীর জঙ্গল, শালুকা, দাপানজুড়ি, বৈত্যা, পাথরমৌড়ার জঙ্গল। বাঁকুড়া জেলার কোনও এলাকার জঙ্গলের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয় তারা। সে সব জঙ্গলে বহুবার বাবার সঙ্গে গিয়েছে প্রিয়ব্রত। জঙ্গল-রাস্তা ধরে কতবার গেছে সোনামুখি কিংবা ভড়ার মহালে। জঙ্গলের ফল-পাকুড়, পশুপাখি সেও কিছু কম খায় নি জীবনে। কিন্তু জঙ্গলকে নিয়ে বিপিন লায়েকদের যে ওথলানো দুধের মতো আবেগ, যে আবেগমথিত গলায় মা-মা ধ্বনি, প্রিয়ব্রতকে বারংবার বিস্মিত আনমনা করে দিচ্ছিল। বলে, কেমন করে হারালে?

বিপিন লায়েক এবার নিজের ওপরই বিরূপ, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। খুব চাপা বিকৃত গলায় বলে, আমরা ছিল্যম যে বোকা সক্কা, উজবুক। চদুর পারা থাইক্তম। বিশ্বাস কর্থম্ বাবু-ভদ্দর লোকেদের। বাবুরা সেই সুযুগে পঁগাটি মেইরে ঢাক কইরে দিল্যাক। ছুঁচটি হইয়েঁ সেঁধাল্যাক, ফালটি হইয়েঁ বারাল্যাক।

শুনতে শুনতে অপ্রস্তুত বোধ করে প্রিয়ব্রত। ভদ্দরলোকদের সম্পর্কে এমন তিক্ত মন্তব্যে তার অস্বস্তি বাড়ে। সেই কোন যুগের কোন্ 'ভদ্দরলোকের' কুকর্মের দায়ভাগ যেন অজান্তে তার ঘাড়ে বোঝার মতো চড়ে বসে। যদিও নিজেকে কখনই 'ভদ্দরলোক' বলে দাবি করে না প্রিয়ব্রত, বরং 'ভদ্দরলোক'দের সে আশৈশব ঘৃণা করতেই শিখেছে, তবুও প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে উপলব্ধি করে, যতই সে শিকলি কেটে ফেলুক না কেন, তার রক্তে, সংস্কারে এখনো স্বগোষ্ঠীচেতনা সামান্যতম হলেও থেকে গিয়েছে। নইলে 'ভদ্দরলোক'দের নিয়ে কোনও তিক্ত প্রসঙ্গ উঠলেই নিজেকে এমন অপরাধী লাগে কেন? আসলে, রক্তের আর সংস্কারের উত্তরাধিকার অত সহজে অস্বীকার করা যায় না। কঠোর সাধনা করলেও বুঝি এক জন্মে মুক্তি পায় না মানুষ। প্রিয়ব্রত অধোবদন হয়। মাথা তুলে কিছুতেই সে তাকাতে পারে না মানুষগুলোর দিকে।

বিপিন লায়েকের ঘোলাটে চোখ দুটো দিগন্তের গায়ে বৃত্ত আঁকছিল সমানে। ছোট-বড় নানান আকারের বৃত্ত। অলবলে জিভ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল দন্তহীন মুখের মধ্যে। দু'চোখের

কোণায় পিচুটি টলোমলো। ক্রমশ থমথমে হয়ে আসছিল মুখ। বলে, উই যে অতবড় জঙ্গল, উ-ই যে— দিকদিশা নাই যার, আমরা, বেদরির লায়েকরা ছিল্যম উই জঙ্গলের ষোলআনা দখলদার। আমাদ্যার বাপ-ঠাকুদ্দা চোদ্দপুরুষ কাঠ কেইটেছেন। কাঁড়া চরাঁইছেন। বাথান বাইনোছেন। জঙ্গলের ফল-ফুলারী, পশু-প্রাণী, পাখ-পাখাল—সব ভোগ কইরেছেন যুগ যুগ ধইর্যে। ইখন উই জঙ্গলগুলান আর আমাদ্যার নাই।

আরে, নাই, তাতো সবাই জানে। বেদরির লায়েকরা জানে। বিষ্টুপুর, জয়পুর থানার পাখ-পাখাল অবধি জানে। কিন্তু ক্যানে নাই? সিটা বল বুড়া। কোকিলবাবু শুনুন সিট্যা লিজের কানে।

উ'গুলান ইখন কাদের দখলে, জান?

তাও জানে বৈকি তল্লাটের সবাই, বেদরির লায়েকরা তো বটেই। এখন বেদরির পুরো জঙ্গলটা হল যতিন গুঁসাই, মানু গুঁসাই, ধনু গুঁসাইদের সম্পত্তি।

বিপিন লায়েক দু'চোখ ছোট করে শুধোয় প্রিয়ব্রতকেই, 'কিন্তু কি কইর্যে গেল্যাক?'

প্রিয়ব্রত পালটা শুধোয়, 'কি করে?'

আকণ্ঠ বিষ ঢেলে বিপিন লায়েক বলে, 'শুইন্‌বি সে বিত্তান্ত? শুইন্‌থে চাস?'

খুব আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকে প্রিয়ব্রত। খুব ক্ষীণভাবে আসামীর কাঠগড়ায় ততক্ষণে খাড়া করিয়ে দিয়েছে নিজেকেই।

বেদরির লায়েকরা নড়েচড়ে বসে। সবাই আশৈশব জানে, কী করে বেদরির জঙ্গল গেছে লায়েকদের হাত থেকে গোঁসাইদের দখলে। ভিনগাঁয়ের বউড়িরা দু'দিন না আসতেই শুনে ফেলেছে সেই মর্মবিদারক কাহিনী। তবুও টানটান হয়ে বসে সবাই। প্রস্তুত হয়, বিপিন লায়েকের মুখ থেকে নতুন করে তা শুনবার জন্য।

সুমুখপানে ঠায় তাকিয়ে থাকে বিপিন লায়েক। পলকহীন। সারা মুখ জুড়ে গাঢ় অন্তর্বাহী বেদনার ছাপ। পুরোনো ব্যাধির মতো গা-সওয়া কষ্টকর অনুভূতি। তার কপালের বলিরেখা ঘনঘন ভাঙচুর হতে থাকে। চোয়ালের হনু শক্ত হয়ে ওঠে। চিবুকের চামড়ার আঁকিবুকিতে প্রচ্ছন্ন ঘৃণার ছবিটি সম্পূর্ণ হয়। গলার হত্তুকি ওঠে নামে খুব ঘনঘন।

সে এক বিত্তান্ত বটে—, বিপিন লায়েক প্রস্তুত হয়। ধীরে ধীরে রোষে দু'চোখ আখার মতো জ্বলতে থাকে তার। যদিও লায়েকপাড়ার জোয়ান-মদ্দ, বাচ্চা-বুড়ো সবাই জানে সেই কাহিনী, বিপিন লায়েকের মুখ থেকে বহুবার, বহুভাবে শোনা সে সব কথা, তবুও উপস্থিত বিপিন লায়েককে বাধা দেয় না কেউ। সবাই জানে, এ সময় বিপিন লায়েককে বাধা দিলে হিতে বিপরীত হবে। বেদরির জঙ্গল হারানোর শোকটা কিছুতেই ভুলতে পারে না বুড়া। সেই কারণে ভেতরে এক অদৃশ্য তুষের আগুন নিরন্তর ধিকিধিকি জ্বলছে নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে খানিকটা ভাঁপ বের করে না দিলে একদিন ছাতি ফেটেই মরে যাবে বুড়া। লায়েকরা তাই গুছিয়ে গোল হয়ে বসে। বুড়ো-জোয়ানদের গা ঘেঁষে দুধের বাচ্চারাও বসে যায়।

শুরু করতে গিয়েই আচমকা থমকে থেমে যায় বিপিন লায়েক। জমায়েতের ওপর চোখ রাখে। বাচ্চাদের উদ্দেশে বলে, 'তুয়ারা সব অত পিছে ক্যানে রে? সুমুখে এসে বস্। তুয়াদ্যার তো বেশি কইরে শুনা দরকার।'

বাচ্চারা সব কলকলিয়ে সামনে এসে বসে।

বিপিন লায়েক শুরু করে তার মা হারানোর গল্প।

শুনতে শুনতে এক সময় বুঁদ হয়ে যায় বেদরিব লায়েকরা। প্রিয়ব্রতও।

৩৪. বিষণ্ণতার বীজ থেকে মহীরুহ

উচুঁ পাঁচিল দেওয়া সিংহগড়ের একতলার ঘরে শুয়ে থাকলে জানলা দিয়ে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল, হরিণমুড়ি নদী, শালকাঁকির ডাঙা,—এসব কিছুই দেখা যায় না। প্রিয়ব্রত শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছে দূরের কিছু শালগাছেব উর্ধ্বাঙ্গ, আর এক চিলতে নীল আকাশ। আকাশ দেখতে চিবকালই খুব ভাল লাগে প্রিয়ব্রতর। আকাশ ওকে অনেক কিছুই দিয়েছে এই ছোট্ট জীবনে। আর দিয়েছে নদী, ছোট্ট নদী হরিণমুড়ি। তারই তীরে বসে, দীপমালার সঙ্গে সেই বিকেলটা...।

একতলার যে ঘরখানাতে এই মুহূর্তে শুয়ে রয়েছে প্রিয়ব্রত, ঠিক তার ওপরের ঘবখানাতে শেষ জীবনে বসবাস করতেন সুদর্শন সিংহবাবু। ঠিক ওর মাথার ওপর ছিল তাঁর ...বাস। দাদুর সঙ্গে কোন বিষয়েই মিল ছিল না প্রিয়ব্রতর। বরং বলা যায়, ছিল আজীবনকাল তীব্র বৈপরীত্য। কেবল একটা বিষয়েই ছিল ভারি মিল। শেষ জীবনে ওরা দু'জনেই শয্যাবন্দী। আর দু'জনেই স্মৃতির স্থলে অস্থির। উনিশ শো বিয়াল্লিশে জেলে থাকবার সময়ে শরীব জুড়ে শুরু হয়েছিল যে নিঃশব্দ ভাঙন, আজ প্রায় দেড়-দশক বাদে তা এক ধ্বংসাত্মক সম্পূর্ণতা পেয়েছে। এখন মারাত্মক ক্ষয়রোগ প্রিয়ব্রতর সর্বাঙ্গ কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রিয়ব্রতর মনে হয়, যেকোনও মুহূর্তে ওর শরীরখানা কাশির দমকে দুলতে দুলতে আচমকা থেমে যেতে পারে। প্রিযব্রত আশা করছে, যে কোনও মুহূর্তে, তেমনটা। আসলে বাঁচবার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছে। ঐ ইচ্ছেটাই তো আসল। দিনের উজ্জ্বল রোদ্দুরের মতো। রোদ্দুর, রোদ্দুর! সেই রোদ্দুবটাই যখন নিভে গেল, প্রাণপাখি আর শীর্ণগাছের মগডালে বসে থাকবে কিসের প্রত্যাশায়। কাজেই ...ও প্রস্তুত হচ্ছে, চারদিকে ইতিউতি দেখে নিচ্ছে চোখের মণি চারিয়ে, এক সময় ফস করে উড়ে যাবে। উড়ে যাবেই, প্রিয়ব্রত জানে, জেনেছে। নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছে, ইতিউতি দেখে নিচ্ছে, যা যা এই শেষ বেলার স্বল্প অবকাশে দেখে নেওয়া সম্ভব।

প্রিয়ব্রতর দাদু, সুদর্শন সিংহবাবুও তাঁর জীবনের সায়াহ্নে এমনই শয্যাবন্দী জীবন কাটিয়ে গেছেন। প্রিয়ব্রত তা স্বচক্ষে দেখেছে, শেষ অংশটুকু আর দেখা হয়ে ওঠেনি, তখন তো সে স্বদেশী অন্দোলনের দায়ে জেল খাটছে।

চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রত। ঠিক মাথার ওপর, যে ঘরে বসে ঠিক এই মুহূর্তে গলা সাধছে কুন্তী, সেই ঘরেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে গেছেন সুদর্শন সিংহবাবু। উনি মারা যাওয়ার পর যে দু'মাস বেঁচে ছিলেন সরযু, রোজই নিয়ম করে দু'বার ঢুকতেন ঐ ঘরে। দুপুরে স্নানের পর, এবং সন্ধেবেলায় রাধামাধবের আরতির শেষে, প্রসাদী ফুলের রেকাবি হাতে নিয়ে, যেমনটা সুদর্শনের জীবদ্দশায় প্রায় পাঁচ বৎসরাধিক কাল করে এসেছেন তিনি।

তারপর, সুদর্শন সিংহবাবুর মৃত্যুর ঠিক দু'মাসের মাথায় কার্তিকের এক শিশির-ঝরা রাতে সরযু আর শঙ্করপ্রসাদ চলে গেলেন ওপারে। এক সঙ্গেই চলে গেলেন। প্রিয়ব্রত

তখনও ইংরেজের জেলে পচছে। কিছুদিন যাবৎ সরযুর পাগলামোটা নাকি ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। আটান্ন বছর বয়েসে তিনি তখন পুরোপুরি এক বিকারগ্রস্ত রমণী। গভীর রাতে তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন দোলানোটা তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুদর্শন সিংহবাবু মারা যাওয়ার পর সেটা নাকি বহুগুণ বেড়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, সারাদিন বিধবার বেশে থাকলেও, সন্ধের আঁধার নামলেই তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যেত এক আশ্চর্য পরিবর্তন। পরিপাটি করে গা ধুতেন, রাধামাধবের মন্দিরে গিয়ে সামান্য সময় বসতেন, আরতির পরে প্রসাদী ফুল রেখে আসতেন সুদর্শনের ঘরে। তারপর, নিজের শোবার ঘরে খিল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরিপাটি সাজতেন। সবচেয়ে দামি বেনারসীগুলোর থেকে একখানা বেছে নিয়ে পরতেন। খোঁপা বেঁধে নিতেন মনোহারী ছাঁদে। সর্বাঙ্গে পরে নিতেন গহনা। গলায় চন্দ্রহার, দু'হাতে বালা, কঙ্কন, মকরমুখী, সিঁথিতে টিকলি, কানে পাশা-ঝুমকা, পায়ে রুমুর-ঝুমুর মল। ঐ বেশে তিনি যখন শোবার ঘর থেকে বেরোতেন, সারা সিংহগড়ের দাসী-চাকরেরা চোখের পলক ফেলতেও ভুলে যেত। সরযু কারুর প্রতি দৃকপাত করতেন না। চৌকোণো বিষ্টুপুরী লণ্ঠনখানি বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে তিনি ধীরপায়ে রওনা দিতেন তেতলার উদ্দেশ্যে। সেই থেকে প্রায় সারা রাত লণ্ঠন হাতে তেতলার খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি। কারও নিষেধ, কোনও বাধাই মানতেন না। প্রত্যক্ষদর্শী দাসী-চাকরানীদের মুখে যেটুকু জানা গেছে, মাঝে মাঝে তিনি লণ্ঠনহাতে ছাদের আলসের ওপর এতখানি ঝুঁকে পড়তেন যে, যে কোনও মুহূর্তে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যাওয়া কিছুই অসম্ভব ছিল না। বহু রাতে দাসী-চাকরানীরা, এমন কি কোন কোনও দিন শঙ্করপ্রসাদ স্বয়ং তাঁকে টেনে এনেছেন ছাদের আলসে থেকে। টেনে এনেছেন, কিন্তু নিরস্ত করতে পারেন নি একতিল। পরের রাতেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। পরের রাতেও।

যে রাতে সরযু এবং শঙ্করপ্রসাদ একসঙ্গে মারা গেলেন, সনাতন শিকারি ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। সে ছিল সুদর্শন সিংহবাবুর খাস চাকর। সরযুকে অনুসরণ করে পায়েপায়ে তিনতলায় এসেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ, পিছু পিছু সনাতন। সরযুর কোনদিকে হুঁশ ছিল না তখন। তিনি একেবারে ঘোরের মধ্যে ছিলেন। লণ্ঠন হাতে ছাদের আলসের গায়ে একেবারে ঝুঁকে পড়েছিলেন। সিংহগড়ের বাইরে কালকেশুতের ঝোপের আড়ালে একটা আলো টিমটিমিয়ে জ্বলছিল। আলোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সরযু। শঙ্করপ্রসাদ যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়ালই করেন নি। সহসা আলোটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘনঘন লণ্ঠন দোলাতে শুরু করেছিলেন সরযু। প্রাণপণে ঝুঁকে পড়েছিলেন আলসের ওপর। এক সময়, সনাতনের স্পষ্ট মনে হয়েছিল, সরযু হাতের লণ্ঠনসহ ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন শূন্যে। নিমেষের মধ্যে শঙ্করপ্রসাদ জাপটে ধরেছিলেন সরযুকে। কিন্তু সরযুর শরীরে তখন অযুত হস্তীর বল। শঙ্করপ্রসাদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তাঁকে আটকে রাখতে পারেন নি। দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এক সময় আলসের একটা অংশ ধ্বসে পড়ে এবং সরযু ও শঙ্করপ্রসাদ শরীরের যাবতীয় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান পশ্চিমের ফল বাগিচার মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছিল দু'জনেরই। জেলে বসে প্রিয়ব্রত সেই মৃত্যুর খবর পেয়েছিল প্রায় একমাস বাদে। ততদিনে অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধ-শান্তি সব ঘুচে গিয়েছে। খবরটা পাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মায়ের মুখখানা বারবার মনে পড়ছিল। সিংহগড়ে সেই মুহূর্তে লাবণ্য ছিলেন একা, নিতান্তই একা। তাঁকে ভরসা দেওয়া তো দূরের কথা, সান্ত্বনা দেবারও কেউ ছিল না।

প্রায় মাস চারেক বাদে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, একদিন রাতের অন্ধকারে গা লুকিয়ে সিংহগড়ে ঢুকেছিল প্রিয়ব্রত। কারণ, জেলের বাইরে বেরিয়েই সে শুনেছিল, পুলিশ ওকে আরও একটি ডাক-লুটের কেসে জড়িয়ে দিয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। মায়ের মুখোমুখি হয়েছিল একেবারে তিনতলায়, একান্তে। এ ক'মাসে একেবারে বদলে গিয়েছেন লাবণ্য। সাদা থানে মোড়া নিরলঙ্কার শরীর। শরীরের লাবণ্য, কমনীয়তা ঝরে গিয়েছে অনেকখানি। শুকনো মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি, আর, কী এক নিদারুণ ভার বহনের যাতনা। প্রিয়ব্রতকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথার চুলে মুখ ডুবিয়ে দীর্ঘ ঘ্রাণ নিয়েছিলেন লাবণ্য। তাঁর বুকের ওঠানামা, অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হচ্ছিল। প্রবল আবেগে, আক্ষেপে, ফুটন্ত দুধের মতো উথলে উঠছিল লাবণ্যর বুকখানি। দু'হাতের প্রবল চাপে একেবারে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ব্রতর শরীর। প্রিয়ব্রত নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার শরীরের ওপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছিল লাবণ্যর আবেগগুলি। প্রিয়ব্রত সহ্য করছিল। ভেঙে পড়তে দিচ্ছিল ঢেউগুলি। ঢেউ, ঢেউ।

এক সময় শিথিল হয়ে এসেছিল লাবণ্যর বাহুদুটি। শিথিল হয়ে এসেছিল সারা শরীর। আবও বিষণ্ণ, করুণ হয়ে উঠেছিল মুখমণ্ডল। ছলোছলো বর্ষণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল চোখদুটি। ধরে আসা গলায় লাবণ্য বলেছিলেন, 'এবার ফিরে আয় খোকা, এ ভার আমি আর সইতে পারি।' প্রিয়ব্রত সহসা কোনও জবাব দিয়ে উঠতে পারে নি। কারণ, যে জবাবটা তাকে দিতে হত, তা ঐ আবেগঘন মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব ছিল না। মাকে আঘাত দিতে চিরকালই প্রিযব্রতর বুক কাঁপে।

সেবারে নাগাড়ে সাতদিন সিংহগড়ে ছিল প্রিয়ব্রত। তিনতলার চিলেকোঠার ঘরখানাকে সাফ-সুতরো করে দড়ির খাটিয়ায় বিছানা পেতে দিয়েছিল সনাতন। তিনতলার দরজায় সারাক্ষণ তালা দেওয়া থাকত। চাবি থাকত লাবণ্যর কোমরে। এমনিতেই, সরযু ও শঙ্করপ্রসাদ চলে যাওয়ার পর অন্দরমহলে ঝি-চাকরের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন লাবণ্য। তাও যারা ছিল, তাদের মধ্যে কেবল সনাতন আর বামুনদিদি ছাড়া দোতলায় আসার অনুমতি ছিল না তেমন কারও। বামুনদিদি রান্নাবান্না সেরে, লাবণ্যকে খাইয়ে বিশ্রাম নিতে চলে যায় অন্দরমহলেরই একতলার একেবারে উত্তরের কুঠরিখানায়। সারা দুপুর সে ঐ ঘরে ঘুমোয় কিংবা সুর করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে। আর সুদামা বলে যে অল্প বয়েসী মেয়েটা সারাক্ষণ লাবণ্যর ফাই-ফরমায়েশ খাটে, দুপুর বেলায় গা-হাত-পা টিপে দেয়, তাকে ঐ কদিন রোজ সকাল সকাল বিদেয় করে দিত লাবণ্য। মেয়েটা অসময়ে ছুটি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে চলে যেত। তখন একতলা থেকে দোতলায় ওঠার দরজায় শেকল দিয়ে সনাতন প্রিয়ব্রতকে সন্তর্পণে নাবিয়ে আনত দোতলায়। প্রিয়ব্রত চান করত, খেত, তারপর মায়ের বিছানাতেই মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকত সারা দুপুর, বিকেল,... তির তির করে বয়ে

যেত সময়, প্রিয়ব্রত মায়ের কোলে মটকা মেরে পড়ে থাকত। ঘুম তার আসত না কিছুতেই। লাবণ্যও সেটা জানতেন। কিন্তু তিনিও মুখে তিলমাত্র রা কাড়তেন না। কিছুই বলতেন না। কিছুই শুধোতেন না।

লাবণ্যর এই নিশ্চুপ. বাক্যহারা ভাবখানি অনেকদিন ধরেই ছিল। প্রিয়ব্রত সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে, মা এক বিষণ্নপ্রতিমা। কথা কম। হাসি-উচ্ছ্বাস সবই মাপা। অথচ সনাতন জানে, প্রিয়ব্রতকে বলেছে, ছেলেবেলায় লাবণ্য নাকি ভীষণ ছটফটে আর হাসিখুশি ছিলেন। সর্বদা নাকি সিংহগড়ের অন্দরমহল তোলপাড় করতেন তিনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে একটু একটু করে জমতে থাকে বিষাদ, ছায়া। ঠিক কখন থেকে লাবণ্য বিষণ্ন হতে শুরু করেছিলেন, প্রিয়ব্রত তার নির্ভুল হদিশ এখনও অবধি পায় নি। তবে সরযু, সনাতন এবং পরীক্ষিত বাউরির মুখ থেকে টুকরো টুকরো গল্প-গাথা শুনে তার মধ্যে যেটুকু ধারণা জন্মেছে, তা পুরোপুবি বিভ্রান্তি জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। একবার মনে হয়, লাবণ্যর সেই কৈশোরে, এক ঝড়বৃষ্টির রাতে অরিজিৎ নামে যে ঢলঢলে গৌরবর্ণ যুবকটি এসে আশ্রয় নিয়েছিল সিংহগড়ে, সুদর্শন সিংহবাবুর প্রশ্রয়ে কয়েকমাস অজ্ঞাতবাসে ছিল, কোন এক রহস্যময় কারণে সুদর্শন সিংহবাবু সেই যুবককে লাবণ্যর গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন, যদিও সে একদিনও লাবণ্যকে পড়ায় নি, তবুও সারা সিংহগড় তাকে লাবণ্যর মাস্টারমশাই বলে ডাকত, সেই ডাকাবুকো ছেলেটা একদিন এক ম্লান অপরাহ্নকে আরও ম্লান করে দিয়ে সিংহগড়ের সিং-দরজা ঠেলে এলোমেলো পদক্ষেপে চলে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মতো, আর সেই মেঘলা অপরাহ্নে তিনতলার ছাদে একলাটি দাঁড়িয়ে লাবণ্য নিষ্পলক প্রত্যক্ষ করেছিল সেই চলে যাওয়া..., সেই বিকেলটাই কি তাঁকে উপহার দিয়েছিল এক অচেনা বিষণ্নতার বীজ? সেই বীজ কি লাবণ্যর সারা কৈশোর, যৌবন জুড়ে বাড়তে বাড়তে এক ছায়াঘন বৃক্ষ হয়ে ছেয়ে ফেলেছিল, ঢেকে ফেলেছিল, লাবণ্যর পরবর্তী জীবনকে। পরীক্ষিত বাউরি বলেছিল, সুদর্শন সিংহবাবু যখন শঙ্করপ্রসাদকে 'সিংহ' বানাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠালেন বেলশুলিয়ার কাচারি ঘরে লাম্পট্যের পাঠ নিতে, প্রিয়ব্রত তখন ছিল মায়ের পেটে। সে সময় স্বামী ছাড়া একদণ্ড কাটতে চায় না নারীর। আর সেই সময়েই কিনা সুদর্শন তাঁর একমাত্র মেয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন তাঁর স্বামীকে! যে ক'মাস শঙ্করপ্রসাদ বেলশুলিয়ার কাচারিতে ছিলেন, প্রিয়ব্রত জেনেছে, লাবণ্য নাকি ভাল করে খান নি, ঘুমোন নি, এক অবর্ণনীয় বেদনায় কেটেছে তাঁর দিন, রাত...। দেখেশুনে প্রমাদ গুনেছেন সরযু। হামলে পড়েছেন স্বামীর কাছে, নিজের একমাত্র মেয়ের বুকের আনন্দটুকু ভিক্ষে চেয়েছেন তিনি। দেখেশুনে নিজের সিদ্ধান্ত বদলেছেন সুদর্শন। শঙ্করপ্রসাদকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। শঙ্করপ্রসাদ পুনরায় ফিরে এসেছেন সিংহগড়ে, কিন্তু লাবণ্যর মুখে আর তেমন করে হাসি ফোটেনি। বরং এক ধরনের অচেনা আশঙ্কা, গুপ্ত বিষাদ তাঁকে গ্রাস করেছে তিলতিল। তাঁর চোখে অপরাধবোধ প্রকট হয়েছে দিনদিন। তাঁর হয়ত মনে হয়েছে যে, সংস্কৃতজ্ঞ, বিদ্বান পরিবারের এক সুদর্শন, রুচিশীল, শুচিশুভ্র তরুণকে ধরে এনে জুতে দেওয়া হয়েছে সিংহগড়ের নীল আভিজাত্যের শকটে। তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর বিদ্যা,

জ্ঞান...। তাঁব পূর্বজীবনের যাবতীয় স্মৃতিকে ঘসে ঘসে নিঃশেষে মুছে দেবার চেষ্টা চলেছে। পরিবর্তে তাঁকে শেখানো হয়েছে শাসন-শোষণের বহুবিধ কৃৎকৌশল। সিংহগড়ের রাজশকটটিকে মসৃণভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পায়ে দেওয়া হয়েছে স্বতন্ত্র মুদ্রা, ছন্দ। আর, লাবণ্যকে হতে হয়েছে সেই আয়োজনের এক মূর্তিমতী উপলক্ষ্য। শঙ্করপ্রসাদ যদি সেই মুদ্রা ও ছন্দে অতি দ্রুত পারদর্শী ও পরিণত হয়ে উঠতে পারতেন, যদি সিংহগড়ের নীল আভিজাত্য তাঁকে গিলে ফেলতে পারত ষোলআনা, যদি তিনি রাজদণ্ড ধারণের যোগ্য হয়ে উঠতেন পরিপূর্ণভাবে, তাহলে হয়ত বা লাবণ্যব মনে কোনও অপরাধবোধ জমতই না। কিন্তু শুধু লাবণ্যই নয়, প্রিয়ব্রতও তিলতিল দেখেছে, কী এক দুঃসহ চাপা আক্ষেপ বুকেব মধ্যে মাকড়া পাথরের মতো বয়ে বেড়িয়েছেন শঙ্করপ্রসাদ, দিনের পর দিন। দুই সত্তার মধ্যে নিরন্তর লড়াইতে রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তাঁর হৃদয়। লাবণ্য কি সে ক্ষত দেখতে পান নি! তাঁর একেবারে গায়ে গা ঠেকিয়ে বেঁচে থাকা একটি মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা নিজের সঙ্গে যুঝতে থাকবে, আর, তাঁব পাশটিতে থেকেও তার তিলমাত্র আভাস পাবেন না লাবণ্য। তাও কি হয়। লাবণ্য, কাজেই, তাঁর সঙ্গী পুরুষটির অবিরাম নিঃশব্দ যুদ্ধ, রক্তক্ষরণ এবং নীরব আর্তনাদ অনুভব করেছেন দিনের পর দিন। প্রচ্ছন্ন অপরাধবোধে ভরে উঠেছে তাঁর সমগ্র সত্তা। সেই অপরাধবোধই হয়ত বা তিলতিল বিষণ্ণ করে তুলেছে লাবণ্যকে।

এ সবকিছুই প্রিয়ব্রতর নিজস্ব বিশ্লেষণ। এব বাইবে লাবণ্যর আজন্মবাহিত বিষণ্ণতার যদি অন্য কোনও উৎস থেকে থাকে, তা প্রিয়ব্রতর কাছে আজও দুর্জ্ঞেয়।

লাবণ্যর কোলে মাথা রেখে নিঃসাড়ে শুয়ে থেকে যখন এইসব হাজারো ভাবনায় খরচ হয়ে যাচ্ছিল প্রিয়ব্রতর যাবতীয় দুপুর, বিকেল..., ঠিক তখনই একদিন আচমকা কথাটা শুধিয়ে বসলেন লাবণ্য, 'খোকা, দীপা এখন কুথায় বে?'

প্রিয়ব্রত চমকে উঠেছিল। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল তার। জবাব দিয়ে উঠতে পারে নি। লাবণ্য দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করতেই সে কোলের মধ্য থেকে কোন গতিকে জবাব দিয়েছিল, 'জানিনা।'

'তুয়ার সাথ তার দেখা হয় না?'

'নাহ্।'

'কতদিন?'

'অনেক্‌দিন।'

'তুই উয়ার খোঁজ লিস নাই?'

প্রিয়ব্রত চুপ করে শুয়ে ছিল। লাবণ্য বসেছেন পাথরের মূর্তির মতো। জানলা দিয়ে আমলকি গাছটার চূড়ো দেখা যাচ্ছিল। শীর্ণ পাতাগুলি বাতাসে তির তির করে কাঁপছিল। সেই কাঁপুনিকে দেখতে দেখতে, আত্মস্থ করতে করতে লাবণ্য বলেছিলেন, 'খোকা, তুই ইবার সংসারী হ।'

প্রিয়ব্রত মায়ের কোলে শুয়ে ক্রমশ কাঠ হয়ে গিয়েছিল। লাবণ্যর হাতখানি ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল ওর পিঠে। আঙুলগুলো আলতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল পিঠময়।

এমন প্রস্তাব এই প্রথম দিলেন না লাবণ্য। খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে প্রিয়ব্রতকে সিংহগড়ে পাকাপাকি বেঁধে ফেলবার যাবতীয় পরিকল্পনা বেশ কিছুকাল ধরে ছকে আসছিলেন লাবণ্য। সরযুরও তাতে সায় ছিল। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ধরা পড়ে মোট দু'বছর জেলে ছিল প্রিয়ব্রত। পঁয়তাল্লিশের গোড়ায় ফিরে এল, তখনই কানাঘুসোয় শুনল, লাবণ্য আর সরযু ভেতরে ভেতরে ওর জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। ঐ সময়েই দীপমালা মাস ছয়েকের মধ্যে দু'দুবার আসে সিংহগড়ে। ব্যাপারটা নিয়ে লাবণ্য আর সরযু ঠিক কী ভেবেছিলেন প্রিয়ব্রতর পুরোপুরি জানা নেই, তবে প্রিয়ব্রতকে সংসারী করে তোলার জন্য তাঁরা মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেবারে প্রবলভাবে বাদ সাধল প্রিয়ব্রতর শরীর। জেলের মধ্যে শরীরের ওপর যে অনিয়ম আর অত্যাচার চলেছে দু'দুটি বছর, সিংহগড়ের আয়েস-আরামে পালিত শরীর তার ধকল সামলাতে পারে নি। শরীরের অর্ধেক মেদ-মাংস ঝরে গিয়েছে, চোখ দুটি ঢুকে গিয়েছে অতল গহ্বরে...। সারাক্ষণ খুকখুকে কাশি। আর, বিকেলের পর সামান্য ঘুসঘুসে জ্বর। ছেলেকে সংসারী করবার বাসনা সে যাত্রা মাথায় উঠেছিল লাবণ্যর। তার বদলে বাঁকুড়া শহর থেকে এসেছিল পাশ করা ডাক্তার। বরাদ্দ হয়েছিল দোতলার একখানা খোলামেলা ঘর। ঔষধ-পথ্য, সেবা-যত্ন, প্রয়োজনের অধিক। ফলে, আশাতিরিক্ত কম সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল প্রিয়ব্রত। এবং তারপরই, এক নিশুত রাতে পরীক্ষিত বাউরির সঙ্গে খাঁচার পাখি আবার আকাশে উড়ল।

প্রিয়ব্রত বোঝে, লাবণ্য এবার আরও সতর্ক। আর শক্তপোক্তভাবে বাঁধতে চান তাঁর একমাত্র আত্মজকে।

একটুক্ষণ চুপ থেকে লাবণ্য বলেন, 'তুই রাজি হলে, নিকুঞ্জপতিকে বলি। মেয়ের সন্ধান করুক সে।'

শঙ্করপ্রসাদের দাদার ছেলে নিকুঞ্জপতি। সরযু ও শঙ্করপ্রসাদ আচমকা চলে যাওয়ার পর সে সিংহগড়ে এসেছে। গোমস্তা কৃষ্ণদাসের পরামর্শক্রমে লাবণ্যই তাকে আনিয়েছে মশিয়াড়া থেকে। অথচ, পাশেই রাধানগর গাঁয়ে লাবণ্যর মামা বাড়ি। তিন-তিন মামা। তবুও কৃষ্ণদাস সুপারিশ করেছে নিকুঞ্জপতিকে। কৃষ্ণদাস অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত এবং সিংহগড়ের একজন সত্যিকারের সুহৃদ। লাবণ্যর মনে হয়েছে, কৃষ্ণদাস সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কারণ, সরযু ও শঙ্করপ্রসাদের মৃত্যুতে লাবণ্যর আচমকা একা হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সিংহগড়ে রাতারাতি যে শুভার্থী সমাগম শুরু হয়েছিল লাবণ্যর তিন মামা ছিল তাদের একেবারে প্রথম সারিতে। বিষ্ণুপুরের অন্নদা চক্রবর্তী, কাকা প্রতাপলাল, খুড়তুতো দাদা হরবল্লভ, এমনকি নন্দ সরকারও ছিল সেই সারিতে। কিন্তু সবাইকে ঠেলেঠুলে সরিয়ে দিয়ে লাবণ্যর তিন মামাই সিংহগড়ের দখল নেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এ ব্যাপারে বাইরের মানুষজনের সঙ্গে তো বটেই, তাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল এক গোপন অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শেষের দিকে সবক্ষেত্রে গোপনও থাকছিল না তা। দেখেশুনে বুঝি প্রমাদ গুনেছিল কৃষ্ণদাস। এক সময় চুপিচুপি লাবণ্যর কাছে রেখেছিল প্রস্তাবটা। ভাগাড়ে লাশ দেখে আকাশে শকুনদের ওড়াউড়ি শুরু হয়ে গেছে। প্রিয়ব্রত সর্বার্থে এক উড়ন্ত পাখি। এমন সময়ে

সিংহগড়ে এমন একজন পুরুষ মানুষ প্রয়োজন, যে সিংহগড়ের আত্মজন, এবং লাবণ্য ও সিংহগড়ের সত্যিকারের শুভার্থী। লাবণ্য মেনে নিয়েছিলেন কৃষ্ণদাসের যুক্তি। এবং লাবণ্য যখন সিংহগড়ের অভিভাবক হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিটিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখনই কৃষ্ণদাস তুলেছিলেন নিকুঞ্জপতির প্রসঙ্গ। কৃষ্ণদাসকে সেই ছেলেবেলা থেকেই চেনেন লাবণ্য, তার বিচারবুদ্ধির প্রতি ওঁর অপবিসীম আস্থা। তাছাড়া, লাবণ্যর মনে হয়েছে সুদর্শনের অগোচরে কৃষ্ণদাস লাবণ্যর শ্বশুবকুলের সঙ্গে খুব গোপনে যোগাযোগ রাখত। কৃষ্ণদাসের পবামর্শ মেনে নিয়েছিলেন লাবণ্য। এবং নিকুঞ্জপতিকে দিনকতক দেখবার পর তাঁর মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা ঘুচে গিয়েছে। নিকুঞ্জপতি ভদ্র, বিনয়ী, সচ্চরিত্র যুবক। বুদ্ধিমানও। প্রিয়ব্রত লক্ষ করেছে, এই ক'মাসে লাবণ্যকে সে একেবারে যাদু করে ফেলেছে।

লাবণ্য পুনরায় আওড়ান কথাগুলো, 'বল্ তবে। নিকুঞ্জপতিকে বলি।' প্রিয়ব্রত চুপ মেবে শুয়ে থাকে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে লাবণ্য বলেন, 'নয়তো তোর যদি বিশেষ কারুকে পছন্দ হয়, তবে তাও বল্।' ধীরে ধীরে লাবণ্যর গলা ধরে আসে। বলেন, 'আমার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল লয় খোকা। কখন কি হয়ে যায়, তার আগে...।'

প্রিয়ব্রতর কোনও সন্দেহই ছিল না, সেই বিকেলে মা 'বিশেষ কারুকে' বলতে দীপমালাকেই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু সেদিন বিকেলে লাবণ্য যখন ঠারেঠোরে দীপমালার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তখনও ওর কোনও সন্ধান জানত না প্রিয়ব্রত। জেনেছিল আরও বছর তিনেক বাদে, যখন কনকপ্রভা একরাশ রূপ নিয়ে চলে এসেছে সিংহগড়ের বধূ হয়ে।

৩৫. খাণ্ডব দহনের প্রেক্ষাপট

মোর বাপ পতিত লায়েক ছিল এই বেদ্‌রি গাঁয়ের এক গইন্য-মাইন্য মনিষ্যি।

বিপিন লায়েক প্রতিবারেই গল্পটা ঠিক এইভাবেই শুরু করে।

বলে, আমাদ্যার বাড়ির সামনের মহুল বাগানের তলায় তখন অষ্টপ্রহর মজলিশ—।

সমবয়েসী বুড়ো-থুড়োরা তো আছেই, গাঁয়ের আধড়া-জোয়ান, কাঁচা ছগ্‌রার দল, সব্বাই মজলিশ বসায় মহুল গাছের তলায়। পতিত লায়েক প্রাচীন ব্যক্তি। কত যুগের কত কাহিনী, গাথা, তার স্মৃতিতে চিতল মাছের মতো রুপোলি পিঠ ওলটায় অবিরাম। বিষ্টুপুরের মল্ল রাজাদের গল্প...। রাজা রঘুনাথ সিংহ, বাইজি লালবাঈ, পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভার কাহিনী...। শুনতে শুনতে বুঁদ হয়ে যায় বেদ্‌রির মানুষ। বর্গীদের সঙ্গে ঠাকুর মদনমোহনের যুদ্ধের কাহিনী শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অজান্তে দু'হাত কপালে গিয়ে থামে। বৈশাখ মাসে জঙ্গলে জঙ্গলে কচি শালপাতা। ডগোমগো সবুজ। তখন লায়েক-মাদোড়দের ঘরের মেয়েদের বুঝি মরবারও সময় নেই। তখন দিনভর জঙ্গলে কেবল শালপাতা তোলার হিড়িক। দিনের শেষে কচি শালপাতার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফেরা। এ সময়টা দিনভর গাছের ছায়ায় বসে বসে পাতা ফোঁড়া চলে। শুধু বেদ্‌রি নয়, তখন জঙ্গলমহলের প্রতিটি লায়েক-লোহার-মাদোড়ের বাড়ি যেন এক-একটি পাতা সেলাইয়ের কারখানা। মাদোড়রা আবার এ কাজে বেজায় পটু। ভাত খাওয়ার পাতা ছাড়াও ওরা শালপাতা দিয়ে বাটি বানায়

চমৎকার। ঐ বাটিতে ডাল-ঝোল ঢাললেও এক ফোঁটা গলে না।

পতিত লায়েক ইদানিং আর চোখে তেমন দেখে না। পাতা ফোঁড়ার কাজ অনেকদিনই ছেড়েছে সে। শুধু বাড়ির সামনে 'কারখেনা'র পাশটিতে বসে বসে আগের দিনের গল্প বলে বলে দিন গুজরান করে সে। দিনভর পাতা সেলাই চলে নিঃশব্দে। কানজোড়া খাড়া থাকে পতিত লায়েকের দিকে।

সেদিন চলছিল নীল-কুম্পানীর গল্প। নীল সাহেবরা সারা জেলাব্যাপী জাল পেতেছে। এখানে ওখানে গড়ে তুলেছে নীলকুঠি। চাষীদের ওপর নিত্যিদিন চলছে অকথ্য জুলুম। নীল সাহেবদের নিপীড়নের ছবিটা যখন সবেমাত্র ডগোমগো করে আঁকতে শুরু করেছে পতিত লায়েক, ঠিক তখনই লক্ষ্মণ লায়েক বলে উঠল, 'হা—ভাল্, গুঁসাই আঁইছে!' লক্ষ্মণের কথায় সবাই মুখ তুলে তাকায়।

পতিত লায়েকের বাড়ি থেকে অল্প তফাতে একটা লাল কাঁকুরে রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে জগন্নাথপুরের দিকে। তারপর উত্তর-পূর্ব কোণে বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে খড়িকাশুলির ভেতর। ঐ রাস্তা ধরে গুঁসাই আসছেন জগন্নাথপুরের দিক থেকে।

এই গুঁসাই লোকটিকে এরা সবাই চেনে। আজ ক'বছর ধরে বছরে দু'তিনবার এই পথ ধরে আনাগোনা করেন। বেদরির গাঁ ঘেঁষে চলে যান। গাঁয়ের মধ্যে ঢোকেন নি কখনও। তবে কখনো সখনো বেজায় ক্লান্ত হলে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেন। লায়েকদের থেকে দড়ি-বালতি নিয়ে পাথর-কুয়া থেকে জল তুলে খান। লায়েকরা কোন কোনদিন এনে দেয় ঘরে কোটা চিঁড়ে, তালের পাটালি। সেই ভক্তির দান গ্রহণ করে গুঁসাই যেন কৃতার্থ করেন লায়েকদের। গত ক'বছর ধরে এভাবেই কাটছে। খড়দহ না কোথায় যেন বাড়ি গুঁসাই ঠাকুরের। জগন্নাথপুরের দিকে তাঁর অনেকগুলি শিষ্যমহল। বছরে দু'তিনবার এসেও নাকি সব ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে উঠতে পারেন না।

বৈশাখের তপ্ত দুপুর। কাঁকুরে মাটি যেন হাঁপর খাওয়া লোহা। আকাশ থেকে অবিরাম আগুন বৃষ্টি। এই অবস্থায় চড়াই রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁসফাঁস করছিলেন মানুষটি। উদোম শরীর ঘেমে নেয়ে একসা। মুখমণ্ডল লাল টকটকে। মোটা পৈতাখানি লেপটে গিয়েছে গায়ের সঙ্গে। দেব-দ্বিজে পতিত লায়েকের বড় ভক্তি। শুধু পতিত লায়েকই বা কেন? লায়েক-লোহার-খয়রা-মাদোড়দের মধ্যে কে এমন পাষণ্ড রয়েছে যে কিনা ব্রাহ্মণকে দেবতুল্য জ্ঞান করে না! কাজেই ক্লান্ত ঘর্মাক্তকলেবর ব্রাহ্মণকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল সবাই।

ব্রাহ্মণ এসে মহুলতলায় বসলেন। হাঁফাচ্ছিলেন। এই প্রথম বড় রাস্তা থেকে নেমে এসে বেদ্‌রি গাঁয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। ক্ষেত্র লায়েক তড়িঘড়ি পতিত লায়েকের বাড়ির রোয়াক থেকে একটা কাঠের জলচৌকি এনে নামিয়ে দিল মউলতলায়। ভোলানাথ লায়েক চটজলদি পাথরকুঁয়া থেকে এক ঘটি জল এনে ঢেলে দিল চৌকির ওপর। ক্ষেত্র লায়েকের বউ এসে নিজের অঙ্গের ময়লা কাপড় দিয়ে মুছে দিল চৌকির জল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সবাই। ব্রাহ্মণ বসলেন। গামছা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছতে লাগলেন

ঘনঘন। ভোলানাথ লায়েক ততক্ষণে আর একঘটি জল এনেছে। ঘটিখানা উঁচু করে তুলে সাবধানে জল ঢেলে দিল গোঁসাইয়ের পায়ে। তালপাতার পাখা এনে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল কৈলাস লায়েক। পতিত লায়েক গাঁয়ের সবচেয়ে প্রাচীন মুরুব্বি ব্যক্তি হিসেবে গোঁসাইয়ের সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসল।

খানিকবাদে ধাতস্থ হলেন গোঁসাই। প্রসন্ন নয়নে তাকালেন পতিত লায়েকের দিকে। ভরাট গলায় বললেন, 'এ গাঁ'টার নাম তো বেদ্‌রি?'

'হঁ, আইজ্ঞা।' জবাব দিতে পেরে যেন কৃতার্থ হয়ে যায় পতিত লায়েক। তার ফোকলা পাটিতে ছলকে ওঠে গদগদ হাসি।

চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন গোঁসাই। গ্রামখানা চারপাশের তুলনায় বেশ উঁচুতে। গাঁয়ের ডাইনে লাগোয়া গভীর জঙ্গল।

'এ জঙ্গলটার নাম কি?'

'ইটাকে বেদ্‌রির জঙ্গলই বলে, আইজ্ঞা।'

গোঁসাই মনোযোগ দিয়ে দেখলেন পতিত লায়েককে। ধীরে ধীরে অন্যদের দিকেও কৃপাসদয় দৃষ্টিতে তাকালেন। এক সময় বললেন, 'একটা আবদার নিয়ে এসেছি তোদের কাছে।'

মানুষগুলো দারুণ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে থাকে। গোঁসাই বলেন, 'বছরে দু'তিন বার দূর দূর গাঁয়ে শিষ্যবাড়ি যেতে হয় এই পথ দিয়ে। রোদে-জলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। পথে একটুখানি বিশ্রাম নেবার জায়গা পাই না। তোদেব গাঁয়ে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিবি আমার জন্য? আসা-যাওযার পথে ঐ ঘরে দু'দণ্ড জিরোতে পাবব।'

শুনে লায়েকদের বুকে খুশি আর ধরে না। এবার থেকে তাদের গাঁয়ে বছরে দু'এক দিনেব জন্যেও বাস করে যাবেন একজন ব্রাহ্মণ গোঁসাই। এ যে ভারি পুণ্যের কথা।

পতিত লায়েক ভক্তিতে নুয়ে পড়ে বলে, ' ইট্যা ত' আমাদ্যার অপার সৌভাগ্য, আইজ্ঞা। আপনার মতোন মাইন্‌ষের পদধূলি যদি বেদ্‌রি গাঁয়ে পড়ে-- ।'

গাছ থেকে পাকা মর্তমান কলা ভেঙে আনে লায়েকরা। ক্ষেত থেকে কচি শশা। বালতি-রশি নামিয়ে দেয় সামনে। গোঁসাই স্বহস্তে কুঁয়া থেকে জল তুলে মুখ হাত ধোন। পরম তৃপ্তিতে ফলাব সাবেন গাছের ছায়ায় বসে।

চাঁদা-ভ্যাদা তুলে, খড়-বাঁশ জোগাড় করে, দু'তিন দিনেব মধ্যে একটা চিমছাম কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেলল বেদ্‌রির লায়েকরা। গোঁসাইঠাকুর শিষ্যবাড়ি যাতায়াতের পথে দু'চাবদিন করে থাকতে লাগলেন ঐ ঘরে। গোঁসাইয়ের সুযোগ-সুবিধার দিকে লায়েকদের ছিল সদা জাগ্রত দৃষ্টি। চাল-ডাল-সবজি, নতুন মাটির হাঁড়ি, সবকিছু কোত্থেকে যে জুটে যেত গোঁসাই বুঝতেও পারেন না। আস্তে আস্তে গোঁসাইয়ের থাকবার মেয়াদ ক্রমশ বাড়তে লাগল। বলেন, 'তোদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে বে।' শুনে বেদ্‌রির লায়েকরা কৃতার্থ হয়ে যায়। বলে, 'থাকুন আইজ্ঞা, যদ্দিন মন চায়।'

যে ক'দিন থাকতেন গোঁসাই, প্রতি সন্ধ্যায় নাম-কীর্তন গেয়ে শোনাতেন বেদ্‌রির লায়েকদের। গাঁয়ের বুড়া-বুড়ি, জোয়ান-আধড়ার ভিড় জমে যেত গোঁসাইয়ের আখড়ায়।

গোঁসাইএর গলাটি ছিল ভারি মিষ্টি। যখন কীর্তনের পদ ধরতেন, গাইতে গাইতে বিভোর। বেদরির আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত সে সুর। লায়েকরা আপ্লুত হয়ে শুনত। শ্রীরাধিকার বিরহ বেদনা, ভক্ত সুদামের আকুতি, মা যশোদার কাহিনী,.... শুনতে শুনতে চোখের জল সামলে রাখা দায়। গোঁসাইকে তাদের আত্মার আত্মীয় বলে বোধ হত। বিদায় দিতে চাইত না সহজে। আরও দুটো দিন থেকে যাওযার জন্যে সারা গাঁ হত্যে দিত গোঁসাইয়ের আখড়ায়। বিদায় মুহূর্তে কান্নায় বুক ভাসাত বুড়ো-বুড়ির দল।

'আবার কবে আইবেন গোঁসাই ঠাকুর? কবে ফের দর্শন পাব?'

'এবারে এল্যে আর তিনটি মাস ছাড়ব নাই আপনাকে।'

লায়েকদের ভক্তির জুলুম হাসি মুখে সইতেন গোঁসাই ঠাকুর। খুব জলদি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোন গতিকে ছাড়া পেতেন।

একদিন, বেলা তখন আন্দাজ আড়াই পহর, বেদ্‌রির জঙ্গলের ভেতর থেকে পর্বত লায়েক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, 'সব্বোনাশ হয়্যেঁছে। বেদরির জঙ্গলে লাশ।'

শুনেই মুহূর্তে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে যায় লায়েকদের। শুধোয়, 'কুথায়?'

'হুই— পুড়া মন্দিরের পিছে।'

বেদ্‌রির জঙ্গলের মধ্যে কোন্ যুগের এক ভাঙাচোরা মন্দির আছে। তার মধ্যে কষ্টি পাথরের প্রমাণ সাইজের মূর্তি। শোনা যায়, ডাকাতরা কালীজ্ঞানে ঐ মূর্তিকে পুজো করে মৃগয়ায় বেরোত। ঐ মন্দিরের পেছনে মানুষের লাশ। কার লাশ, কে মারল, এই জঙ্গলের মধ্যে কি করে এল, ভেবে কূল-কিনারা পায় না বেদরির লায়েকরা। মুরুব্বিরা দল বেঁধে জঙ্গলে ঢোকে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে সবাই। চৈত্রের আগুনের মতো খবরটা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বেদরির ঘরে ঘরে। বাঁশ পাতার কাঁপন শুরু হয় লায়েকদের বুকে। কোন ঘরেই হাঁড়ি চড়ে না দুপুরে। একটা অজানা আশঙ্কা সাপের মতো পাক দিয়ে বেড়ায় নাভিমূলে। আগামী দিনগুলোকে ভয়াল মনে হয়। কী না কী সঙ্কট ঘনিয়ে আসে বেদরির লায়েকদের জীবনে। খুনের দায়টা না শেষ অবধি লায়েকদের ওপর এসে পড়ে। কারণ, বেদরির জঙ্গলটা তো বেদরির লায়েকদেরই। আমাদ্যার ঘরে এসে, খুন করে, লাশ রেখে গেল আমাদ্যার ঘরেই, আর আমরাই জানল্যম নাই? আমাদ্যার হুঁকায় তামাক খেয়্যে গেলাক অন্যে, আমার হাত দিয়েই খেয়্যে গেল্যাক্, অথচ হাতকে যখন শুধাই, হাতরে হাত, তুয়ার দ্বারা কেউ তামাক খেঁইয়ে গেল্যাক? ত' হাত বলল, আমি নাই জানি। অমন কথা বিশ্বাস করবেক কেউ? যারা জঙ্গলের মধ্যে প্রথম দেখেছিল লাশ, ভাবনায় তাদের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। পুলিশ যদি আসে, প্রথমেই তো ওদেরই জেরায় জেরায় জেরবার করে তুলবে।

মুরুব্বিদের কেউ কেউ শলা দেয়, পুলিশকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাতে যদি অপরাধটা কিছু লঘু হয়। নচেৎ পুলুশ বলবেক, তুয়াদ্যার জঙ্গল, দিনরাত জঙ্গলে কাঠ কাটছু তুয়ারা, ফল-পাকুড় পাড়ছু, অতবড় জলজ্যান্ত লাশখান দেখতেই পেলু নাই। এ কি বিশ্বাস করা যায়? নির্ঘাৎ তুয়াদ্যার মনে পাপ রইয়েছে।

থানায় যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায় বেদরিব লায়েকরা। বিবেচক কেউ থামায় ওদের। কাজ নাই থানায় গিয়ে। টিলিয়ে ক্যাঁগলাশ গায়ে তুলবাব দবকারটা কি? ওদের সমর্থন করে অন্যবাও। বাখান দেয় তাদেব, যারা থানায় যাওযাব জন্য তৈবি হচ্ছিল। বলে, ফাটকে যেত্যে পা চুলকাচ্ছে তুয়াদ্যার? আয় বাঘ, গলায় লাগ। তুয়াদ্যার হইল্যাক সেই বিত্তান্ত।

সঙ্কটে মতিভ্রম হয সহজে। বুদ্ধি-চেতনা কাজ কবে না। হে ভগবান, বিপদে বুদ্ধি জোগাও।

বিকেল নাগাদ গোঁসাইয়ের কানে কথাটা গেল। তিনি তখন ঐ গাঁয়েই অবস্থান করছিলেন। গোঁসাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছুর তত্ত্বতালাশ নিলেন। ভাবনায় কালো হয়ে এল তাঁর মুখ। তাই দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে বেদ্‌রির লায়েকরা। গোঁসাই ঠাকুরের ওপর তাদের অসীম ভরসা। এমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মানুষ বেদরি গাঁয়ে মাঝে মাঝে পায়ের ধূলো দেন, এটাই লায়েকদের চোদ্দপুরুষের সৌভাগ্যের ফল। দুনিয়ার কত বিষয়ে তাঁর কত জ্ঞান। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন তিনি। লায়েকদের মনে আশা জাগে, তাদের এই চরম সঙ্কটের দিনে গোঁসাই নির্ঘাৎ বুদ্ধি-বল-ভরসা দিয়ে রক্ষা করবেন বেদরির লায়েকদের। কিন্তু গোঁসাইয়ের কালো মুখ দেখে লায়েকদের ভয় আতঙ্ক শতগুণ বেড়ে গেল। পতিত লায়েকের সঙ্গে বেদ্‌রির সমস্ত লায়েক একসাথে লুটিয়ে পড়ল গোঁসাইয়ের পায়ের তলায়, ঠাকুর, বাঁচাও। রইক্ষা কর।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবনা-চিন্তা করলেন গোঁসাই। তারপর শুধোলেন, 'বেদ্‌রির জঙ্গলটা কাদের?'

'আমাদ্যার আইজ্ঞা।' এগিয়ে আসে পতিত লায়েক, 'আমরা, বেদ্‌রির লায়েকরা উয়ার মালিক।'

'এতবড় জঙ্গল কি করে পেলি?'

'সে ত' আইজ্‌কার কথা লয় ঠাকুর।' পতিত লায়েক প্রাঞ্জল করে বোঝায় ব্যাপারখানা, ' বিষ্টুপুরের রাজার থিক্যে জঙ্গলটা সাড়োয়ালি পেইয়েঁছিল্যাক আমার ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দার ছিল ছ'ব্যাটা। আর আমার বাপ-জ্যাঠাদের সাকুল্যে উনিশ ব্যাটা। ইখন আমরা লায়েকরা যে একাশি ঘর থাকি ইখ্যেনে, সক্কলেই বেদ্‌রির জঙ্গলের মালিক বটি।'

পতিত লায়েকের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন গোঁসাই। চোখ মুদে ভাবছিলেন। একটুবাদে খুব চাপা গলায় বললেন, 'বাঁচবার একটা মাত্র উপায় আছে।'

আশায় আশায় চাতকপাখির মতো তাকিয়ে থাকে বেদ্‌রির লায়েকরা। গোঁসাই ধীরে সুস্থে রায় দেন, 'পুলিশ এলে তোরা সবাই বলবি, এ জঙ্গল আমাদের নয়। আমরা কখনো এ জঙ্গলে ঢুকি না। জঙ্গলের মধ্যে লাশের খবরও আমরা জানি না।'

এত আতঙ্কের মধ্যেও অবাক হয়ে যায় বেদরির লায়েকরা। জঙ্গলটা আমাদ্যার লয়? এমন কথাটা বলতে হব্যেক? উই জঙ্গলটাই তো বেদ্‌রির লায়েকদের মা-বাপ আইজ্ঞা। উট্যাকে ছেইড়ে বেদ্‌রির লায়েকরা বাঁচবেক?

'কি আশ্চর্য।' গোঁসাই সামান্য বিরক্ত হন, 'জঙ্গলটা কি সত্যি সত্যিই তোদের থাকছে না নাকি? এ-তো শুধু মুখে কবুল করা। চরম সঙ্কটের সময় এটুকু কৌশলের আশ্রয় নিতেই হয়।'

অনেকক্ষণ ধরে গোঁসাই বোঝালেন ওদের। হু-হু করে কেঁদে ফেললেন এক সময়। বললেন, 'তোদের যদি ভাল-মন্দ একটা কিছু হয়ে যায়, আমার বুকের পাঁজরগুলো ভেঙে যাবে।'

বেদ্‌রির লায়েকরা বিলক্ষণ বোঝে সেটা। কিন্তু তবুও ওরা ইতস্তত করতে থাকে। 'মিছা কথা বইল্‌ব ঠাকুর? আমরা লায়েক জাত মিছা কথা নাই কই।'

গোঁসাই মিষ্টি হাসেন। স্নেহের হাসি। প্রশ্রয়ের হাসি। বলেন, মিথ্যে বলা পাপ, সেটা কি এই বয়েসে তোদের কাছে শিখতে হবে রে? সে আমি জানি। কিন্তু শাস্ত্রের কতটুকু জানিস তোরা? শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখেছে, আত্মরক্ষার্থে মিথ্যে বললে কোনই দোষ নেই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির-মিছিমিছি বলেন নি যে অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে? গল্পটা নতুন করে শোনান গোঁসাই।

অতঃপর বেদ্‌রির লায়েকরা শিরোধার্য করে নেয় গোঁসাইয়ের শলা।

৩৬. লুণ্ঠনের আদিম কৃৎ কৌশল

দিন দুই বাদে, তখনও সূর্যের আলোয় তেমন করে রঙ ধরেনি, জঙ্গলের গাছগাছালির চূড়োয় কেবল হাল্কা সোনালি ছোপ পড়েছে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে গাঁয়ে ঢুকল রাইকিশোর লায়েক। সে গিয়েছিল জঙ্গলের ধারে বাহ্যি বসতে। রাইকিশোরের দৌড় দেখে মুহূর্তে কালো হয়ে আসে বেদরির লায়েকদের মুখ। মনে মনে প্রমাদ গোনে ওরা। পলকের মধ্যে জমে যায় রাইকিশোরের চারপাশে।

রাইকিশোর লায়েক কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছিল। কথা বলতে পারছিল না। বুকখানা ওঠানামা করছিল হাঁপরের মতো। সারা শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল যেন মা-গঙ্গার পানি। কিছু বলতে চেষ্টা করছিল রাইকিশোর লায়েক। কিন্তু হাঁপানির চোটে পারছিল না। ওদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে জমায়েত। তারা আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। বারংবার ঠেলা মারছে রাইকিশোরকে। বল্‌, বল্‌, কি ঘইটেছে, বল্‌।

এক সময় রাইকিশোর বহুকষ্টে উচ্চারণ করল, পুলুশ।

পুলিশের নামে লায়েক-লোহার-খয়রা-মাদোড়দের প্রাণে চিরকালই বাঁশ পাতার কাঁপন জাগে। পুলিশ দেখলেই জঙ্গলের মধ্যে সেঁধায় যত পুরুষ, আর মেয়েরা ঘরে কোণে সেঁধিয়ে দরজায় খিল দেয়। সেদিন কিন্তু পতিত লায়েক বহুকষ্টে নিরস্ত করেছিল সবাইকে। পুলিশের সামনে গোঁসাইয়ের শেখানো কথাগুলিই বলেছিল তোতাপাখির মতো। লাশ নিয়ে পুলিশবাহিনী ফিরে গিয়েছিল বিকেল নাগাদ।

খুনী ধরা পড়েছিল অন্যত্র। তাই, পুলিশ আর বেদ্‌রির লায়েকদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করে নি। কিন্তু বাঘ খেদিয়ে সেই জায়গায় ঘোঘের আমদানি হয়েছিল। কিছুদিন বাদে 'সিটেলমেন্ট' এল দেশে। গোঁসাই সুযোগ বুঝে স্মরণ করিয়ে দেন কথাটা, 'দেখিস, সরকারী লোকের কাছে যেন ঘুণাক্ষরে বলে ফেলিস নে যে জঙ্গলটা তোদের। দু'দিন আগের বয়ান মিথ্যে প্রমাণ হলে তোদের আর রক্ষা থাকবে না।' ভয়ে-তরাসে বেদ্‌রির লায়েকদের এবারও কবুল করতে হল সেই একই কথা। লয় আইজ্ঞা. এ জঙ্গলটা আমাদের লয় বটে। গোঁসাই তখন

দারুণ ব্যস্ত। বেদ্‌রির লায়েকদের স্বার্থে সে অষ্টপ্রহর ঘোরাঘুরি করছে সেটেল্‌মেন্ট ক্যাম্পের পাশাপাশি। বেদ্‌রির লায়েকদের জন্য তদবির-তদারকির বুঝি অন্ত নেই তার।

বছরটাক বাদে বেদরির লায়েকরা পেল কোর্টের হুকুম। সারা বেদ্‌রির জঙ্গল গোঁসাইয়ের রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি। কোনও লায়েক যেন খবরদার বেদ্‌রির জঙ্গলে না ঢোকে। কিংবা গোঁসাইকে জঙ্গলের দখল নিতে বাধা না দেয়। শুনে তো আকাশ ভেঙে পড়ে বেদ্‌রির লায়েকদের মাথায়। ছুচ হইয়েঁ ঢুকে, ফাল হইয়েঁ বারালে হে গুঁসাই।

এই নিয়ে লড়াই চলেছিল দীর্ঘকাল। কোর্টকাচারি-মামলা। গোঁসাই জঙ্গলটার দখল নেবার চেষ্টা করেছে বহুবার। লাঠির ডগায় তার জবাব দিয়েছে বেদ্‌রির লায়েকরা। মামলা হয়েছে। পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গেছে মুখ্য মুখ্য লায়েকদের। চালান দিয়েছে কোর্টে। খালাস পেয়েই আবার জমে উঠেছে লড়াই। এর মধ্যেই জঙ্গলের টুকরো টুকরো অংশ অনেক 'দিকু'কে বিক্রি করে দিয়েছে গোঁসাই। ওর নিজের দলে লোকবল বেড়েছে তাতে। লায়েকদের শত্রু বেড়েছে সংখ্যায়। অবশেষে, বহুদিন মাল্লি-মামলা, লড়াই চালিয়ে এক সময় থকে গিয়েছে বেদ্‌রির লায়েকরা। এতগুলো 'দিকু'র সম্মিলিত আক্রমণের মুখে কতদিন আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

'কোকিলদা গ—।' বিপিন লায়েকের মুখে ম্লান ছায়া ভেসে বেড়ায়, 'বেদ্‌রির লায়েকদের একদিন সব ছিল। জমিন-ডাঙা-জঙ্গল, গাই-বাছুর-কাঁড়া.., কিন্তু মগজে বুদ্ধিটা ছিল নাই একতিল। আর সিট্যাই হইল্যাক লাযেক জাতের মরণের কারণ। এক সিটেলমেন্টে আমাদের বারো আনা জমিন-জঙ্গল রেকর্ড কইর‍্যে লিয়েছে দিকুরা। বাকি যে টুকচান ছিল,- মামলা চালাতেই ফতুর।'

প্রিয়ব্রত মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল সিংহবাবুদের ভূমি-লুণ্ঠনের কলা-কৌশলগুলি। তাও প্রিয়ব্রত বলে, 'মামলাটা শেষ অবধি চালালে না কেন? জয় তোমাদের হতই।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বিপিন লায়েক। বলে, 'অতগুলান 'দিকু'র সাথে মামলা চালাবার খচ্চা কত। কোর্টের কাগজ কিনতেই ভুট হইয়েঁ গেল্যম।'

তাছাড়া, মামলা চলাকালীন কিছু গরীব লায়েককে দু'এক টুকরো জমি বিলিয়ে হাত করে নিয়েছিল গোঁসাইরা। ওদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে দিয়েছিল হাজার কৌশলে।

'দাদন-কর্জ, টিপ-ছাপ, কত অস্ত্রই না দিকুদের হাতে।' বিপিন লায়েকের সারা মুখ তিক্ত হাসিতে ভরে যায়, 'আমাদ্যার গোরিবদের বহুৎ দোষ। প্যাটে আগ্‌ জ্বললে ইহকাল-পরকাল ভুইল্যে যায়।'

বারবার 'দিকু' শব্দটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল প্রিয়ব্রতকে। উচ্চবর্ণের যে সমস্ত ভূমি-লুটেরাদের 'দিকু' বলে সম্বোধন করে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা, সে নিজেও যে ওই সম্প্রদায়েরই মানুষ। এই মুহূর্তে নিজেকে ভারি অপরাধী মনে হয় প্রিয়ব্রতর। লায়েকদের চোখের কোণে তার প্রতিও কি ফুটে উঠেছে সমান পরিমাণে ঘৃণা এবং ক্রোধ। বুঝতে পারে না প্রিয়ব্রত। তবে এ বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ নেই যে, বিপিন লায়েক যে কাহিনী শোনাল

এতক্ষণ, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এই ক'বছরে, জয়পুর থেকে গড়বেতা, পুরো জঙ্গল মহলটা ঘুরে ঘুরে এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। সর্বত্রই লোহার-লায়েক-খয়রা-মাদোড়-বাউরি-বাগদি-সাঁওতাল-খেড়িয়াদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের জমি-জিরেত-জঙ্গলগুলোকে তিল তিল গ্রাস করে নিয়েছে উচ্চবর্ণের চতুর মানুষের দল। শুধু চুয়ামসিনার সিংহবাবুরাই নয়, প্রতিটি এলাকায় এমন ডজন ডজন সিংহবাবু যুগ যুগ ধরে এমনই অভিনব উপায়ে ভূমি-লুণ্ঠনে রত।

মৃগয়ার নিয়ম-কানুন বুঝি সর্বত্রই এক।

৩৭. দহন পর্বের ইতিবৃত্ত

প্রিয়ব্রতর চেতনা ছিল না পুরোপুরি। আধো নিদ্রায় আধো জাগরণে মগজের মধ্যে কিলবিল করছিল কত দুঃস্মৃতি, দুঃস্বপ্ন। আচমকা নরম হাতের ছোঁয়ায় তন্দ্রা ভাবখানা ভেঙে গেল। চোখ বন্ধ অবস্থায় তার চকিতে মনে হল, কেউ খুব সন্তর্পণে হাত ছুঁইয়েছে প্রিয়ব্রতর কপালে। খুব স্নেহময় গলায় ডেকে চলেছে, ছোটবাবু, ছোটবাবু।

চোখদুটো কিছুতেই খুলতে পারছিল না প্রিয়ব্রত। মনে হচ্ছিল স্নেহময় ডাকখানা যেন ভেসে আসছে কোন্ সুদূর থেকে। দূর থেকে শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণাটি যেমন অস্পষ্ট, মায়াবী...। প্রিয়ব্রত চোখদুটি খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু মাথার ওপরে যেন দশ মন বোঝা। কপালের রগদুটো বুঝি ফেটে যাবে। আর চোখের পাতাদুটো হয়েছে হাতির কানের মতো ভারী। প্রিয়ব্রত তাও অনেক কষ্টে আধো চোখ খুলল। দেখল, পরীক্ষিত বাউরির ছোট মেয়ে অগ্নি। একুশ বাইশ বছরের যুবতী। এক বাচ্চার মা, কিন্তু এমনই রোগা পাতলা গড়ন, মনে হয় পনের বছরের কিশোরী, বসে রয়েছে প্রিয়ব্রতর একান্ত পাশটিতে। পাশে বসান রয়েছে একখানা ঝকঝকে কাঁসার বাটি। প্রিয়ব্রত লক্ষ করে, অগ্নির গাঢ় দুটি চোখে উথলান দুধের মতো উৎকণ্ঠা এবং করুণা। মেয়েটার কপালটাই ফাটা। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছরের মাথায়। স্বামীটা ছিল মদ্যপ, লম্পট। দু'বছর সংসার করেছিল মেয়েটা। তারপরই স্বামী ওকে তাড়িয়ে দেয়। অগ্নি তখন পোয়াতি। বাপের ঝোপড়িতেই আশ্রয় নেয় সে। খাটাখাটা করে পেট চালায়। পরীক্ষিত বাউরির ঘরে থাকবার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই কোন কালেই। বুড়ো নিশান বাউরির মাথার ঠিক নেই। বিড়বিড়িয়ে ভুল বকে দিনভর। সহায় সম্বলহীনা অনাথা মেয়েটাকে নিয়ে শেয়াল-শকুনদের কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রিয়ব্রত তখন ভীষণ অসুস্থ। সিংহগড়ে শয্যাশায়ী। পরীক্ষিত অগ্নিকে সিংহগড়ে বহাল করে প্রিয়ব্রতকে দেখাশোনা করবার জন্য ইদানীং প্রায় সারাদিনই প্রিয়ব্রতর পাশটিতে থাকে অগ্নি।

দুধ কিংবা বার্লি জাতীয় কিছু এনেছে অগ্নি। কনকপ্রভাই পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে। তার শুকনো ঠোঁটদুটো বারংবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। ডাইনে-বাঁয়ে বার দুই মাথা নেড়ে সে ফের বন্ধ করে চোখ। বিড় বিড়িয়ে শুধোয়, 'পরীক্ষিতদা কোথায়?'

'শেষ রাতে কুথা যেন বারাঁই গেঁইছে।' আলগোছে জবাব দেয় অগ্নি, 'বইলে গেঁইছে, সইন্ধ্যার পর ফিরবেক। তুমি বার্লিটা খাও।' মিনতি ঝরে পড়ে অগ্নির গলা চিরে, 'আজ তিনদিন কুটাটি অব্দি দাঁতে কাট নাই।'

প্রিয়ব্রত নড়ে-চড়ে না, জবাব দেয় না। তার সারা শরীর জুড়ে তীব্র প্রদাহ চলছে, যেন হাজার বৃশ্চিকের দংশন। মগজের মধ্যেটা যেন ফেঁসে যাওয়া ঢাকের মধ্যে ভীমরুলের বাসা। প্রিয়ব্রত দাঁতে দাঁত চেপে তার শরীরের অন্তর্গত তীব্র যন্ত্রণাগুলিকে সহ্য করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অগ্নি প্রিয়ব্রতর কপালে তার আর্দ্র হাতখানি রাখে। বলে, 'ইস্, গা যে বেজায় পুইড়্ছে গ।'

অগ্নির গলার স্বরে গাঢ় আশঙ্কা ছিল। কপালে তার নরম হাতখানি বড়ই সুখকর ছিল। কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে অগ্নির শেষ কথাগুলো তৎক্ষণাৎ প্রবলভাবে সংক্রামিত হয় প্রিয়ব্রতর মধ্যে। শরীরটা তার নাকি বেজায় পুড়ছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে অগ্নির উচ্চারিত শব্দ ক'টাকে ঠোঁটের ডগায় ক্রমাগত নাচাতে থাকে প্রিয়ব্রত। এক নাগাড়ে বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করে চলে শব্দগুলি। শরীরখানা বেজায় পুড়ছে। বেজায় পুড়ছে। বেজায় পুড়ছে...। শব্দগুলোকে নাচাতে নাচাতে ক্রমশ অন্দর মহলের দিকে নিয়ে চলে প্রিয়ব্রত। থাপনা করে বুকের মধ্যে। শরীরখানা বেজায় পুড়ছে। তার তলায় মনখানাও পুড়ছে। পুড়ে পুড়ে দগ্ধ হচ্ছে। কতদিন, কত যুগ ধরে ক্রমান্বয়ে চলছে এই দহন প্রক্রিয়া..., প্রিয়ব্রতর স্মরণ করতেও কষ্ট হয়। সেই কৈশোরকাল থেকে, নাকি, তারও পূর্বে কোনও এক নিষ্পাপ শৈশব মুহূর্তে শুরু হয়েছিল এই দহনপর্ব, প্রিয়ব্রতর মনে নেই।

চুয়ামসিনার সিংহগড় থেকে যে রাস্তাটা জয়রামপুরের দিকে চলে গিয়েছে, ওরই একটা নির্জন অংশে মাঝ রাস্তার ওপর একটা রুপোর টাকা ফেলে দিয়ে সুদর্শন সপারিষদ লুকিয়ে রইলেন ঝোপের আড়ালে। একটু বাদেই শিকার পড়ল ফাঁদে। পথ চলতি মধু গোপ আচমকা দেখতে পায় টাকাটা। খুব ভেবে চিন্তে নয়, একেবারেই তাৎক্ষণিকভাবে ডান হাতখানি নেমে যায় যন্ত্রবৎ। রুপোর টাকা উঠে আসে মধু গোপের হাতের তালুতে। বিস্মিত মধু গোপ দু'চোখের মণি জ্বালিয়ে দেখতে থাকে মুদ্রাটি। এদিক ওদিক তাকায়। গাঁ'ছাড়া এই রাস্তায় কেউই নেই কাছে পিঠে। পুরো এলাকা একেবারে শুনশান। টাকাটি ট্যাকে গুঁজে যেই না সে পা বাড়াল সুমুখ পানে, অমনি রাস্তার দু'দিকের ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে হৈ-হৈ করে ওকে ঘিরে দাঁড়ায় লগদির দল। এবং পর মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে সপারিষদ আত্মপ্রকাশ করেন সুদর্শন সিংহবাবু। মধু গোপের সারা শরীর জুড়ে ততক্ষণে শুরু হয়েছে বলির পাঁঠার কাঁপন।

পার্শ্ববর্তী আমবাগানের গাছের তলায় বসল বিচার সভা। সুদর্শনের সামনে পেশ করা হল আসামীকে। লগদিরা ছুটে গিয়ে পদমপুকুরের পাড়ের বাঁশ ঝাড় থেকে ভেঙে আনল পাকা বাঁশের কঞ্চি।

'ট্যাকাটা চুরি কইর্‌লি কেন?' কঞ্চি নাচাতে নাচাতে শুধোলেন সুদর্শন।

'চুরি করি নাই আইজ্ঞা।' দু'কানে হাত ছুঁইয়ে বলে ওঠে মধু গোপ, 'রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে ছিল হুজুর।'

'রাস্তাটা কার বটে?'

'রাজার বটে।'

'রাজাটি কে বটে?'

নিজের অপরাধের ব্যাপ্তিটুকু ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে মধু গোপ। ভীত খরগোসের দৃষ্টিতে তাকায় সুদর্শনের দিকে।

সেদিন পরপর তিনখানা বাঁশের কঞ্চি মধু গোপের পিঠে অবলীলায় ভেঙে তবে থেমেছিলেন দাদু। প্রিয়ব্রত অনেক ভেবে দেখেছে, মানুষকে উৎপীড়ন করে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পেতেন সুদর্শন। শুধু সুদর্শনই নয়, প্রিয়ব্রত সে আনন্দের অংশীদার হতে দেখেছে সিংহবাবু বংশের অধিকাংশ মানুষকে। সুদর্শনের হুকুমে যখন পরীক্ষিত বাউরির বাপ নিশান বাউরিকে চোবানো চলছে পদম পুকুরের জলে, কিংবা নিজের মল খেতে বাধ্য করা হচ্ছে ভরত শিকারিকে, অথবা সপাসপ বেত পড়ছে চম্পক লোহারের পিঠে, প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করেছে, সুদর্শন সিংহবাবুর সঙ্গে সঙ্গে সে উল্লাস চারিয়ে গিয়েছে প্রতাপলাল কিংবা হরবল্লভের মধ্যেও। অন্য হাজারো বিষয়ে ওঁদের মধ্যে যতই না কেন বৈরীভাব থাক, প্রজাপীড়নের ব্যাপারে ছিল শতকরা একশ ভাগ সমর্থন। ঠিকই হয়েছে, শালাদের সাহস দিন-কে-দিন বাড়ছে। ইট্যাই শালাদ্যার আসল ওষুধ। প্রিয়ব্রতও সিংহগড়েরই একজন, সিংহগড়েই ওর জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সে সিংহবাবু বংশের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীও বটে, কিন্তু সিংহবাবুদের এবংবিধ পীড়ন-উৎসবে কোন দিনও নিজেকে সামিল করতে পারেনি। বরং পীড়নের আসরে সিংহগড়ের নায়েব-গোমস্তার দলও যখন নিজেদের উত্তমর্ণ জ্ঞানে সে উল্লাসের অংশীদার হয়েছে, ওর বুকের মধ্যে এক অবিরাম অচেনা মোচড়। দুঃখে, পরিতাপে, কখনও বা রোষে, প্রতিহিংসায় কেবলই দগ্ধ হয়েছে সে, এবং প্রতি মুহূর্তে তিল তিল অনুভব করেছে, এ উৎসবে সে কোনও উত্তমর্ণ নয়, অংশীদারও নয় এ ব্যসনের, বরং প্রকৃত অর্থে ওর অবস্থান, তা সে যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, পীড়িতদেরই পাশাপাশি। হয়ত শারীরিকভাবে এমন পীড়নজনিত যন্ত্রণা প্রিয়ব্রতকে ভোগ করতে হয় নি কখনই, হবেও না আগামী দিনগুলিতে, কিন্তু মানসিক দিক থেকে ঐ প্রহার ওর অঙ্গেও কি করে যেন আঘাত করে। অদৃশ্যচারী সেই আঘাত প্রিয়ব্রতর পিঠকে দৃশ্যত রক্তাক্ত করে না ঠিকই, কিন্তু গভীর মর্মমূলে সেই রক্তপাত দীর্ঘ সময় ধরে চলে, তার ক্ষতও হয় অনেক গভীর, জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী। কারণ প্রিয়ব্রত তো জানে, কর্মের ফেরে সিংহগড়ে আজীবন আশ্রয় পেলেও, নিশান, ভরত কিংবা হরিদাস বাউরিদের মতো কিছু মানুষকে চাবকাতে চাবকাতে এরা যে শ্রেণীটিকে সায়েস্তা করবার সুখ উপভোগ করে, সেও আসলে, সেই গোত্রেরই একজন। এটা কোনও ভাবাবেগের কথা নয়, এটা সত্যি। আশৈশব সে তিলতিল তেমন প্রমাণ পেয়েছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই প্রিয়ব্রত লক্ষ করেছে, এই গড়ের বাসিন্দারা এমন কি নায়েব-গোমস্তা, পুরোনো দাস-দাসীর দলও ওর হাঁটা-চলা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সাধ-আহ্লাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কখনও ঠাট্টা-মস্করার ছলে, কখনও বা গম্ভীর-মুদ্রায় বার বারই এক ধরনের তুলনা টেনে এনেছে, জমিদারী উষ্ণরক্তের সঙ্গে কাচকলা-আতপচালভোগী টোলো-পণ্ডিতের রক্তের তুলনা। মনে আছে, সিংহগড়ের এক অতি প্রাচীনা দাসী, প্রিয়ব্রত যাকে একাদশী-পিসি বলে ডাকত, রোজ ওকে তেল মাখিয়ে দেবার সময় বলত, রোজ তেল মাখাই, তবো ক্যামুন খসখস্যা চাষাড়ে গা। অ নৈতন-বউ (প্রিয়ব্রতর দিদিমা সরযূবালাকে সে ওই

নামে ডাকত) তুমার লাতি বড় হইয়েঁ টিকি রেইখ্যে, টোল চালাবেক। গায়ে তেল ভ্যাদে না এ ছেইলার। প্রিয়ব্রত দুধ খেতে চাইত না ছেলেবেলায়, তাই দেখে একাদশী পিসি বলত, তা সইবেক ক্যানে? আতপ চাল আর কাচকলা দাও, গপগপাই খেইয়েঁ লিব্যাক। এ বংশের ছেইলারা সব দুধ দিয়ে আঁচাত. আর এ ছেইলা দুধ দেইখ্‌লে ভিরমি খায়। প্রিয়ব্রত চিরকালই কঞ্চির মতো ছিপছিপে রোগা। তাই নিয়েও একাদশী-পিসি মস্করা করতে ছাড়ত না। বলত, অ লাবণ্য, তুয়ার ব্যাটা যে হাওয়ায় উড়ে রে। খেইতে চায় না, খেইলে হজম কইর্‌তে লারে, ইয়ার শরীর স্বাস্থ্য হব্যেক কি কইর‍্যে। সিংহবাবু বংশের ছেইলা, এ বইসে এক সের মারা দুধ খাব্যেক, আধসের মাংস, আধপুয়া রাবড়ি, এক-কট্‌রা ঘি, হাঁটবেক যখন, যেন শমন হাঁইট্‌ছে, ঘোড়ার পিঠে চাইপ্যে বুসলে, ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ পাহাল পাড়বেক। তুয়ার ছেইলা ঘোড়ায় চইড়্‌তেও লারবেক, বন্দুক চালাতেও পারবেক নাই। কুষ্ঠী-ঠিকোজিতে আঁক কষা ছাড়া উয়ার আর কুনো গতি নাই। ঠাট্টা করেই একাদশী-পিসি বলত এসব, অল্পাহার ও শীর্ণ স্বাস্থ্যের দরুন স্নেহজনিত আশঙ্কা থেকেই বলত। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কেন জানি মনে হত, একাদশী মনে মনে সেটা বিশ্বাসও করত। প্রায় প্রতি বিকেলেই দাদুর খাস চাকর সনাতন শিকারির পিঠে চড়ে 'ঘোড়ায় চড়া' খেলা খেলতে হত প্রিয়ব্রতকে। সনাতন শিকারি হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদ হত, প্রিয়ব্রত চড়ত ওর পিঠে। সারা উঠোন ওকে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সনাতন। দাদু সে সময়টা সদরের উঁচু বারান্দায় আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে শ্বেত পাথরের গেলাসে ঘন করে মারা দুধ খেতেন। দুধ খেতে খেতে উপভোগ করতেন প্রিয়ব্রতর ঘোড়ায়-চড়া খেলা। সনাতন শিকারির বয়েস তখন ষাটের ওপার। প্রিয়ব্রতকে পিঠে নিয়ে চারপায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে অল্প সময়ের মধ্যেই হাঁসফাঁস করত। পিঠে বসে বসেই প্রিয়ব্রত অনুভব করত ওর হৃদপিণ্ডের দ্রুত ওঠানামা, শুনতে পেত ওর দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। প্রিয়ব্রতর রোগা শরীরখানার ভারেও ওর শিরদাঁড়াখানি ধনুকের মতো বেঁকে যেত। প্রিয়ব্রত নেমে পড়তে চাইত। কিন্তু দাদুর ভয়ে কিছুতেই নামতে পারত না। প্রিয়ব্রতর বিশ্বাস, দাদু খুব নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারতেন, সে সনাতন শিকারির প্রতি করুণা বশতই নেমে পড়তে চাইছে। ওকে ছেড়ে দাদু ধমক লাগাতেন সনাতনকেই, তুই যে কাছিমের পারা চলছু রে সনাতন। অমন হাঁটল্যে বাচ্চারা মজা পায়? সনাতন সহসা শরীরের সমস্ত শক্তি, ফুসফুসের তাবত দম একত্র করে হাঁটার গতিটা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। প্রিয়ব্রত দেখেছে, ঐ বয়েসেও দাদু মাঝে মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে মহালে যেতেন। ও গড়ের প্রতাপলালও নিয়মিত ঘোড়ায় চড়ে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়া এ বংশের প্রতিটি পুরুষের আভিজাত্যের অংশ ছিল। প্রিয়ব্রত এও জেনেছে, এ বংশের প্রতিটি পুরুষ তার শৈশবে, কৈশোরে এমনি এক মানুষ-ঘোড়ার পিঠে দাপিয়ে বেড়িয়েছে যতক্ষণ মজা পেয়েছে ঐ খেলায়। মানুষ-ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঠিক বয়স্কদের অনুকরণে দু'পায়ের ঠোক্কর মেরেছে বাহকের পেটের দু'পাশে। এমনি করেই ঘোড়ায় চড়বার ইচ্ছেটা ধীরে ধীরে চারিয়ে গেছে ওদের রক্তে। প্রিয়ব্রত যে কেন সে খেলায় মজা পায় না, সেই ভাবনায় সুদর্শন সিংহবাবুকে ম্রিয়মান দেখেছে প্রিয়ব্রত কতবার। কতবার তিনি ওর কচি দেহখানা বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করতে করতে শুধিয়েছেন, দাদু, তুমি সনাতনের পিঠে চড়ে

'ঘোড়ায়-চড়া' খেল নি কেন? প্রিয়ব্রত প্রত্যেকবারই সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছে। মনে মনে বলেছে, মানুষের পিঠে সওয়ার হতে আমার ভাল লাগে না। মুখ ফুটে দাদুকে অবশ্য বলতে পারে নি কথাটা। না বললেও, প্রিয়ব্রতর বিশ্বাস, দাদু বুঝতে পারতেন ওর মনের কথাগুলো। কিন্তু সে জন্যে ওকে তিরস্কার করেন নি কোনদিন। কিন্তু প্রিয়ব্রতর বাবা শঙ্করপ্রসাদকে তিনি ক্ষমা করেন নি তা বলে। যে অপরাধের জন্য প্রিয়ব্রত ছাড়া পেয়েছে, শঙ্করপ্রসাদ কিন্তু সে জন্যে মার্জনা পান নি একটুও। ঘোড়ায় চড়তে ও কোন দিনও দেখে নি বাবাকে। ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না তিনি। সেজন্য সারা জীবন তাঁকে কম গঞ্জনা সইতে হয় নি। একবার, প্রিয়ব্রত তখন বছর পাঁচেকের শিশু, দাদুর কঠোর নির্দেশে একদিন ঘোড়ায় চড়তেই হল বাবাকে। আনাড়ি সওয়ার পেয়ে দু'কদম না যেতেই বাবাকে এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দিল ঘোড়া। উপস্থিত সকলের কী অট্টহাসি, এমন কি রুদ্র শিকারির ছেলে কালো শিকারি, যে সিংহগড়ের ঘোড়া দেখাশোনা করত, সেও। দাদু সদর মহলের উঁচু বারান্দায় সপারিষদ বসে তেতো হেসেছিলেন। পারিষদরা বলেছিল, এ হইল্যাক অনভ্যাসের ফোঁটা, চড়্ চড়্ করবেকই। দাদু হজম করেছিলেন পারিষদদের খোঁচা। সন্ধেবেলায় তেতলার ছাদে দিদিমাকে বলেছিলেন, ছুঁচাকে গোলাপ জলে সিনান করালেও উয়ার গন্ধ যাবেক নাই, দাঁড়কাককে সোনার খাঁচায় রাইখ্‌লেও সে ময়না হবেক নাই। ঐ বয়েসেও কথাটার মর্মার্থ বুঝে নিতে প্রিয়ব্রতর তিলমাত্র অসুবিধে হয় নি। জমিদারী চালাতে গিয়ে শঙ্করপ্রসাদ সামান্য উদারতা দেখিয়ে বসলে, কিংবা কোনও রাজকীয় কূট চক্রান্ত শঙ্করপ্রসাদের পছন্দ না হলেই ক্ষেপে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন সুদর্শন। দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন, তুমি টোল-পণ্ডিতের ব্যাটা, উসব তুমার মাথায় ঢুকবেক নাই। বাবাকে প্রিয়ব্রত চিরকালই এক আপনভোলা, নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলেই চেনে। তাঁর প্রতি, সেই ছেলেবেলা থেকে, ওর যত না শ্রদ্ধা, তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল করুণা। ওঁর ওপর দাদুর জুলুম যতই বাড়ত, প্রিয়ব্রতর মমতা এবং করুণাও বেড়ে যেত ততই। যেন সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালা। দুঃশাসন যত কাপড় টানছে, শ্রীকৃষ্ণ তার দ্বিগুণ কাপড় ছাড়ছেন। সিংহগড়ে রাধামাধবের মন্দিরের বারান্দায় সারি সারি বাঁধানো ফটোর একটি ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। ওটা দেখতে দেখতেই হয়ত বা তেমন ভাবনার জন্ম প্রিয়ব্রতর মনে। ছেলেবেলা থেকেই রামায়ণ-মহাভারত ওর বুকের মধ্যে জমাট হয়ে বসেছিল। নিজেকে ঐ দুটি মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্রে কল্পনা করত। প্রিয়ব্রতর বিপরীতে যারা থাকত তাদের মধ্যমণি সর্বদাই সুদর্শন সিংহবাবু। তিনি রাবণ হলে প্রিয়ব্রত রাম। তিনি কংস হলে প্রিয়ব্রত কৃষ্ণ, শঙ্করপ্রসাদ বসুদেব। আবার অপমান এবং সম্ভ্রমহানির ক্ষেত্রে শঙ্করপ্রসাদ হয়ে যান দ্রৌপদী, প্রিয়ব্রত শ্রীকৃষ্ণ এবং সুদর্শন, বলাই বাহুল্য, দুঃশাসন। আসলে, মনের মধ্যে সেই শিশুকাল থেকে একটি রণক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে প্রিয়ব্রত। সেই রণক্ষেত্রে সর্বদাই তার প্রতিপক্ষ হল সিংহগড়, তার মানুষজন, তার ঐশ্বর্য, আভিজাত্য, কেতাকায়দা, অহংকার আর নিষ্ঠুর প্রক্রিয়াগুলি। এই সব দৃশ্য ও অদৃশ্য উপাদানগুলি ওর মধ্যে যে এক অন্তর্বাহী বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, সেটা যে জ্ঞানে-অজ্ঞানে নির্গমন পথ খুঁজে মরছে এতকাল, সেটা প্রিয়ব্রত টের পেল, যখন শ্যামদার পিছু পিছু হাজির হল যুগান্তর দলের অন্তর-বৃত্তে। সারা শরীর জুড়ে শুরু হল

এক আশ্চর্য অপ্রতিরোধ্য প্রদাহ, যাকে এই বয়েসে এসে তুলনা করতে পারে জ্বালামুখসন্ধানী টগবগে লাভাস্রোতের সঙ্গে। প্রসূতির শেষ পর্যায়ের প্রসববেদনার সঙ্গেও তার তুলনা করা যায় বুঝি। সে উন্মাদনা, প্রিয়ব্রত খুব জোর দিয়ে বলতে পারে, প্রথম পর্বে ঠিক দেশপ্রেম ছিল না। তখন ওর মধ্যে নিশ্চিতভাবেই কাজ করছিল অন্য এক অনুভূতি। সেই অনুভূতির জন্ম ঘটেছিল সেই শিশুকালে, কিন্তু ঐ বয়েসে তাকে ঠিক ঠিক চিনে উঠতে পারে নি সে। ক্রমশ তাকে চিনেছে, এ ঠিক দেশ প্রেম নয়, রাজদ্রোহও নয়, এ আসলে রাজদ্রোহের নামে সিংহগড়ের সবকিছুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং দ্রোহ ঘোষণা এবং নিজের, নিজের শ্রেণীর স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ। ঐ বয়সে প্রিয়ব্রত বুঝেছিল, সিংহগড় যদি শাসন-শেকলের একপ্রান্ত হয় তো থানা, মহকুমা, জেলা প্রশাসন ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার অপর প্রান্তে ইংরেজ শাসককুল। দাদুর ইংরেজ-প্রীতি প্রিয়ব্রত খুব কাছ থেকেই দেখেছে, স্বদেশীদের প্রতি ততোধিক ঘৃণাও। সারা দেশ যখন ইংরেজ বিরোধিতায় টগবগ করে ফুটছে, দাদু তখন তাঁর এলাকায় ইংরেজদের সবচেয়ে নিকটজন এবং ওদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত। কাজেই শ্যামাদার সঙ্গে যুগান্তর দলের গুপ্ত আস্তানায় যাওয়া মাত্রই প্রিয়ব্রতর মনের মধ্যে সেই আজন্মলালিত রণভূমি, সেখানে দুঃশাসন, জয়দ্রথ, জরাসন্ধ, শকুনি, দুর্যোধন, সুদর্শন, বার্টলার, পেডি, ডগলাস, টেগার্ট, ছোটলাট সবাই কৌরবপক্ষ, এবং ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই, মাস্টারদা, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, মৃত্যুঞ্জয় বাড়ুজ্জ্যা, প্রভাকর বিরুণী, বিমল সরকার, বাবা শঙ্করপ্রসাদ মহাপাত্র সবাই পাণ্ডবপক্ষ। এবং প্রিয়ব্রত, বলাই বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় পাণ্ডব শিবিরে।

এই সবকিছুর মূলে প্রিয়ব্রতর সেই আশৈশব উপলব্ধি. সে কাকের বাসায় কোকিল, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক, ঐশ্বর্য, বিলাস এবং আভিজাত্যে ভরা সিংহগড়ে আজন্ম স্বভূমিচ্যুত এক পরবাসী। সুদর্শন সিংহবাবুর একমাত্র কন্যার গর্ভে না জন্মালে সিংহগড়ের হাজার হাজার শৃঙ্খলিত প্রজার সে সমগোত্রীয়। তার অধিক কিছু নয়।

নিজের সম্পর্কে আরও একটি ঘৃণিত বোধ প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে অহরহ কাজ করে চলে। কিন্তু সেটা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করতে গিয়ে, সে অপরিসীম কুণ্ঠায় কুঁকড়ে যায়। সে কি সত্যি সত্যিই সিংহগড়ের উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য? বাস্তবিকই কি সিংহবাবু-বংশের সঙ্গে কোনও বৈধ সম্পর্ক আছে তার? কে জানে। কে জানে।

অগ্নি বার্লিটুকু খেয়ে নেবার জন্য স্নেহভরা গলায় মিনতি জানিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কানে তার একটি বর্ণও প্রবেশ করছে না। সে তখন তার বুকের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে খুঁড়ে ওই দহন পর্বের ইতিবৃত্ত সংগ্রহে ব্যস্ত, বিপর্যস্ত।

৩৮. মানুষের পিঠে মানুষ

বাঁকুড়া জিলা স্কুলে ইতিহাসের মাস্টার ভূপতিবাবু যখন মহম্মদ তোঘলক পড়াতেন তখন প্রিয়ব্রতর চোখের সামনে ভেসে উঠত তার দাদুর মুখখানি। চুয়ামসিনার সিংহগড়ের সুদর্শন সিংহবাবু, খামখেয়ালিপনায় যিনি জীয়ন্তেই কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিলেন। রাজা-রাজড়ারা নাকি এমনিতেই কিঞ্চিৎ খামখেয়ালি হন। পরীক্ষিত বাউরির ভাষায়, বড়লোকের খিয়াল, ক্ষ্যাপা শিয়াল, আর ফাটা দিয়াল— এ তিন সমান। ভূপতি স্যারের মুখেই শুনেছিল প্রিয়ব্রত,

আগ্রার প্রাসাদে কোন্ এক বেগম, সূর্যাস্তের কালে ডুবন্ত মানুষের অন্তিম আর্তনাদ শুনতে নাকি বাসনা জেগেছিল তাঁর। এবং তাঁর ঐ নিষ্ঠুর সাধখানি পূরণ করতে নাকি বাদশার হুকুমে ঠিক সূর্যাস্তের মুহূর্তে মাঝ-যমুনায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা। তখন সূর্যের অন্তিম আলো রাঙিয়ে দিয়েছে যমুনার জল। মাঝ নদীতে হাবুডুবু খেতে খেতে জীবনের অন্তিম সূর্যকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে কিছু হতভাগ্য মানুষ। তারা কোনও অপরাধ করে নি, তবুও তাদের মরণ-আর্তনাদে আকুল হয়ে উঠেছে নদীজ সান্ধ্য বাতাস। বিলাসিনী বেগম প্রাসাদের ছাদে বসে বিকেলের ফুরফুরে হাওয়া সারা অঙ্গে মাখতে মাখতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন সেই দৃশ্য। সেই বেগমের নাম প্রিয়ব্রতর মনে নেই, মহম্মদ তোঘলককেও সে দেখেনি। সে কেবল দেখেছে, আশৈশব, তার দাদু সুদর্শন সিংহবাবুকে, যাঁর খামখেয়ালি কোনও ইতিহাসের পাতায় হয়ত স্থান পাবে না কোনও দিনও, কিন্তু প্রিয়ব্রত তো জানে, কেবলমাত্র মানুষকে পীড়ন করবার নিত্যনতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করবার সুবাদে তিনি ইতিহাসের পাতায় স্থায়ী আসন পেতে পারতেন।

একদিনের কথা মনে পড়ে।

গহীন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। একখানা নয়, পর পর দু'খানা। সিংহগড়ের বলদ, বুনো কাঁড়ার মতো তাগত ওদের। শিং-এ তেল মাখান, গলায় ঘুঙুরের মালা। প্রথম গাড়িতে সুদর্শন এবং প্রিয়ব্রত। দ্বিতীয়টিতে দিদিমা সরযুবালা এবং মা লাবণ্যপ্রভা। গাজনের মেলা দেখতে পাঁচাল চলেছেন সুদর্শন। পাঁচালের শিবের গাজন, চতুর্দিকে তার নাম ডাক। সুদর্শনকে ফি-বছর সপরিবারে যেতে হয়।

পাথরমৌড়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। সঙ্গে রয়েছে গোমস্তা কৃষ্ণদাস, দাদুর খাস চাকর সনাতন, আর রুদ্র শিকারির নেতৃত্বে বিশাল পাইক-বাহিনী।

বৈশাখ মাসের আকাট দুপুর। ঝলা বাতাস বইছে। তবে, জঙ্গলের মধ্যে গাছগাছালির ছায়ায় গরমটা অত অসহ্য মনে হয় না। বেশ টগবগিয়ে হাঁটছিল বলদগুলো, আচমকা ছোট হয়ে এল সামনের গাড়ির বাঁয়া-বলদের চোখদুটো। দু'চার কদম না যেতেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। মুখ দিয়ে ফেনা ঝরতে লাগল অঝোরে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। গাড়োয়ান নিতাই লোহার সতর্ ছিল, এক লম্ফে নেবে পড়ে ধরে ফেলল গাড়ির জুয়াল।

বলদটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, 'আউশা, হুজুর।'

নিতাইকে সমর্থন করে রুদ্র শিকারিও। আউশাই বটে। জিভে ঘা, দাঁতের মাড়ি এবং পায়ের ক্ষুরে ক্ষত, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে, এসব আউশারই লক্ষণ। সম্প্রতি রোগটা শুরু হয়েছে সারা তল্লাট জুড়ে। চুয়ামসিনা এবং আশেপাশের গাঁয়ে কয়েকটা গরু ইতিমধ্যেই মরেছে। সুদর্শন সিংহবাবুর এসব কথা শোনার ধৈর্য নেই। এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে পরিবারসহ আটকে পড়েছেন তিনি। চোর-ডাকাতের কথা বাদ দিলেও, ক্ষিদে-তেষ্টা-হয়রানি,-এসব তো আছেই। রাগটা পুরোপুরি পড়ে নিতাই লোহারের ওপর। শালা, তিন গুয়াল গরু আমার, তুই কিনা বেছে বেছে আনলি এক আউশা রোগীকে। শালা অধম। গলায় পা তুইল্যে দিতে হয়।

নিতাই লোহার মিনমিন করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওর হাতের থেকে গরু তাড়ানোর ঠেঙাটা কেড়ে নিয়ে দাদু ঘা-কয়েক বসিয়ে দিলেন ওর পিঠে।

বললেন, 'জঙ্গলের মধ্যে বিপাকে পড়ছি, তাই ছেড়্যে দিল্যম। গড়ে ফিরি, তারপর হবেক্ তুয়ার বিচার।'

গোমস্তা-চাকর-পাইকের দল প্রমাদ গুনছিল মনে মনে। আজ কার কপালে কি দুঃখু আছে, কে জানে। লোকটা ক্ষেপে গেলে এক্কেবারে চণ্ডাল।

দাদু এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন ক্ষিপ্ত বাঘের মত। ফরসা মুখখানি তাঁর লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

গোমস্তা কৃষ্ণদাস দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললো, 'অল্প দূরেই, হুজুর, পাথরমৌড়া গাঁ। ক্রোশ-দেড়েকের বেশী লয়। রুদ্রাকে পাঠাই দিলে একটা বাঁয়া বলদ লিয়ে ফিরে আইবেক ঘড়িটাক সময়ের মধ্যে।'

'এক ঘড়ি!' প্রায় আঁতকে উঠলেন দাদু, 'এক ঘড়ি কাল দাঁড়িয়ে থাকতে হবেক এই জঙ্গলের মধ্যে?'

'এক ঘড়ির বেশিও লাগতে পারে হুজুর।' প্রাণের আশা ছেড়ে রুদ্র শিকারি বলে, 'এখন ত গরু-ছাড়ার টাইম। কারো গোয়ালেই তো বাঁধা নাই গরু। খুঁজতে দেরি হবেক।'

কথাটা অস্বীকার করতে পারেন না সুদর্শন সিংহবাবু। পৌষ মাসের শেষে অর্থাৎ ক্ষেত থেকে ধান উঠে গেলেই গরু-ছাড়ের ট্যাড্‌রা পিটে দেয় গাঁয়ের মানুষ। এবার থেকে গেরস্থরা তাদের গরু ছেড়ে দিতে পারবে চরে খাওয়ার জন্য। সঙ্গে বাগাল থাকবে না। গরু দিনভর স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে। মাঠে-ঘাটে চরবে। গাছের ছায়ায় জিরোবে। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসবে যে যার গোয়ালে। এই ব্যবস্থা চলবে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় অবধি। যতদিন না আউশের চারা সবুজ হয় কিংবা আমনের বীচন ফেলা হয় বীজতলাতে। এখন গরু-বলদেরা চরে বেড়াচ্ছে যে যার মত। কোথা থেকে কোথা চলে যাচ্ছে ঘাস-পাতার আশায়, তার মালিকও তা জানে না। কাজেই, 'একটা বলদ চাই' বললেই গেরস্থের ক্ষমতা নেই, বলদটির হদিশ পায়।

বনে-বাদাড়ে খুঁজতে গিয়ে যদি দিনটাই কাবার হয়ে যায়। সুদর্শন সিংহবাবু ভাবতে থাকেন মনে মনে। ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন।

এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্যে খসর খসর আওয়াজ। রুদ্র শিকারিসহ পাইক-লেঠেলের দল মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ায়। সতর্ক হয়। কান আড়ে। এ জঙ্গলে ভয় আছে। যদিও জঙ্গলের প্রায় কিনার দিয়ে চলেছে গাড়ি, তবুও বলা যায় না। ডাকাতের ভয় তো আছেই। তা বাদে, বাঘ-ভালুক। নিদেনপক্ষে হুঁড়ার তো আসতে পারে যে কোনও সময়। সাধারণত দল বেঁধে আসে ওরা। শিকারের ওপর নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় পরের সঙ্গীর দিকে। সে তখন শূন্যে লাফ দিয়ে লুফে নেবার জন্য প্রস্তুত। এইভাবে, যে কোনও ভারী শিকারকে ওরা লোফালোফি করে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিয়ে চলে যেতে পারে অনেক দূরে। তবে, বাচ্চা-টাচ্চাদের একা পেলে অন্য কথা, নইলে ওরা সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তবুও সুদর্শনের চোখ-মুখ থেকে দুশ্চিন্তা যায় না। গাড়ি থেকে বন্দুকখানা তুলে নেন হাতে। সোজা হয়ে দাঁড়ান।

ঠা-ঠা দুপুরের জঙ্গল ভারি নিস্তব্ধ আর রহস্যময়। গা ছম ছম করে। গাছের ডালে কোবতর্ জাতের কিছু পাখি চাপা গম্ভীর গলায় ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। ঝোপ থেকে ঝোপে ছুটে বেড়াচ্ছে কিছু বেজি-গিরগিটি জাতীয় প্রাণী। গুঁড়চ্যার দল গাছ থেকে গাছে। কচি পাতায় ভরে গেছে শাল আর মউল। গাছের তলা জুড়ে শুকনো পাতার স্তূপ। মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়ায় উড়ছে এখান থেকে ওখানে। শুকনো পাতার ওপর হাওয়ারা বিচিত্র শব্দ তুলেছে। বহুদূরে কোনও এক গাছে একটা কাঠঠোকরা একঘেঁয়ে আওয়াজ তুলেছে, ঠক্ ঠক্।

খানিকবাদে পায়ের আওয়াজটা বেড়ে গেল। শুকনো পাতার ওপর মচরমচর আওয়াজ, চোত-বোশেখে শালের জঙ্গলে এ আওয়াজ এড়ানোর উপায় নেই কোনও বনচারীর। হাঁটতে গেলেই আওয়াজ হবে। নিস্তব্ধ জঙ্গলে বহু দূর পর্যন্ত শোনা যায়। কান খাড়া রেখেছিল লগদীর দল। কান খাড়া ছিল সুদর্শনেরও। আওয়াজের ধরনটা বোঝবার চেষ্টা করছিল সবাই। হেনকালে গাছগাছালির আড়াল থেকে যে মূর্তিখানি হাজির হল, তাকে দেখে সুদর্শন হতভম্ব। বন্দুক নামিয়ে নেন নিমেষে। একটু লজ্জাও পান মনে মনে। কত অকারণেই না ভয় পায় মানুষ!

একটা রোগা হাড় জিরজিরে মানুষ। বুকের খাঁচাটি বেজায় নড়বড়ে, কোঠরাগত চক্ষু। বয়েস আন্দাজ করা মুস্কিল। তবে মনে হয় চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যেই। কোমরে এক চিলতে ন্যাকড়া ছাড়া সারা শরীরই উদোম। মাথায় রুক্ষ্ম বালিবর্ণের চুল। গলায় বিশাল সাদা শাঁখের মালা। প্রায় পেট অবধি ঝুলছে। যে শাঁখ বাজানো হয়, তার চেয়ে মালার শাঁখগুলো আকারে বেশ ছোট। সুদর্শন অবাক হয়ে কুতকুতে চোখে দেখতে থাকেন লোকটাকে।

এক সময় রুদ্র শিকারিকে হুকুম করেন, 'এই রুদ্রা, শালাকে ডাক্।'

রুদ্র শিকারির ডাকে ঘুরে দাঁড়ায় লোকটি। ভয়ে ভয়ে তাকায়, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

কাছে আসতেই ভুল ভাঙে সবাইয়ের। শাঁখের নয়, একটা শাঁকালুর মালা। জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর শাঁকালু-লতা। যদিও শাঁকালুর মরসুম শেষ হয়ে এসেছে, তবুও বনে-জঙ্গলে কিছু কিছু পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত মানুষ ফল-পাকুড়ের খোঁজে বন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে এখন। ধান কাটার কাজ শেষ হয়েছে পৌষে। গরীব মানুষ দু'দশ মুঠো যা পেয়েছিল, পৌষেই শেষ। মাঘ-ফাগুনে ধান ঝাড়া, গাদি দেওয়া, গেরস্থের ভিটেয় বেড়া বাঁধা ইত্যাদির কাজ পেয়েছে কেউ কেউ। চৈত্র থেকে সম্পূর্ণ বেকার। চলবে সেই জ্যৈষ্ঠ অবধি। এ সময়টা জঙ্গলই ভরসা। চোত-বোশেখে জঙ্গলে মিলে বেল, অল্প স্বল্প মহুল, শালবীজ, বাবলা-আঠা এবং কিছু ফল-মূল।

লোকটা ভয়ে ভয়ে সুদর্শনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বুনো লতা দিয়ে ফোঁড়া শাঁকালুর মালাখানি অল্প স্বল্প দুলতে থাকে পেটের কাছাকাছি। বনচারী মানুষের এটাই নিয়ম। জঙ্গল থেকে আহরিত সামগ্রী বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওরা বাড়ি থেকে থলি-বস্তা-ঝুড়ি সঙ্গে নেয় না। ও সব বড় একটা নেইও ওদের ঘরে। বয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা ওরা জঙ্গলের লতা-পাতা দিয়েই বানিয়ে নেয়। কিন্তু ঐ মালাখানি দেখতে দেখতে সহসা ক্ষেপে যান সুদর্শন।

শুধোন, 'তুয়ার নাম কি?'

'সন্তোষ, আইজ্ঞা।'

'ঘর কুথা?'

'হুই মাঝের কুলি।'

'জঙ্গলটা কার বটে?'

সন্তোষের মুখে ভয়-আশঙ্কা গাঢ় হয়।

বলে, 'রাজার বটে।'

সুদর্শন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন সন্তোষের দিকে। সেই ফাঁকে এগিয়ে আসে গোমস্তা কৃষ্ণদাস।

বলে, 'ইনিই রাজা। চুয়ামসিনার সিংহবাবু।'

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে সুদর্শনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সন্তোষ। প্রণামের পরেও উবু হয়ে শুয়ে থাকে মাটিতে। ওঠে না। লগদীরা অল্প এগিয়ে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। দূরে কাঠঠোকরার অবিরাম কাঠ ঠোকার আওয়াজ কানে আসে, ঠক্ ঠক্।

সুদর্শন মাথা নাবিয়ে দেখতে থাকেন পায়ের তলার জীবটিকে। গাড়িতে বসে সরযুবালা, লাবণ্য এবং প্রিয়ব্রত নির্নিমেষ নয়নে দেখতে থাকেন দৃশ্যখানা। সুদর্শন চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'তুয়াদ্যার সাহসটা বড্ড বেড়েছে ইদানিং। একদিন বন্দুকটা লিয়ে ঢুকতে হবেক জঙ্গলে। দু'দশটা না মরলে, তো শালাদের হুশ হবেক নাই।'

সন্তোষ মাথা নামিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। তিরতির করে কাঁপতে থাকে শরীর।

সহসা গর্জন তোলেন সুদর্শন, 'রুদ্রা, শালাকে উঠ্ করা।'

রুদ্র শিকারি ছুটে এসে সন্তোষের চুলের মুঠি চেপে ধরে। তারপর এক ঝটকায় তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

সুদর্শন মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বড় তেতো হাসি।

'বাহ্! চমৎকার মালাটি। চমৎকার। কিন্তু এ মালা ত' তুয়ার গলায় মানাচ্ছে নাই।'

সুদর্শনের প্রতিটি কথার তাৎপর্য রুদ্র শিকারির চেনা। সে সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষের গলা থেকে ছিনিয়ে নেয় মালাখানি। পাইকদের একজনকে ইঙ্গিত করেন সুদর্শন, 'বাঁয়াটাকে লিয়ে তুই ফিরে যা গড়ে। দরকার হল্যে আর একজনকে সাথে লে। আর, রুদরা, এ শালাকে জুয়ালের বাঁ-দিকে জুতে দে।'

এ হুকুম অমান্য করবার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই সন্তোষ টলতে টলতে এগিয়ে আসে। দুব্‌লা হাতদুটি দিয়ে তুলে ধরে গাড়ির বাঁ-দিকের জুয়াল। গরুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টানবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সুদর্শন সিংহবাবু চড়ে বসেন গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করে সোনামুখির দিকে।

প্রিয়ব্রতর বয়েস তখন পাঁচ-কি ছয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখছিল সেই আজব দৃশ্য। গাড়ির একদিকে বলদ, অন্য দিকে মানুষ।

দাদুর বুঝি খিদে পেয়েছিল খুব। প্রিয়ব্রতরও। রুদ্র শিকারির কাছ থেকে চেয়ে নিলেন শাঁকালুর মালাখানি। বাঁকে কলসি ভর্তি জল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছিল দুঃখু ধল্ল। ঐ জলে শাঁকালুগুলো ধুয়ে নিলেন দাদু। তারপর তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে মৌজ করে চিবোতে লাগলেন।

প্রিয়ব্রতর দিকেও এগিয়ে দিয়েছিলেন কয়েকটা। কিন্তু শাঁকালুগুলো হাতে নেওয়া মাত্রই ওর সারা শরীর কেমন গুলিয়ে উঠল সহসা। মুঠোর মধ্যে শাঁকালুগুলো নিয়ে বসে রইল নিথর হয়ে।

দাদু ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'কই, খাও।'

ভেতর থেকে ঠেলে ওঠা বমি-বমি ভাবখানাকে কোনগতিকে সামলে, অতি ধীরে অথচ স্পষ্ট গলায় প্রিয়ব্রত বলল, 'আমার খিদা নাই।'

৩৯. প্রিয়ব্রতর জন্য সোনার শিকল

বিয়াল্লিশের যে অনির্বাণ আগুন পুড়িয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল প্রিয়ব্রতর হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, ছেচল্লিশের মাঝামাঝি দ্বিতীয়বারের জন্য জেলে গিয়ে তা বুঝি ষোল কলায় পূর্ণ হল। দ্বিতীয় দফায় দীর্ঘ সাত মাসের কারাবাসে ওর শরীরে বাসা বেঁধেছিল জটিল দীর্ঘস্থায়ী অসুখ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন সিংহগড়ে পা রাখল প্রিয়ব্রত, তখন সিংহগড় শ্মশানের তুল্য। সুদর্শন সিংহবাবু, সরযু আর শঙ্করপ্রসাদ তিনজনেই চলে গেছেন ওপারে, মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে। আর লাবণ্য, অকালে স্বামীহারা সেই দুঃখী রমণী কোন গতিকে বেঁচে রয়েছে, বিশাল সিংহগড়ের এক কোণে, একাকী, নিঃসঙ্গ.., আর, তার বুকের মধ্যে মায়ের সমগ্র সত্তা জুড়ে একমাত্র সন্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব অন্তহীন প্রতীক্ষা।

বিয়ের কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল প্রিয়ব্রত। লাবণ্য কিন্তু ভোলেন নি। সেই কারণেই মাস তিনেক বাদে চিকিৎসা, যত্ন ও বিশ্রামে যখন বেশ সেরে উঠেছে প্রিয়ব্রত, তখনই লাবণ্য আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমন কি, প্রিয়ব্রত যদি চায়, তবে দীপমালাকেও পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নেবেন এমন ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু দীপমালা ততদিনে আবার হারিয়ে গিয়েছে। লাবণ্য আর তিলমাত্র অপেক্ষা করতে রাজি নন। কাজেই, শুরু হল দ্বিতীয় দফায় মেয়ে দেখা, কথাবার্তা। কিন্তু ততদিনে সারা জেলা জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে তেভাগার আন্দোলন। জয়পুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী—একটু একটু করে জ্বলতে শুরু করেছে। সিংহগড়ে শুয়ে বসে সেই আগুনের উত্তাপ পায় প্রিয়ব্রত। বুকের মধ্যে সেই পুরোনো অনুভূতি। তে-ভাগা আন্দোলনের ভাগচাষীরা পাণ্ডবপক্ষ। কৌরবপক্ষ হল সুদর্শন সিংহবাবু এবং প্রতাপলালের দল। আর...।

মা বোধ করি ভালই বুঝতেন প্রিয়ব্রতর আজন্মবাহিত যন্ত্রণার কথা। মুখ ফুটে কোন দিনও কিছু বলেন নি তিনি। কিন্তু ঐ নিয়ে তাঁরও যে একটা তীব্র যন্ত্রণা ছিল মনে, এটা প্রিয়ব্রত বুঝত, একমাত্র প্রিয়ব্রতই। সেই কারণেই বুঝি প্রথমবার জেল থেকে ফেরার পর

প্রিয়ব্রতকে সংসারে বাঁধবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন লাবণ্য। কায়মনোবাক্যে চেয়েছিলেন ছন্নছাড়া আত্মঘাতী জীবন থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে। আর, সে পদ্ধতিটিও ছিল অতি পুরাতন, চিরাচরিত। তিনি উর্বশী দিয়ে ওর সাধনা ভণ্ডুল করতে চেয়েছিলেন।

ততদিনে, বার্ধক্যের কারণে সিংহগড় থেকে বিদায় নিয়েছে বিশ্বস্ত গোমস্তা কৃষ্ণদাস। নিকুঞ্জপতি, প্রিয়ব্রতর জেঠতুতো ভাই মশিয়াড়া থেকে এসে জাঁকিয়ে বসেছে সিংহগড়ে। প্রিয়ব্রতর চেয়ে দু'চার বছরের বড়ই হবে নিকুঞ্জপতি, কিন্তু ওর চেয়ে ঢের ঢের বেশি চৌকশ। লাবণ্য ওকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রিয়ব্রতর জন্য এমন একটি মেয়ে খুঁজে আনতে যাকে সব অর্থেই বলা চলে পুরুষের সোনার শেকল। আর নিকুঞ্জপতি, বলা মাত্রই এমন এক মেয়ের সন্ধান নিয়ে এল, যাকে দেখা মাত্রই হৈ-হৈ রব উঠল সিংহগড়ে। লাবণ্যতো বটেই, প্রিয়ব্রতও চোখ ফেরাতে পারে না সে মেয়ের রূপ দেখে। নাম তার কনকপ্রভা। সার্থক নামখানি। কিংবা নামটিও তার রূপের পক্ষে যথেষ্ট নয় বুঝি। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, আর মোমের মতো লাবণ্য যেন চুঁইয়ে পড়ছে শরীর থেকে। কনকপ্রভা শহরের মেয়ে। বাবা মেদিনীপুর কোর্টের মোক্তার, খড়্গপুরের ইন্দাবাজারে নিজস্ব বাড়ি, ওখানেই পাকাপাকি বসবাস। স্বচ্ছল সংসার ছিল বটে ওদের, কিন্তু চুয়ামসিনার সিংহগড়ের তুলনায় নগণ্য। তাতে কিছু যায় আসে নি। প্রায় বিনা পণে, বিনা যৌতুকে, বলা যায় শুধু শাঁখা-নোয়াতেই কনকপ্রভাকে ঘরে তোলেন লাবণ্য।

সে কথা তা বলে প্রকাশ পায় নি কোন দিন। নিকুঞ্জপতির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ পাঠিয়েছিলেন লাবণ্য, কনকপ্রভার বাপের কাছে। দান-সামগ্রী, পণ-যৌতুক, অলংকার, সব কিছু দিয়ে যেন একেবারে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠায় মেয়েকে, যেন বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়ন, গেট-মণ্ডপ কোন কিছুতেই তিলমাত্র ত্রুটি না থাকে—তার পাকা ব্যবস্থা করেছিলেন লাবণ্য। পার্শ্ববর্তী শক্রপুরীর লোকজন এবং সারা তালুকের মানুষ যেন মুখ টিপে না হাসতে পারে। যেন বলতে না পারে, সুদর্শন সিংহবাবু নেই বলে তাঁর সাবেক সিংহগড়ে এক ভিখিরির মেয়েকে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন লাবণ্য, শুধু রূপের চটকে ভুলে গেলেন কৌলিক আভিজাত্যের কথা। তাছাড়া, কনকপ্রভার দিকটাও মাথায় রাখতে হয়েছিল লাবণ্যকে। কত বড় ঘরের বউ হয়ে আসছে সে, বিশ-পঁচিশ সাল আগে হলে বউ-রাণী বলে ডাকত তাকে সিংহগড়ের অধস্তন সবাই, যেমন তেমন পণ-যৌতুক-অলঙ্কার নিয়ে সিংহগড়ে পা দিয়ে সে যেন কোনও হীনমন্যতায় না ভোগে। লাবণ্য তো ভাল ভাবেই জানতেন, সিংহগড়ের বধূরা হাল অতীতেও কি বিপুল পরিমাণ সম্পদ সহকারে প্রবেশ করেছে সিংহগড়ে। লাবণ্যর বড়মা, প্রিয়ব্রতর বড় দিদা অর্থাৎ সুদর্শন সিংহবাবুর প্রথম পক্ষ কাদম্বরী যখন সিংহগড়ে এসেছিলেন, সঙ্গে যৌতুক হিসেবে এনেছিলেন সালুকার পুরো জঙ্গলখানাই। এতদঞ্চলের মানুষজন তো স্বচক্ষেই দেখেছে এসব। সেই গড়ে সাদামাটা পণ-যৌতুক নিয়ে কাউকে বরণ করলে সেই সব মানুষজনই বা ভাববে কি? এত কথা ভেবেছিলেন লাবণ্য। সেই মতই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন গোপনে। কেবল মাত্র নিকুঞ্জপতি ছাড়া আর কাকপক্ষীতেও জানত না সে কথা। কিন্তু প্রিয়ব্রতর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি লাবণ্য। প্রিয়ব্রত সবই বুঝেছিল।

আসলে, প্রিয়ব্রতকে পাকাপাকি ভাবে বেঁধে ফেলবার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন লাবণ্য। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে যে কোনও মূল্যে থিতু করতে চেয়েছিলেন।

বউ-ভাতে তালুকের তাবৎ মানুষ নিমন্ত্রিত হয়েছিল সিংহগড়ে। এসেছিলেন বাঁকুড়ার এবং বিষ্ণুপুরের বাছা বাছা মানুষ। এবং রাত্রি না পোহাতেই, তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলের মত সারা তালুক এবং রাঢ়ভূমের সিংহভাগ জুড়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল 'কনকপ্রভা' ফুলের সৌরভ। সিংহগড় তো কোন্ ছার, সারা রাঢ়ভূমে বোধ হয় এমন অগাধ অফুরন্ত রূপ নিয়ে আসে নি কেউ কোনদিন। এমন কি বিষ্ণুপুরের রাজমহলেও নয়। এমন রটনা বাতাসে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল সারা রাঢ়ভূমের আকাশে।

শুধু যে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ, তাই নয়, সেই সঙ্গে শহুরে আদব-কায়দা, পোষাক-আশাক, প্রসাধন, কেশবিন্যাস, শাড়ি পরবার ধরন, অলংকারের আধুনিকতম ডিজাইন,—সবই ছিল একেবারে অভিনব। তার ওপর সে মেয়ের কথাবার্তার ভাষা, সুরেলা হাসির তরঙ্গ, মোহনীয় ভ্রু-ভঙ্গি, হাত-পা সর্ব শরীরের মুদ্রা-ভঙ্গিমা—এমনই আকর্ষণীয় যে চারপাশের মানুষজন দেখতে দেখতে একেবারে কাঠ মেরে যায়। নিজের রূপ এবং লাস্য নিয়ে দিবারাত্রি সবাইয়ের এমন অবিরাম সরব ও নীরব স্তব-স্তুতি-বন্দনা—কনকপ্রভাকে বোধকরি অবিচল থাকতে দেয় নি। মাথা ঘুরে গিয়েছিল তারও। ফলে, এমন এই গ্রামীণ মানুষ এবং তাদের রুচি--সংস্কৃতিকে কনকপ্রভা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করতে শুরু করে সিংহগড়ে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। চারপাশের মানুষজন, যারা ওর রূপ দেখে কাঠ মেরে গিয়েছিল, তাদের যখন সম্বিত ফিরল ততদিনে কনকপ্রভা প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

প্রিয়ব্রত একদিন দেখল, কুম্বা শিকারি আর শঙ্কর বাউবি কাঁধে ডাব বোঝাই বাঁক নিয়ে এ-বেলা ও-বেলা আনাগোনা করছে সিংহগড়ে। খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিয়ব্রত তো থ। রোজ দু'বেলা ডাব আসছে বিষ্ণুপুর বাজার থেকে, কনকপ্রভার জন্য। সে নাকি পাতকুয়োর 'নোংরা' জল খেতে পারে না। ঘেন্না করে তার। বমি পায়। আজ মাসাধিক কাল ধরে তাই চলছে এই ব্যবস্থা। মায়ের নির্দেশ অনুসারেই চলছে।

প্রিয়ব্রত যায় মায়ের কাছে, 'করেছ কি?'

লাবণ্যর মুখে স্নেহমেশান প্রশ্রয়ের হাসি, 'উ বেচারি শহরের মেয়া, নলের জল খায়। খেতে পারছে নাই কুয়ার জল।'

—তাই বলে ডাবের ব্যবস্থা। জলের বদলে ডাব। এটা কিন্তু বেজায় রকমের বাড়াবাড়ি মা।

—তুই কি খরচের কথা ভেবে বলছু ইট্যা?

—খরচের প্রশ্ন নয়। লোকে ভাববেক কি?

—ভাবুক। উ বেচারি কি তবে তিষ্টায় থাকবেক নাকি? উয়াকে তিষ্টায় রেখে, তারপর ঘর শুদ্ধ মাইনষের গলগণ্ড হউক আর কি।

এইভাবে লাবণ্য হালকা করে দেন ব্যাপারটা। প্রিয়ব্রতর তখনই অতি স্পষ্টভাবে মনে হয়, পুত্রবধূর প্রতি কেবল অপার স্নেহ কিংবা করুণা নয় এটা, আরও কিছু। রহস্যময় কোনও

স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে মায়ের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে। হয়ত বা যে কোনও উপায়ে কনকপ্রভাকে সুখী এবং তৃপ্ত রাখতে চাইছিলেন মা, নিছক ছেলের কথা ভেবে। কারণ, প্রিয়ব্রত একটা কথা সেই ছেলেবেলা থেকেই বারবার শুনেছে ওঁর মুখে। বলতেন, কেবল সুখী মানুষেরাই অন্যকে সুখ বিলোতে পারে। অতৃপ্ত মানুষ তো নিজের একান্ত আগুন নিয়েই নাজেহাল। নিজের ঘরের চালে আগুন লেগেছে যার, অন্যের আগুন নেভাতে যাওয়ার তার সময় কোথায়, ইচ্ছেই বা হবে কেন? প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছে, মা লাবণ্য বিশ্বাস করতেন, কনকপ্রভাকে সবদিক থেকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি দিতে পারলেই সে তা সুদে-আসলে ফেরৎ দেবে প্রিয়ব্রতকে। আর, কেবল এই উপায়েই ছেলের উড়ন্ত পাখির মত মনখানাকে বাঁধা যাবে সিংহগড়ের চৌহদ্দির মধ্যে।

হয়ত লাবণ্যর ধারণাই সত্যি হয়ে উঠত, কিংবা উঠত না, কিন্তু প্রিয়ব্রতর পক্ষে তখন সিংহগড়ের বন্ধন মেনে নেওয়ার আর কোনও উপায় ছিল না, কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দেবার মতো সময় ছিল না। কারণ ততদিনে ঐ পুরোনো কালব্যাধি ওর মনের, দখল নিয়ে ফেলেছে পুরোপুরি। সে নিরন্তর চুষছে, শোষণ করছে, কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে। তেভাগার আগুন তাকে প্রবল বেগে টানছে। প্রিয়ব্রতর বুক জুড়ে শুরু হয়েছে এক অস্থির লয়ের বাজনা।

এবং আরও একটি ঘটনা, কনকপ্রভার শরীর জুড়ে এক আগমনী-বাজনা শুরু হয়েছে। কনকপ্রভা মা হতে চলেছে।

৪০. দীপমালা বৃত্তান্ত

ভিজে কাঠে ফুঁ না দিলে আগুন ধরতে চায় না, ভালভাবে হাওয়া না দিলে গনগনে হয় না সে আগুন, দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। সিংহগড়ের দুধ-ঘিতে বেড়ে ওঠা ভিজে কাঠের তুল্য প্রিয়ব্রতর মধ্যে কে করেছিল অগ্নি সংযোগ, কে দিয়েছিল ফুঁ, আর কে-ই বা অবিরাম হাওয়া করে সে আগুনকে গনগনে রেখেছিল চিরকাল, এ আজ প্রিয়ব্রতর কাছেই এক গবেষণাতুল্য বিষয়। সেই গবেষণায় বুঁদ হয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে প্রিয়ব্রত প্রতিবারই চুম্বকের মতো আটকে যায় একটি বিকেলের শরীরে। উনিশ শো উনচল্লিশ সালের ডিসেম্বরের এক বিকেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সমগ্র ইউরোপ উত্তেজনায়, সন্ত্রাসে, আতঙ্কে থরথরিয়ে কাঁপছে, এ দেশে সি-পি-আই এবং তার ছাত্র-যুব সংগঠনগুলো একত্রে রব তুলেছে, ইংরেজদের এই যুদ্ধে 'না এক পাই, না এক ভাই'। একটা পয়সাও সাহায্য নয়, সৈনিক হিসেবে একটি মানুষও যাবে না এ যুদ্ধে। এমনি সময়ে, ডিসেম্বরের এক বিকেলে ছাত্রনেতা শ্যাম চৌধুরীর পিছু পিছু প্রিয়ব্রত হাজির হয়েছিল ভোলাদার ব্যায়াম-কুস্তির আখড়ায়, যেটা আসলে ছিল যুগান্তর দলের একটি গোপন আস্তানা। প্রিয়ব্রতর বয়েস তখন মাত্র সতের কি আঠার, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে আই-এ ক্লাসের ছাত্র। ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য প্রকাশ্য ও গুপ্ত যে প্রক্রিয়াগুলি সারা দেশ জুড়ে চলছে, বাঁকুড়া জেলায়ও তার কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন ধরে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে যেমন ভেসে গেছে বহু মানুষ, মদ-গাঁজার দোকানে পিকেটিং, লবণ ইত্যাদি বর্জন, আইন অমান্য, অসহযোগ, —তেমনি অনুশীলন আর যুগান্তর দলের কাজকর্মও থেমে নেই। বিদেশী চিনি ও লবণের

ব্যাগে কেরোসিন ঢেলে দেবার অপরাধে কুচিয়াকোল স্কুলের হেড পণ্ডিতকে চাকরি থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। স্কুল-কলেজ বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনপুর, চাতরা, অমরকানন, অম্বিকানগর, বিষ্ণুপুরে গড়ে উঠেছে জাতীয় স্কুল। আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে হরতাল হয়েছে বাঁকুড়া শহরে। মদের দোকানে দোকানে চলেছে লাগাতার পিকেটিং। আন্দোলনের সমর্থনে চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে বামনিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের এগারজন চৌকিদার। পাশাপাশি যুগান্তর এবং অনুশীলন দলের নেতৃত্বে একের পর এক ডাকগাড়ি লুট হচ্ছে। বিষ্ণুপুরের এস-ডি-ও যুগান্তর গোষ্ঠীর হাতে মরতে গিয়েও অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন। রাইপুর থানার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর-এর বাসা থেকে দু'দুটো রিভলভার কৌশলে সরিয়ে ফেলেছে বিপ্লবী মেয়েরা। প্রিয়ব্রত জেনেছিল মেয়েদের মধ্যে দীপমালাও ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, প্রভাকর বিরুণী, বিমল সরকারের মতো বিপ্লবীরা চলে গেছেন কালাপানির ওপারে। প্রিয়ব্রত এ সবই শুনেছে শ্যামদার মুখে। প্রিযব্রতর চেয়ে মাত্র বছর দুয়েকের বড় হয়েও তিনি কত কিছুই যে জানতেন। প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে যেত। কিন্তু তা বলে, সিংহগড়েব ছেলে হয়ে সে কোন দিন স্বদেশী দলে নাম লেখাবে এটা ছিল সবাইয়ের কাছে কল্পনার অতীত। তবুও প্রিয়ব্রত ধীরে ধীরে যুগান্তর দলে পুরোপুরি নাম লিখিয়ে ফেলল।

যুগান্তর দলে ঢোকার তিন দিনের মাথায় দীপমালাকে দেখেছিল প্রিয়ব্রত।

বছর চোদ্দ বয়েসের এক ঝকঝকে কিশোরী। সর্বদা টগবগিয়ে ফুটছে। কথায় কথায় খিলখিল হাসছে। ছোট-বড় সবাইয়ের পেছনে লাগছে অবিরাম। আর, তার হাঁটা-চলা, গ্রীবাভঙ্গি, সমস্ত আচার-আচরণে কি দৃপ্ত প্রাণোচ্ছল ভাব। কেবল মাঝে মধ্যেই কি এক জটিল কারণে সহসা উদাস হয়ে যেত দীপমালা। তখন তাকে খুবই অচেনা লাগত। তখন তার সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করত খুব।

প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দীপমালাব ভাব হয়ে গেল প্রথম দিনেই।

প্রিয়ব্রত চুয়ামসিনার মস্ত জমিদার বাড়ির ছেলে শুনে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

দীপমালাকে দলের সকলেই খুব ভালবাসত। বিশেষ করে ভোলাদা। তিনিই ওদের লাঠি-ছুরি খেলা এবং পিস্তল চালানো শেখাতেন। দীপমালাকে তিনি ভালবাসতেন আপন মেয়ের মতো। দীপমালাও খুব চটপট রপ্ত করছিল সব কিছু। এমনিতে খুব ছটফটে হলে কি হয়, অনুশীলনের সময় তার নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা ছিল দেখবার মত।

ভোলাদা মাঝে মাঝেই খুব গাঢ় স্বরে বলতেন, 'হবে না? কার মেয়ে দেখতে হবে তো!'

কার মেয়ে দীপমালা। প্রিয়ব্রত কোনদিন সাহস করে শুধোয় নি। ওদের সমিতির নিয়মে কারো সম্পর্কে অধিক কৌতূহল প্রকাশ করা ছিল নিষিদ্ধ। পরস্পর পরিচিতির ক্ষেত্রেও মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখা হত। প্রিয়ব্রত শুধু অপেক্ষা করত, সময় হলে, কিংবা প্রয়োজন হলে দীপমালার আনুষঙ্গিক পরিচয় ওকে জানান হবে। কিন্তু সে সময় কবে আসবে, কোন দিনও আসবে কিনা, তা ওর জানা ছিল না। উপস্থিত সে এটাই জানত, দীপমালা এই বাঁকুড়া শহরে

ওর মামার বাড়িতে থাকে এবং গার্লস্ স্কুলে পড়ে। নিছক এইটুকু পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে দীপমালার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা, হল, তার সিংহভাগ কৃতিত্ব দীপমালারই। প্রিয়ব্রত এমনিতেই খুব মুখচোরা আর লাজুক, মেয়েদের সামনে তা আচম্বিতে অনেক গুণ বেড়ে যেত। কিন্তু দীপমালা ছিল খুবই সাবলীল। ও-ই ওকে সর্বদা চোখে চোখে বেঁধে রাখত। কোনদিন আখড়ায় যেতে দেরি হলে ও প্রিয়ব্রতকে দু'চোখের মণি দিয়ে ধমকাত। দু'একদিন কোন কারণে না যেতে পারলে একেবারে অস্থির হয়ে উঠত। শ্যামদাকে দশবার শুধোত ওব না যাওয়ার সম্ভাব্য কারণ। তখন তার দু'চোখ দিয়ে নাকি ঝরে ঝরে পড়ত গলানো মাখনের মত নরম শঙ্কা। শ্যামদাই সন্ধ্যেয় ফিরে বলত ওসব।

বুকের মধ্যে প্রগাঢ় লজ্জা আর অস্বস্তি নিয়ে প্রিয়ব্রত নিঃশব্দে শুনে যেত শ্যামদার কথা, মনের তাবৎ একাগ্রতা একত্র করে চাখত প্রতিটি বাক্য, শব্দ, অক্ষর। স্বাদ নিত প্রতিটি বাক্যের অন্তর্গত বাড়তি মাত্রার, প্রতিটি শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনার। মুখে বলত, অত হেদিয়ে পড়বাব কি আছে? দু'একদিন আমি নাও যেতে পারি। আমি কারো কাছে দাসখত লিখে দিই নাই। না সমিতির কাছে, না দীপমালার।

সামান্য রূঢ় শোনায় বুঝি প্রিয়ব্রতর কথাগুলো। শ্যামদা পরিপূর্ণ চোখে তাকায়। পরখ করে ওর মনের ভাবগতিক। বলে, 'মেয়াটা বড় ভাল রে। উযার মনে কষ্ট দিস নাই।'

প্রিয়ব্রতবও তাই বিশ্বাস। মেয়েটা একটু বেশি রকমেব ভাল। তাই শ্যামদাকে শুনিয়ে রুক্ষ্মভাবে বলল বটে কথাটা, কিন্তু প্রিয়ব্রতর অনুপস্থিতির হার ক্রমশই কমতে লাগল, সময়ানুবর্তিতা অনেক বাড়ল, আব ধীরে ধীরে সে বুঝি দাসখতই লিখে দিল। মিথ্যে নয়, সে যে ক্রমশ যুগান্তর দলের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ল, তার অন্যতম কারণ হল দীপমালা। ও ভারি নিঃশব্দে টানতে লাগল প্রিযব্রতকে। অপ্রতিরোধ্য সে টান। কিন্তু টিকটিকিব পোকা টানার মত ক্রুর, কুটিল পদ্ধতি নয়, ভারি সহজ সরল, প্রকাশ্য, আন্তরিক প্রক্রিয়ায় সে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে একাত্ম হতে থাকল ক্রমশ। এমন একটি বিপ্লবী দলে পুরুষ এবং মহিলা কর্মীদের মেলামেশার ব্যাপারে একটু বেশি মাত্রায় কঠোরতা দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু দীপমালার ব্যাপারে ভোলাদার দেখা গেল আকাশচুম্বী উদারতা। ফলে, দীপমালা খুব বেপরোয়াভাবে মেলামেশা শুরু করল প্রিয়ব্রতর সঙ্গে। প্রায়ই সে সবার সুমুখে ওর একেবারে গা ঘেঁষে বসত, কথায় কথায় চড়-চাপড়াত শরীরের যে কোন অংশে, হাত ধরে হিড় হিড় করে টানত, একদিন ভোলাদার কাছে গিয়ে বায়না ধরল, ও ভোলাদা, বলুন না প্রিয়দাকে, বাড়ি পৌঁছে দিক আমাকে। আমি একা একা ফিরব কি করে? দল বেঁধে আখড়ায় আসা কিংবা ফিরে যাওয়া একান্তভাবেই বারণ। মন্ত্রগুপ্তি এবং নিরাপত্তার প্রশ্নেই এমন নিয়ম। একজন ধরা পড়লে অন্যদের টিকিতেও তাৎক্ষণিক টান পড়ে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভোলাদা দেখি সাক্ষাৎ কল্পতরু। বলে, যা প্রিয়, দীপুর সঙ্গে যা। ওকে পৌঁছে দিয়ে বাসায় ফিরবি। তা বলে, বাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়া গেল না। চাঁদমারির ডাঙায় পৌঁছেই দীপমালা বলল, এস, ডাঙায় বসে খানিক গল্প করি। গল্প-গুজবের পর বলল, এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি একাই যেতে পারব। প্রিয়ব্রতর ও বিশ্বাস হয়েছিল সেটাই। এমন দুরন্ত সাহস ওর, কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা

দুঃসাহসেরই সামিল, এমন মেয়ে এই নিতান্ত সাঁঝ বেলায়, এমন আধাশহর এলাকায় একা পথ হাঁটতে ভয় পাবে, এমনটা যেন ভাবাই যায় না। তিন-চার দিনের মধ্যে প্রিয়ব্রতর বিশ্বাসখানা পাকাপোক্ত হল, আর যাই হোক, অন্তত বাড়ি পৌঁছে দেবার কারণে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটে না, ওর চেয়ে অনেক সাহসী ওই মেয়ে। এর আসল কারণটা হয়ত বা আন্দাজ করতে পারছিল তদ্দিনে, কিন্তু যে জীবন সে বেছে নিতে চলেছে, তাতে তেমন কথা ভাবাও বারণ। ফলে প্রিয়ব্রত নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করে চলে, ওর পছন্দের খেলায় বিনা বাক্যব্যয়ে অংশগ্রহণ করে, এবং একসময় যুগান্তর দলের বকলমে দীপমালাই হয়ে ওঠে ওর নিয়তি। শুধু একটা ব্যাপার কিছুতেই বোধগম্য হত না, প্রিয়ব্রত যে ধারায় ভেবে চলেছে, দীপমালাও কি তেমন করেই ভাবে! এত সহজ, সরল, সাবলীল ওর আচরণ, এমন দীপ্ত, অপরাধবোধহীন ওর ভাব-ভঙ্গিমা, এমন নিঃশঙ্ক ওর পায়ের গতি, প্রিয়ব্রতর দিকে এগিয়ে আসা, মনে হয় যেন নিতান্ত আটপৌরে ব্যাপার ওটা, ওব কাছে। যেন নেহাতই খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-ঘুমোনো, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দেওয়া-নেওয়ার মতই দৈনন্দিন আর অনাড়ম্বর, যেন পাখি উড়ছে আকাশে, মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে জলে, নদী বয়ে চলেছে উঁচু এলাকা থেকে ঢাল বেয়ে নীচু ভূখণ্ডের দিকে...!

তাও প্রিয়ব্রত হাঁটতে থাকে ওর পাশে পাশে। বলে, আর একটু এগিয়ে দিই। সহসা থমকে দাঁড়ায় দীপমালা। খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, আর এগোতে দিলে আমার বাসার খোঁজ পেয়ে যাবে যে। আমাদের নিয়মে বারণ নয় সেটা? এমন সাবলীল সেই কণ্ঠ, কোনও উচ্চকিত নিষেধবাণী নয়, সশঙ্ক ভ্রু-কুঞ্চন নেই, অথচ এমন অমোঘ সেই শব্দগুলি যে থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় সেখানেই। উড়ু উড়ু পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় দীপমালা, প্রতাপবাবুর বাগানের দিকে, আধো অন্ধকারে তার ঋজু শরীরখানি রঙ বদলাতে বদলাতে হারিয়ে যায়।

এরপর দীপমালাকে অনুশীলনের শেষে এগিয়ে দেওয়াটা প্রিয়ব্রতর দৈনন্দিন কর্ম তালিকায় পাকাপাকিভাবে স্থান পেল।

এ ছাড়াও, মাঝে মাঝেই সামান্য সুযোগে ওরা দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত দল থেকে। দীপমালাই অন্যদের থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে নিত প্রিয়ব্রতকে। ওরা চলে যেত গভীর জঙ্গলের মধ্যে কিংবা লোকপুরের দিকে, কোনদিন যেত দ্বারকেশ্বর কিংবা গন্ধেশ্বরীর পাড়ে, কিংবা কাঠজুড়ির সীমাহীন ডাঙার ঠিক মধ্যিখানে বসে চারপাশের দিগন্তকে দু'চোখ দিয়ে হাতড়াত। গল্পেগুজবে তিরতির করে বয়ে যেত সময়। সে গল্পের কোনও মাথা মুণ্ডু ছিল না।

একদিন আচমকা দীপমালা শুধোল, 'তোমরা চুয়ামসিনার জমিদার?'

এ এক ভারি অস্বস্তিকর প্রশ্ন প্রিয়ব্রতর কাছে। শৈশবে অতখানি ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে অস্বস্তির মাত্রাখানি বেড়ে যাচ্ছে।

বলে, 'আমি নয়।'

—তোমার বাবা?

—বাবাও নয়।

—তবে যে ওরা বলল, তুমি সিংহগড়ের ছেলে?

দীপমালা ওর ডাগর চোখদুটি মেলে দেয় প্রিয়ব্রতর দিকে।

—আমার দাদু। সুদর্শন সিংহবাবু। তাঁর ভাই প্রতাপলাল। তার ছেলে হরবল্লভ...। ওরাই জমিদার। প্রিয়ব্রত প্রাণপণে অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে লড়ছে তখন।

বলে, 'সিংহগড় আমার মামাবাড়ি।'

বলে, 'দীপমালা, আমরা দু'জনেই মামাবাড়িতে থাকি। দীপমালা, তোমাকে কেউ 'কাকের বাসায় কোকিল' বলে ব্যঙ্গ করে?'

—না তো।

—আমাকে করে। দীপমালা তুমি মামাবাড়িতে থাক কেন?

—বলব একদিন।

—দীপমালা তোমার বাবা কোথায় থাকেন?

—বলব একদিন।

—কবে বলবে, দীপমালা?

—আজ নয়, আর একদিন বলব। আজ শুধু তোমার কথা শুনি।

প্রিয়ব্রত একটু একটু করে সব খুলে বলে দীপমালাকে, যতখানি বলা চলে।

দীপমালা হেসে বলে, 'ওসব ছাড়। জমিদারের নাতি তুমি। হবু জমিদার।' দীপমালা ঠোঁট টিপে হাসে।

—না। চেঁচিয়ে উঠেই যেন কেমন অস্বস্তিবোধ করে প্রিয়ব্রত। লজ্জায় পড়ে, গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'আমি আসলে কাকের বাসায় কোকিল। সিংহগড়, আসলে সেখানেও আমার অনুরূপ পরাধীনতা, পরবাস। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি সেখানেও একটা লড়াই লড়ছি আমি, দীপমালা।'

দীপমালা ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রতর দিকে। এ্যাদ্দিন বাদে এই প্রথম ওকে বাস্তবিক চিন্তিত দেখায়। প্রিয়ব্রত সংক্ষেপে ওকে বোঝায় সিংহগড়ে ওর সঠিক অবস্থানটা। এ ও বোঝাবার চেষ্টা করে, এই যে সে সিংহগড়ের প্রতিভূ হয়েও ভিড়ে গেছে যুগান্তর দলে, প্রাথমিকভাবে সেটা ছিল সিংহবাবুদের সঙ্গে ওর এক কিসিমের লড়াই, কালক্রমে দৃশ্যপটে ইংরাজরাও এসে গেছে।

বলে, 'জমিদার আমি হব না কিছুতেই, কোনদিনও চাই না তা, আমার বাবাও চান নি। জমিদারিকে আমি ঘৃণা করি, আমার বাবাও করেন। বাবা মা মরে গেলেই আমি চুয়ামসিনা ছেড়ে চলে যাব।'

—কোথায় যাবে?

প্রিয়ব্রত চুপ করে বসে থাকে। নদীর স্রোতে অনির্দিষ্ট দৃষ্টিখানা ভাসিয়ে দেয়, যেন শৈশবে সনাতনদার বানিয়ে দেওয়া কেয়া পাতার ভেলা। টাল-মাটাল সেই দৃষ্টিখানি নদীর উথাল পাথাল জলে এগোয়, পেছোয়, দিক হারায়, বনবন ঘুরতে থাকে, বারবার টাল খায়...।

প্রিয়ব্রত খুব আত্মস্থ গলায় বলে, 'জানি না।'

সেই বিকেলে প্রিয়ব্রত দীপমালাকে ওর অনেক কথা খুলে বলে। নিজের কথা, দাদু-দিদিমার কথা, সিংহগড়ের আভিজাত্য, প্রজাশোষণ, অহংবৃত্তের কথা। বিশেষ ভাবে বলে মা

লাবণ্যপ্রভা ও বাবা শঙ্করপ্রসাদের কথা। সযত্নে পাকান গুলি থেকে সূতো খোলার ঢং-এ একটু একটু করে খুলতে থাকে ওর শৈশব ও কৈশোরকে, যতটুকু সে জানে, বোঝে, ধারণা ও বিশ্লেষণ করতে পারে, এইটুকু বয়েসে যতখানি সম্ভব।

দীপমালা স্তব্ধ হয়ে শোনে সব।

এক সময় হীরের কুচির মত ঝিকিয়ে ওঠে ওর চোখদুটি।

বলে, 'তোমাদের সিংহগড়ের বাড়িতে যাব আমি। যাবই।'

৪১. দীপমালা রহস্য

সেই থেকে দীপমালা প্রিয়ব্রতকে ক্রমশ অস্থির করে তুলল, 'বল, কবে যাব সিংহগড়ে?'

প্রিয়ব্রত এড়িয়ে যায় বারবার। এটা-ওটা বলে পাশ কাটায়। ওকে বোঝাতে পারে না, হাজার ইচ্ছে থাকলেও দীপমালাকে সঙ্গে নিয়ে সিংহগড়ে ঢোকার অনেক বাধা। সিংহগড়ের আভিজাত্য আর রক্ষণশীলতার সঙ্গে একেবারেই মানানসই হবে না সেটা। গ্রামাঞ্চলও মানসিকভাবে ততখানি এগোয় নি।

একদিন দীপমালা খুব কঠিন গলায় বলল, 'সিংহগড়ে আমি যাবই। যেতে আমাকে হবেই।'

—যেতে হবেই? কেন?

দীপমালা অস্ফুট হাসে। জবাব দেয় না।

গ্রীষ্মে কলেজের ছুটি। প্রিয়ব্রত বাড়ি যাবে। দীপমালার সঙ্গে দেখা হবে না মাসখানেক। সেই কষ্টেই ক'দিন ভুগছিল। যেদিন গাঁয়ে চলে যাবে, তার আগের দিন বিকেলে গন্ধেশ্বরীর পাড়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করল দু'জনে। সময়টা কি করে যেন খুব দ্রুত কেটে গেল। গল্প-গুজবের শেষপর্বে খুব অভিমান সহকারে দীপমালা বলল, 'সিংহগড়ে নিয়ে গেলে না তো আমায়। ঠিক আছে। মনে থাকবে।' প্রিয়ব্রত কিছুতেই বলতে পারে নি, চল দীপমালা, আগামীকাল আমার সঙ্গেই চল।

কিন্তু পরের দিন খুব ভোরে মাচানতলার বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ভীষণ চমক খেল প্রিযব্রত। দীপমালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পায়ের তলায় নামান রয়েছে একখানা টিনের সুটকেশ।

প্রিয়ব্রত আবাক হয়ে শুধোয়, 'কোথায চললে এই সাতসকালে?'

'চুয়ামসিনা।' দীপমালার ঠোঁটের ডগায় রহস্যময় হাসি।

প্রিয়ব্রত যে কী বলবে, ভেবে পায় না। বলে, 'তুমি সত্যি বলছ?'

দীপমালা আবারো নিঃশব্দে মুখ টিপে হাসে।

প্রিয়ব্রতর পিছু পিছু বাসে এসে বসে দীপমালা। বারণ করবার, কিংবা রাগ দেখাবার কোনও সুযোগই দেয় না। কিন্তু প্রিয়ব্রতর অবস্থা ততক্ষণে সঙ্গীন।

বাসে উঠে সারাক্ষণ গোমড়া মুখে বসে থাকে প্রিয়ব্রত। একটাও কথা বলে নি দীপমালার সঙ্গে। কিন্তু দীপমালার সে দিকে নজরই ছিল না। সে বুঝি তার নিজের খুশিতে

মশগুল। সারাক্ষণ, গাঁ-গঞ্জ, ক্ষেত-মাঠ, নদী-জঙ্গল—সব কিছুকে তারিয়ে তারিয়ে দেখতে লাগল মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বিষ্ণুপুরে গরুব গাড়ি অপেক্ষা করছিল প্রিয়ব্রতর জন্য। গরুর গাড়িতে চড়ে দীপমালার কী ফুর্তি। লালমাটির রাস্তা ধরে চলতে লাগল গরুর গাড়ি। পাশে বসে দীপমালা চারপাশের গাঁ-গঞ্জ, গাছ-গাছাল নিয়ে হাজারো প্রশ্ন শুধিয়ে চলেছে প্রিয়ব্রতকে।

আচমকা সে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা প্রিয়দা, তোমাদের দেউড়ির পাশে ঐ বেলগাছটা এখনও অবধি রয়েছে?'

ভীষণ চমকে তাকায় প্রিয়ব্রত। আছে তো বটেই, কিন্তু দীপমালা কেমন করে জানল সে গাছের কথা।

—আর বেলগাছেব লাগোয়া ঐ শিবমন্দিরটা? তোমার মা কি এখনও বিলিতি খরগোস পোষেন, তেতলার ছাদে? আর পায়রাকে নিজের হাতে দানা খাওয়ান? এখনও কি শ্বেত পাথবের গ্লাসে দুধ খায় সিংহগড়ের পুরুষেরা?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রত। দীপমালাকে এক জীবন্ত প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছিল। দীপমালা যা যা বলছে, তার সব কটিই ঠিক। এও ঠিক, প্রিয়ব্রত কোনও দিনও এসব কথা ঘুণাক্ষরে বলে নি ওকে।

দীপমালা মিটিমিটি হাসছিল। বলে, 'তুমি বোধ করি বেজায় ধন্দে পড়ে গিয়েছ? যাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ, তার সঠিক পরিচয় তোমার জানা নেই, অথচ সে তোমাদের অন্ধিসন্ধি সবকিছু জেনে বসে আছে!'

বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল দীপমালা।

দীপমালাকে নিয়ে সিংহগড়ে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল সারা গাঁয়ে। মূল সিংহগড়ের গা ছুঁয়ে ছোট তরফ প্রতাপলাল সিংহবাবুর গড়। তারা কেমন করে জানি রটিয়ে দিল, প্রিয়ব্রত শহর থেকে এক বাঈজীকে বিয়ে করে এনেছে। লাবণ্যপ্রভাব মুখে শীতল কৌতূহল, খোকা, মেয়েটি কে?

—এ হল দীপমালা, আমার এক বন্ধুর মামাতো বোন। সিংহগড় দেখবার তার অদম্য কৌতূহল।

বাকিটা আমিই বলব, মাসীমা। দীপমালা খুব নম্রভঙ্গিতে প্রণাম করেছিল লাবণ্যকে। লাবণ্য স্থিব দৃষ্টিতে জরিপ করেছিলেন দীপমালাকে। কথা বাড়ান নি। ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন অন্দর মহলে সরযুর কাছে।

সেদিন সারা বিকেল, সন্ধে দীপমালাকে আর একান্তে পায় নি প্রিয়ব্রত।

শুধু ঐদিনই নয়, তার পরের দিনগুলোতেও যে ক'দিন দীপমালা ছিল সিংহগড়ে, প্রিয়ব্রতর সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল সামান্যই।

তার পুরো দখল নিয়েছিলেন মা লাবণ্য। দিদিমা সরযুবালাও তাঁকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। দীপমালার আগমন নিয়ে যে ঝড়ের আশঙ্কা করেছিল প্রিয়ব্রত সে ঝড় মৃদুভাবেও ওঠে নি। আর সেটাই ছিল ওর কাছে এক ঘোরতর বিস্ময়ের ব্যাপার।

যে ক'দিন ছিল দীপমালা, সিংহগড়ে, মা এবং দিদিমা তাকে যেন দু'জোড়া পাখনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন সারাক্ষণ। দীপমালা সারাক্ষণ ওঁদের সান্নিধ্যেই কাটাত সারাটা সময়। তাঁদেব নিজস্ব কথা ছিল অনেক, গুনগুনিয়ে সেই সব কথাই বলতেন তিনজনায়। রাতের বেলায়, তিনতলার খোলাছাদে মাদুর পেতে বসতেন ওঁরা, গল্প-গুজবে বুঁদ হয়ে যেতেন। দিদিমাব বয়স হয়েছিল, তিনি অধিক রাত অবধি জাগতে পারতেন না। নেমে আসতেন দশটা নাগাত। তারপরও অনেক রাত অবধি খোলা ছাদে একান্তে বসে থাকতেন লাবণ্য এবং দীপমালা। বোজ কত রাতে যে ওদের আসর ভাঙত, বুঝতে পারত না প্রিয়ব্রতও। তবে ওর সন্দেহ হচ্ছিল ধীরগতিতে, ওদের তিনজনের কোন একটা একান্ত বিষয় রয়েছে যা নিয়ে কথা বলতে বলতে ওরা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সময় যে কখন কোথা দিয়ে বয়ে যায় হুঁশ থাকে না কারোরই। দীপমালাকে শুধোলে সে কেবল মুচকি হেসে সরে যেত।

পরে, বেশ কিছুদিন বাদে পুরো ব্যাপারখানা ভেঙেছিল দীপমালা।

শুনে প্রিয়ব্রতর সারা শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ।

প্রথম বারেব সফরে সুদর্শনের সঙ্গে দেখা হয় নি দীপমালার। ভয়ে, সঙ্কোচে কিংবা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, সরযু ওকে সুদর্শনের সামনে নিয়ে যেতে চান নি। দেখা হল দ্বিতীয়বারের সফরে। সেটা সম্ভবত উনিশশো ছেচল্লিশ সাল। মাত্র দু'দিনের জন্য দীপমালা গিয়েছিল সিংহগড়ে। একদিন সরযু দীপমালাকে নিয়ে গেলেন সুদর্শনের ঘরে। সুদর্শন সিংহবাবু তখন পঙ্গু। হাঁটুর থেকে দু'খানা পা-ই কাটা গেছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। দোতলার একেবারে দক্ষিণের ঘরখানাতে দিনরাত শুয়ে থাকতেন তিনি। শুয়ে থাকতেন, আর আকাশ-পাতাল কত কিছু ভাবতেন। কথা বলতেন খুবই কম। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে যেন কথা বলতেন নিজেরই সঙ্গে। ততদিনে মাথায় বুঝি সামান্য গোলমাল দেখা দিয়েছিল ওঁর। কথা বলতে গিয়ে জিভ জড়িয়ে যেত, আর বাক্যগুলো ছিল খুবই অসংলগ্ন। যে রেডিওখানা বছর দশেক আগে সখ করে কিনেছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর শেষ জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। সারাক্ষণ আপন মনেই বেজে যেত যন্ত্রটা। গান, বক্তৃতা, কৃষিকথা, নাটক... সুদর্শনের কানে তার বিন্দু-বিসর্গ পৌঁছুতো কিনা সন্দেহ।

একদিন সেই ঘরে দীপমালাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন সরযু। দীপমালা নিঃশব্দে প্রণাম করেছিল সুদর্শনকে। দীপমালাকে দেখে তেমন কিছু কৌতূহল কিংবা তাপ-উত্তাপ দেখা যায় নি ওঁর মুখে। বেশ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে।

সরযু মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা।'

দীপমালার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন সুদর্শন। তার ঘোলটে চোখের মণিতে বারংবার ফুটে উঠেছিল এক ধরনের অস্থিরতা। চাপা উত্তেজনায় তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ তিরতির করে কাঁপছিল। এক সময় বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'এ কি সত্যি!'

ঠোঁটের ফাঁকে হেসেছিলেন সরযু, 'সত্যি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।'

তারপরও অনেকক্ষণ ধরে দীপমালার মুখখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করেছিলেন দাদু। এক সময় তাঁর ডান হাতখানা ধীরে ধীরে উঠে এসেছিল। দীপমালার মাথায়, পিঠে,

অনেকক্ষণ ধরে নড়ে চড়ে বেড়িয়েছিল সে হাত। কিন্তু আশ্চর্য, দীপমালাকে একটি প্রশ্নও শুধোন নি তিনি।

তারপর যে ক'দিন সিংহগড়ে ছিল দীপমালা, মাত্র কয়েকবার খুব অল্প সময়ের জন্য গিয়েছে সুদর্শনের ঘরে। আর যতক্ষণ থেকেছে ও, সুদর্শনের দু'চোখের মণি জুড়ে সেই চাপা অস্থিরতা আর শরীর জুড়ে তিরতিরে কাঁপুনি। সারাক্ষণ ওঁর একখানি হাত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়িয়েছে দীপমালার মাথায়, পিঠে...। কিন্তু একদিনের জন্যও দীপমালাকে মুখ ফুটে কিছুই বলেন নি তিনি।

এ সব পরবর্তীকালে দীপমালার মুখেই শোনা প্রিয়ব্রতর। দীপমালা তখন পরতে পরতে খুলতে শুরু করেছে তার শরীরে জড়িয়ে থাকা রহস্যের জালখানি।

৪২. ফসল কাটার পালাগান

তেরই আগস্ট উনিশশো উনপঞ্চাশ।

মাঝিপাড়ায় ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বসে পবন শিকারির মারফত শুভ খবরটা পেয়েছিল প্রিয়ব্রত। কনকপ্রভা মা হয়েছে। মাত্র তিন দিন আগে নির্বিঘ্নে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে।

পবন শিকারি দাঁত গিজুড়ে হাসে, 'পরশু থিক্যে আপনাকে আইজ্ঞা খুঁইজে খুঁইজে আলা।'

মনে মনে তখন খুশির জোয়ারে ভাসছিল প্রিয়ব্রত। ইচ্ছে করছিল, একদিনের জন্য হলেও ছুটে যায় সিংহগড়ে। কিন্তু উপায় ছিল না। আর দু'দিন বাদেই অগ্নিপরীক্ষার সেই নির্ধারিত দিন। পার্টির এতদিনের পরিশ্রম, ধৈর্য, তিতিক্ষা সব কিছুই একটা পরিপূর্ণ রূপ পেতে চলেছে। এতদিন সবাই মিলে জমি তৈরি করেছে, বীজ বুনেছে, সার-জল জুগিয়েছে, নিড়ানি দিয়েছে, এবার এক প্রস্থ ফসল কাটবার পালা। যে কাজ শুরু করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা, দিবাকর দত্ত, বিমল সরকার, মানিক দত্তর মতো জনাকয় ব্যক্তি, সে কাজের পেছনে আজ এসে দাঁড়িয়েছে হাজারে হাজারে গরীব, নিরন্ন মানুষ। এই বোবা মানুষগুলোর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে এতদিন নিজের ঘরে ফসল তুলে নিত কিছু চালাক, ধুরন্ধর মানুষ। সেই বোবা মানুষগুলোই আজ সিধে হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে। এখন আর তাঁরা একা নন। সারা জঙ্গলমহল জুড়ে অগণিত লায়েক-লোহার-খয়রা-মাদোড়-বাউরি-বাগদি এখন তৈরি। এখন শুধু শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায়। স্থির হয়েছে, আগামী পনেরই আগস্টকে 'সাম্রাজ্যবাদী দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। ওই উপলক্ষে বিষ্ণুপুর শহরে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে মিছিল করা হবে। ঐ নিয়ে মাঝিপাড়ায় ঘোর জঙ্গলের মধ্যে পিয়াল গাছের ছায়ায় বসেছে নেতাদের শেষ মন্ত্রণাসভা। শেষ মুহূর্তের কর্তব্যকর্মগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন সবাই। বৈঠকে সামনের সারিতে বসেছেন জগন্নাথপুরের নির্মল লায়েক, মাদল মহাদণ্ড, কাটুলের সহদেব টাণ্ডি, নলিনী টাণ্ডি, মাঝি পাড়ার পশুপতি লোহার, বাসুদেবপুরের শরৎ লোহার, বাঁধগাবার বৃন্দা বাউরি, সুরধনী বাউরি...। উল্টোদিকে পাশাপাশি বসেছেন মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা, সন্তোষ সাহা, মানিক দত্ত, বিমল সরকারের মতো নেতারা। প্রিয়ব্রত আর পরীক্ষিত বাউরি বসেছিল সামান্য

তফাতে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাদেও সারা এলাকার প্রতিটি গাঁয়ের দু'একজন প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ আজ উপস্থিত। শেষ পর্বের শেষ সিদ্ধান্তটি শুনে ঘরে ফিরতে চায় ওরা। কুরিয়ারদের মারফত খবরটা অতি গোপনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সারা এলাকাময়। খবর চলে গেছে জেলা শাখার নেতৃবৃন্দের কাছে। তারিখ, সময়, জমায়েতের স্থান,—সবকিছুই চূড়ান্ত। শুধু নির্দিষ্ট লগ্নটি এবার এলেই হয়।

ইংরেজী আটচল্লিশ সাল। তখন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করেছে সরকার। আর দেখতে দেখতে নেতারা সব আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলেন। পার্টি গোপন সিদ্ধান্ত নিল সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, আর বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকাকে 'মুক্তাঞ্চল' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই দুই এলাকা জুড়ে ক্ষেত মজুরদের নিয়ে গড়ে তোলা হবে জঙ্গী সংগঠন। নেতারা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকেই গড়ে তুলবেন এই সংগঠন। মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা আর বিমল সরকার কালাপানিফেরৎ বিপ্লবী। তাঁদের ওপরই এই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

পরীক্ষিত বাউরি প্রিয়ব্রতকে একদিন নিয়ে গিয়েছিল জয়পুরের জঙ্গলে। গভীর জঙ্গলে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জার সঙ্গে দেখা হল। সিংহগড়ের ছেলে বলে তাঁর মনে প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল। পরীক্ষিত বাউরি বলেছিল, ইনি আইজ্ঞা দৈত্যকুলে পল্লাদ। ততদিনে সারা জঙ্গলমহল জুড়ে শুরু হয়ে গেছে তেভাগা লড়াইয়ের প্রস্তুতি। প্রিয়ব্রত একটু একটু করে মাখতে লাগল সে আগুন। এক সময় জ্বলন্ত আগুনের বৃত্তের মধ্যেই ঢুকে পড়ল।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জাকে চেনা যাচ্ছিল না। এই ক'মাসে সারা এলাকা জুড়ে চরকির মতো ঘুরেছেন তিনি। নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন নি। পেছনে সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরেছে সরকারী হুলিয়া। তাঁর মাথার দাম নগদ একহাজার টাকা। টাকার লোভে অনেক হায়েনারই চোখ চকচক করে ওঠা স্বাভাবিক। কাজেই অনেক বেশি সতর্ক হতে হয়েছে তাঁকে। এ ক'মাস একদণ্ড বিশ্রাম পান নি তিনি। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাতভর জঙ্গলের শুঁড়ি পথে পথে হেঁটে ভোরের আগে পৌঁছুতে হয়েছে দশ মাইল দূরের গাঁয়ে। সেখানে চলেছে দিনভর বৈঠক। কর্মী সম্মেলন। মাঝে মাঝে কুকুরের মতো শুঁকতে শুঁকতে অতর্কিতে হাজির হয়েছে পুলিশ বাহিনী। প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে হরেক কৌশলে। সব মিলিয়ে প্রতি মুহূর্তে শরীর ও মনের ওপর অবর্ণনীয় ধকল সয়েও তাঁকে মুখ বুঁজে কাজ করে যেতে হয়েছে। সামান্য তফাতে বসে প্রিয়ব্রত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মৃত্যুঞ্জয়ের মুখখানি। ইস্পাতের মত কঠিন মুখমণ্ডলে যেন প্রচ্ছন্ন ক্লান্তির ছাপ। চোখদুটো ঢুকে গিয়েছে কোন গভীরে! দেখতে দেখতে চিন্তিত হয়ে ওঠে প্রিয়ব্রত। আসন্ন পনেরই আগস্টের বিশাল কর্মযজ্ঞের ধকল কি নিতে পারবেন ক্লান্ত মানুষটি। আরও একজন আরও ঢের বেশি উদ্বিগ্ন এই মানুষটিকে নিয়ে। ক্ষীরাইবনির পুষ্পদি। মৃত্যুঞ্জয়ের বর্তমানের আশ্রয়। মাঝে মাঝেই উতলা হয়ে ওঠেন তিনি। গলায় গাঢ় আশঙ্কা ফুটিয়ে বলেন, মানুষটার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। উ আর লারছে। তোমরা লোকটাকে কিছুদিন বিশ্রাম দাও। কিন্তু কে ওঁকে বিশ্রাম দেবে। তেমন কথা সাহস করে কে-ই বা বলবে ওঁকে! ছুটন্ত আরবি ঘোড়াকে থামাবার সাধ্যি কার! বিমল সরকার, মানিক দত্তর মতো নেতারা দু'একবার কথাটা তুলতে গিয়ে ধমক খেয়েছেন। খুব গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়, বিশ্রাম লিআ তো দূরের কথা, আমার এখন মইর্‌বারও সময় নাই।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সিংহগড়ে যাওয়ার ইচ্ছেটাকে পুরোপুরি গিলে ফেলেছিল প্রিয়ব্রত। পবন শিকারিকে বলেছিল, 'তুই ফিরে যা পবন। মাকে বলিস, আমি যত জলদি সম্ভব ফিরব। বলিস, আমার জন্য যেন চিন্তা না করে।'

৪৩. প্রস্তুতির রাত

উনিশ শো উনপঞ্চাশের চোদ্দই আগস্ট।

মাঝরাত থেকে জমায়েত শুরু হয়েছিল মনসাপাড়ায়। যতই সময় এগোচ্ছিল, কাতারে কাতারে বাড়ছিল মানুষ। বেদ্‌বি, জগন্নাথপুর, শিবের-ডাং, কাটুল, তীরবাঁক, পানশিউলি, বাসুদেবপুর, মাগুরা, এমন কি সেই সুদূর গড়বেতার সন্ধিপুর থেকেও এসেছে দলবদ্ধ মানুষ। চোদ্দই আগস্ট রাতে, মনসাপাড়ার পুকুর পাড়ে মানুষের ঢল নেবেছিল।

জমায়েতে মেয়ে-মদ্দ, বুড়ো-বুড়ি সবাই ছিল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় থমথম করছিল সবাইয়ের মুখ। চাল ধোওয়া জলের মতো ঘোলাটে জোৎস্নায় চকচক করছিল বল্লমের ডগা, টাঙ্গির শরীর। কেউ খালি হাতে আসে নি সে রাতে। প্রত্যেকের হাতে কোনও না কোনও অস্ত্র। পেটের সম্বল হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ চিঁড়ে-মুড়িও ছিল কারও কারও কোঁচড়ে। মানুষগুলো শুয়ে পড়েছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ডাঙার ওপর, মহুল গাছের তলায়, টিবির পাশে। বিশ্রাম নিচ্ছিল। ক্ষণ গুনছিল।

থমথম করছিল মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যার মুখ। হাজার চিন্তা কিলবিল করছিল মাথায়। অনেক সংশয় জড়ো হয়েছিল বুকে। এক বড়সড় কাজের মহড়া নিতে চলেছে ওরা। সারা জঙ্গলমহল জুড়ে একটা সংগঠিত সশস্ত্র কৃষক-আন্দোলনের প্রস্তুতি। আগামী ভোরের মহামিছিল তারই একটা মূর্তিমান ইঙ্গিত। ধীরে ধীরে এই বিশাল আন্দোলনের পটভূমি আরও বিশাল হবে। এই আন্দোলনের সামিল হবে দেশের তাবৎ বুভুক্ষু কিষাণ। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে বেরিয়ে আসবে ইস্পাতের মত কালো ধারাল মানুষ। পশুর জীবন ছেড়ে তারা মানুষের অধিকার দাবি করবে। লাঙ্গল যার, জমিন তার। তেভাগা আইন কায়েম কর। জঙ্গলের কাঠ-পাতা, ফল-পাকুড়ের অধিকার আদিবাসীদের দিতে হবে। মধ্যসত্ত্বের বিলোপ চাই। এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। সেই আগামী দিনের ভাবনাটা বড় অস্থির করে তোলে মৃত্যুঞ্জয়কে।

বিমল সরকার আর মানিক দত্ত চরকির মতো ঘুরছিল মানুষগুলোর মধ্যে। খোঁজ-খবর নিচ্ছিল প্রত্যেকের, কোন গাঁয়ের কারা এল, কারা আসে নি...। মহামিছিলের পুরো পরিকল্পনাটা বারংবার পাখি-পড়ানোর মতো করে পড়াচ্ছিল ওদের। সারবন্দী হাঁটবে সবাই, দুই সারিতে দাঁড়াবে, কোনও অবস্থায় লাইন ভাঙবে নাই, আগে যাবেক মেয়াদের লাইন। লাইনে হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে নাই। নেতার হুকুম ছাড়া কোনও কাজ করবে নাই। খবরদার। পুলুশের সামনা সামনি হলে, ঘাবড়াবে নাই। পিছাবে নাই। কাঁদানি-গ্যাস ছুঁড়লে চোখে জল দিবে ঘনঘন। গুলি ছুঁড়লে শুয়ে পড়বে তৎক্ষণাৎ। আর, কোনও অবস্থায়, কিছুতেই, জমায়েত ছেড়ে পালাবে নাই। লাঠি চললেও, লয়। গুলি চললেও, লয়। যারা ডরছুটকা, এই বেলা ঘরে ফিরে যাও। যাদের হাজত খাটতে ভয়, এই বেলা ঘরে যাও। এ ছেলেখেলা লয়। এ হল আগুন লিয়ে খেলা।

'ফিরে যাবার তরে আসি নাই হে।' অন্ধকার থেকে ভেসে আসে মেয়েলি গলা। কে বইল্‌লেক বটে কথাটা? কে বটে?

মউলগাছের তলায় শুয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল সুবাসী লায়েক। প্রিয়ব্রত সামান্য তফাতে বসে চিনতে পেরেছিল ওকে। জগন্নাথপুরের সুবাসী লায়েক, ইউনিয়ন বোর্ডের জাঁহাবাজ প্রেসিডেন্ট রামরতন প্রতিহারের কাছা খুলে দিয়েছিল। প্রিয়ব্রত তখন অবস্থান করছিল জগন্নাথপুর গাঁয়ে। বেশি দিনের কথা নয়, বড় জোর তিন-চার মাস হবে। পয়লা মে তারিখে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়েছিল আধকাটার মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়

বাড়ুজ্জা, বিমল সরকার, মানিক দত্ত, প্রমথ ঘোষের মতো নেতারা। তাঁরা নিজেরা কিন্তু লাল পতাকা তোলেন নি, তুলিয়েছিলেন এলাকার এক শ্রমিক-সন্তান ভবতারণ লাডুকে দিয়ে। পতাকা উত্তোলনের পর মিছিল বেরিয়েছিল। মিছিলের প্রথমের সারিতে ছিল মেয়েদের মধ্যে সুবাসী লায়েক।

মিছিল গেল আধকাটা থেকে মাগুরা। সেখান থেকে কুচিয়াকোল। মাঝপথে আয়না গাঁয়ের মুখে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জয়পুরের দারোগা বীরেন তলাপাত্র। বিষ্ণুপুরের দারোগা হেম বাবু...। মিছিল চলছে দু' লাইনে। মেয়েরা মূলত সামনের দিকে। পুলিশের দিকে এগিয়ে যায় ভবতারণ লাডু, সুবাসী লায়েক। বলে, এই স্বাধীনতায় আমরা কী পেল্যম? কেন আমাদের ভাগচাষের জমিন কেড়ে লেয়? কেন ভাগচাষীদের কাছ থিক্যে আধা ফসল লিয়া সত্ত্বেও বাবুদের খাস-দখলের জমিন বেগার খাইট্যে চাষ কইর‍্যে দিতে হয়? কেন উয়াদ্যার খাসের ডাঙাগুলানকে বেগার খাইট্যে ভেঙে চাষের জমিন বানাই দিতে হয়? কেন বাবুদের জঙ্গলের গাছ আমাদের বেগার খাইট্যে কাইট্যে দিতে হয়? কেন আমরা লেহ্য মজুরি পাচ্ছি নাই? স্বাধীনতার পর দু'বছর হইয়েঁ গেল্যাক, এখন তক্ক কেন মধ্যস্বত্ব লোপ পাইল্যাক নাই? ক্যানে শিবের ডাং-এর লক্ষ্মণ সর্দার আর শ্যাম সর্দারের ঝুপড়ি-ঘর হাতি দিয়ে ভেঙে দিল্যাক কুচিয়াকোলের রাজারা? বাবুরা, জবাব দ্যান। আমরা এইসব দাবি লিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিল কচ্ছি, আমাদ্যারকে আটকাচ্ছেন ক্যানে? মিছিল এগিয়ে চলে, পুলিশবাহিনী পাথরের মতো খাড়া থাকে তফাতে। মিছিলের আকার-অবয়ব দেখে পুলিশের চক্ষুস্থির। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়।

কুচিয়াকোল বাজার হয়ে ময়নাপুর হয়ে মিছিল গেল পড়াইটি গাঁয়ে। ঐ গাঁয়ের গৌর মণ্ডল ছিল জোতদার। পরের দিন সে থানায় ডাইরি দিল, মিছিল নাকি চড়াও হয়ে তার বাড়িতে আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছিল। শুরু হল, আগুন লাগানোর মামলা। নেতা-কর্মীরা গেল অন্তরালে। শুরু হল পুলিশের সঙ্গে পার্টির কানামাছি খেলা।

মামলা চলল মামলার মতো, মানুষ চলল মানুষের মতো। দিন কতক বাদে আবার মিটিং হল, মাগুরা গাঁয়ে। মজুরি-বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু হবে। অন্ততঃ একটা গাঁয়ে মজুর বয়কট করা হবে পরীক্ষামূলকভাবে। স্থির হল, জগন্নাথপুরে প্রতিহারদের মজুরি বয়কটের মাধ্যমেই শুরু হবে এই আন্দোলন। খবর কাগজে পোস্টার লেখা হল, বইরকুড়ি ফলের আঠা দিয়ে সেইসব পোস্টার চিটানো হল সারা জগন্নাথপুর গাঁয়ে। বাগাল, মুনিষ, মাইন্দার, সব

বন্ধ হয়ে গেল, প্রতিহারদের। রামরতন প্রতিহার গেলেন পুলিশের কাছে। শালাদের বাঁধুন। পুলিশ বলে, কেউ যদি কাজ করতে না চায়, আমরা তাদের তো বাধ্য করতে পারি না। রামরতন ফুঁসতে লাগলেন ঘরে বসে, তাঁর জমিন-জিরেত সব পতিত পড়ল।

হেনকালে একদিন সুবাসী লায়েক বেদ্‌রির জঙ্গলে কাঠ কেটে, বেচে, পাঁচটি টাকা পায়। সে যায় প্রতিহারদের দোকানে চাল কিনতে। রামরতনের দোকানের কর্মচারী অতশত জানে না, তাকে চাল দিয়ে দিয়েছে। চাল নিয়ে ঘরে ফিরছে সুবাসী, পথে রামরতনের সঙ্গে দেখা। বলে, চাল কুথা পেলু রে? সুবাসী বলে, তুমাদ্যার দুকানে কিনল্যম। রামরতন তো রেগে কাঁই। তুয়াকে চাল দিল্যাক কুন শালা? তুয়ারা আমার লেবার বয়কট করছু, আমার দোকানের মাল তুয়াদ্যারকে বিকব নাই। সুবাসী বলে, হায় বাপ, পইসা দিব, জিনিষ লুব, উয়াতে কিসের বাধা? এই নিয়ে তর্কাতর্কি। রামরতন সুবাসীর কোঁচড়ে টান মেরে চালগুলো ফেলে দেয় মাটিতে। সুবাসীর মাথায় আগুন জ্বলে যায়। সে তৎক্ষণাৎ রামরতনের মতো নামী মানুষকে খালভরা, মা-মেইগ্যা বলে বাখান দেয়। রামরতন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বাঁশের লিকলিকে কঞ্চি তুলে নিয়ে পাগলের মতো চাবকাতে থাকে সুবাসীকে। বিশ-পঁচিশ ঘা বেত খেয়ে সুবাসীর সারা শরীরে প্যাঁকাল মাছ। ফাঁকা শুনশান ডাঙায় একাকিনী সে তারস্বরে কাঁদতে থাকে। সুবাসীর কান্না দেখে রামরতনের উল্লাস বেড়ে যায়। সে বিপুল বিক্রমে ফের চাবকাতে থাকে সুবাসীকে। হেনকালে সুবাসী এমন এক কাণ্ড করে, যা তল্লাটের কোনও লায়েক-লোহারের মেয়ে ভাবতেও পারে না। আচমকা রামরতনের কাপড়ের কোঁছা টান মেরে খুলে দিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়।

দু'চার ঘা চড়-চাপড় হলে কথা ছিল, কিন্তু রামরতনের মত মানী লোকের পক্ষে এই কাছা খুলে দেওয়াটা হয় চরম লৃতি-লাঞ্ছনার সামিল। সে কাউকে বলতেও পারে না তার এই অভিনব বেইজ্জতির বৃত্তান্ত।

সুবাসী পাড়ায় ফিরে গিয়ে ঘটনাটা বলে। পরের দিন খবর চলে যায় শিবের-ডাং গাঁয়ের লক্ষ্মণ সর্দারের কাছে। লক্ষ্মণ সর্দার খবর পাঠায় মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যা আর ভবতারণ লাড়ুর কাছে। শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে যান ওঁরা। সেই রাতেই খবর চলে যায় গোঁসাইপুর, আস্তাশোল, তীরবাঁক ইত্যাদি গাঁয়ে। মিটিং বসে গভীর রাতে। স্থির হয় প্রতিহারদের চালের দোকান লুট করে নেবে ভুখা জনতা।

সুবাসীর গলার আওয়াজ শুনে প্রিয়ব্রত পায়ে পায়ে মউলতলায় আসে।

বলে, 'সুবাসীরে, কাল যাদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে উয়ারা সব খাঁকি পোষাকের পুলিশ। তাদের প্যান্টে তো কাছা নেই। তুই কী ধর্‌য়ে টান মারবি?'

সুবাসী খিলখিলিয়ে হাসে। বলে, 'কাছা নাই, ঠিক বটে, কিন্তু উয়াদ্যার পিছে একটি কইর‍্যে ল্যাজ রয়্যেছে নির্ঘাৎ। উই ল্যাজ ধইর‍্যে টান মারব, কোকিলদা।'

কিস্তিতে কিস্তিতে মানুষ আসছে। মিশে যাচ্ছে জনস্রোতে। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তরণ। তার আড়ালে চাঁদটা তির তির করে হাঁটে। ভাদ্রের পচা গরমে দিনমানে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে লোকগুলো। এখন এই শেষ রাতে হু-হু করে ছুটে আসে হেঁড়ে পর্বতের জঙ্গলের

উদোম হাওয়া। মানুষগুলো সেই ঘুম-পাড়ানি হাওয়ায় সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। আধো অন্ধকারে কোনও গাছের তলা থেকে ভেসে আসে সমবেত ভাদুগানের সুর।

সারা নিশি কাইট্যে গেল্যাক, কালো শশী আইল্যাক নাই,
শুখাল্যাক ফুলের বাসর, মালা দিবা হইল্যাক নাই।

দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসার বিরাম নেই। এক একটা দল পৌঁছোয়, মৃত্যুঞ্জয় বাড়ুজ্জার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কোথাকার লোঁক?

খড়িকাগুলি।

খড়কাটার লোক কুথা?

আসতিছে।

বস তুমরা, জিরাও।

শেষ রাতে মনসাপাড়ার পুকুর পাড়ে মানুষ, শুধু মানুষ! যেদিকে দু'চোখ যায় জঙ্গলমহলের কালো কুচকুচে মানুষ। গোনাগুনতির উপায় নেই, তবে দশহাজারের ওপর।

খবরটা যথা সময়ে চলে গেছে পুলিশের অফিসে। সেখানেও বিনিদ্র রাত কাটছে সবাইয়ের। প্ল্যান কষছে। নির্দেশ পাঠাচ্ছে চতুর্দিকে। ঘুপচি ঘরে টানাপাখার তলায় গলদঘর্ম সবাই।

এস-ডি-ও মানুষটি ক্ষীণকায়। পেটের রোগী। রগচটাও সেই কারণে। রাত্রি জাগবার অভ্যেস নেই বড় একটা। বিরস বদনে বসে রয়েছেন তিনি নিজের বাংলোয়। বাংলোর সুমুখে সার সার পুলিশ।

থানার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে হাতে বিলি হচ্ছে। যে যার নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে চলে যাচ্ছে সশস্ত্র। অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মজুত হচ্ছে।

সর্বত্র সাজো সাজো রব। আশঙ্কায় কালো মুখ। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে একটা সকাল আসছে। স্বাধীনতা দিবসের সকাল। কথা ছিল, কোর্টের সামনের মাঠে বহুবর্ণ সামিয়ানা খাটানো হবে। সারি সারি চেয়ার পাতা হবে। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সপরিবারে সেইসব চেয়ারে সমাসীন হবেন। সারা মাঠ জুড়ে মহকুমার তাবৎ পুলিশ ফোর্স কুচকাওয়াজ করবে। এস-ডি-ও সাহেব গলাবন্ধ কোট ও মাথায় জহর-টুপি পরে পতাকা উত্তোলন করবেন, স্যালুট নেবেন। পুলিশের ব্যাণ্ড বাজবে তালে তালে। কিন্তু সব কিছুই ভণ্ডুল হয়ে গেল। কাচারি মাঠের বদলে তাবৎ ফোর্সকে দলে দলে পাঠাতে হয়েছে বিভিন্ন ঘাঁটিতে। স্যালুট নেবার বদলে এস-ডি-ও সাহেবকে সদা শঙ্কিত থেকে সৈন্য চালনায় সামিল হতে হবে।

কি যে ঘটবে, এই কালরাত্রিটুকু পোহালে!

৪৪. দশ হাজার বামন অবতার

১৫ই আগষ্ট। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বেজে ওঠে অসংখ্য লাকড়ার গুরুগম্ভীর আওয়াজ। রাঢ়ের নৈশ প্রকৃতির বুক ঝাঁঝরা করে সে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলমহলের আকাশে বাতাসে।

গাঁ-গঞ্জের ঘুমিয়ে থাকা মানুষজন ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ঘুমন্ত শিশুরা মায়ের কোলে আচমকা কেঁদে ওঠে। তাবৎ সুখী মানুষের শেষ রাতের নিটোল ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে উন্মত্ত লাকড়াগুলো বাজতে থাকে অবিরাম। যারা বাড়িতে বসে ইতস্তত করছিল তখনও, লাঠি-সোটা নিয়ে দৌড় মারে লাকড়ার বাদ্যির আওয়াজকে নিশানা করে। এ যেন এক সর্বনাশা আকর্ষণ। যেন নিশির ডাক। এ ডাককে উপেক্ষা করবার শক্তি মানুষগুলোর নেই।

ভোরের আলো তখনও ফোটে নি, সবাই সারবন্দী দাঁড়িয়ে গেল বিশাল ডাঙার মধ্যিখানে। প্রথমে মেয়েদের লাইন। লাইনের প্রথমেই সুরধনী, বৃন্দা বাউরি, বাসুদেবপুরের সুখী বামনী, জগন্নাথপুরের সুবাসী লায়েক,... তারপর একে একে প্রায় আড়াই হাজার মহিলার দীর্ঘ লাইন। মেয়েদের পেছনে পুরুষেরা। তাদের সংখ্যাও আট-ন'হাজারের কম নয়। প্রত্যেকের এক হাতে লাল ঝাণ্ডা, অন্য হাতে অস্ত্র। লাঠি, দা, সানদা, বল্লম, টাঙি...।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যা চিৎকার করে ওঠেন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় সে আওয়াজ। তার বেশ কিছুদিন বাদে প্রিয়ব্রত হাজতে থাকাকালীন পাহারাদার পুলিশের মুখে গল্প-গুজবের মাধ্যমে শুনেছিল, ঐ ভোরে দশহাজার মানুষের এক যোগে স্লোগানের আওয়াজে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বসে থাকা সশস্ত্র পুলিশের অনেকেরই কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গিয়েছিল। এক রোগা-প্যাটকা সিপাই ওকে একান্তে জানিয়েছিল, 'কি বইল্‌ব ছোটবাবু, মনে লিচ্ছে, যেন লালবাঁধের পুব পাড়ে হাজার হাজর উপাসী বাঘ এক যোগে হুঁকরাচ্ছে!'

ধীরে ধীরে অতি সুশৃঙ্খল পায়ে এগিয়ে চলে মানুষের মহামিছিল বাঁকাদহের দিকে। ঘন ঘন স্লোগান দিতে থাকে মানুষ ঃ এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। ভারত তুমি কমনওয়েল্‌থ্‌ ছাড়। লাঙ্গল যার জমিন তার। কৃষি মজুরি বাড়াতে হবেক। জঙ্গলকে সাধারণের সম্পত্তি ঘোষণা কর। আভি কর, জলদি কর...। মিছিল বন্ধের কালা কানুন, মিছিল দিয়ে রুখতে হবেক। একের পর এক স্লোগান আছড়ে পড়ছে রাঢ়ভূমির হাওয়ায়। ছন্দোবদ্ধ পায়ে এগিয়ে চলেছে দশ সহস্রাধিক দুঃসাহসী মানুষ। লাকড়া বাজছে তালে তালে। মিছিলের দৈর্ঘ্য সাত থেকে আট মাইল।

বাসুদেবপুরে পুলিশের জব্বর ঘাঁটি। অনেক সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন। ওখানেই প্রথম আঘাতটা আশা করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যা স্বাধীনতার তৃতীয় প্রভাতে এখানেই বুঝি মানুষের রক্তে নদী বহানোর আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশ-ঘাঁটিটা দূর থেকে নজরে পড়ে। আশেপাশে কোনও পুলিশ না দেখে চিন্তায় পড়লেন মৃত্যুঞ্জয়। কোন্ ফাঁদ পেতেছে ওরা, কোন্ ঝোপে-ঝাড়ে ওৎ পেতে রয়েছে শিকারের অপেক্ষায়, সেই চিন্তায় ক্রমশ গম্ভীর হয়ে আসে ওঁর মুখ।

মিছিলটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল। কেউই বাধা দিল না। কেবল ঘাঁটিখানা পেরিয়ে যেতে যেতে প্রিয়ব্রত লক্ষ করেছিল, ঘাঁটির ভেতর থেকে অসংখ্য রাইফেলের নল রাস্তার দিকে তাক করা রয়েছে।

সেই ভোর থেকে, এমন প্রবল উত্তেজনা ও আশঙ্কার মুহূর্তগুলি পার হতে হতেও প্রিয়ব্রতর চোখদুটি আতিপাঁতি খুঁজে বেড়াচ্ছিল একজনকেই। কিন্তু আড়াই-হাজার মহিলার মধ্যে সেই বিশেষ মুখখানি কিছুতেই চোখে পড়ে নি তার।

ভেবেছিল এই মহামিছিলেই দীপমালার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু দীপমালা আসেনি।

মিছিলের মাথাটা যখন বিষ্ণুপুর শহরে ঢুকল, লেজটা তখনও রয়েছে মড়ারের কাছাকাছি। এমন অন্তহীন জনস্রোত এ তল্লাটের মানুষ এর আগে দেখে নি। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ প্রত্যক্ষ করছিল সেই দৃশ্য। ভুখা মানুষের তেজ আর দুঃসাহস দেখে তারা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা ছিলেন মিছিলের মাঝখানে। হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রিয় নেতাকে বেষ্টন করে এগোচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের পরনে ছিল খাটো ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় লাল গামছার পাগড়ি। হাতে পেতল দিয়ে বাঁধানো লাঠি। বছরখানেক তিনি নিরুদ্দিষ্ট। পুলিস তাঁর নামে হুলিয়া বের করেছে। তাঁর মাথার দাম এক হাজার টাকা। মৃত্যুঞ্জয় এমন প্রকাশ্য মিছিলে হাঁটুন, এতে সায় ছিল না অন্য নেতাদের। কিন্তু তাঁকে রোখে এমন সাধ্য কার!

এস-ডি-ও অফিসের কাছাকাছি মিছিল আসতেই পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেল। ট্রেজারি অফিসে যেসব সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল, তারা পলকের মধ্যে বন্দুক বগলে গুঁজে উঠে গেল তিনতলায়। সেখানে বন্দুক তাক করে পজিশন নিয়ে বসে রইল ওরা। আর, এস-ডি-ও তাঁর ক্ষীণকায় শরীরখানি নিয়ে জীপে চড়ে মুহূর্তে উধাও। পরবর্তীকালে, পুলিশ-হাজতে পরিচিত সিপাইরা প্রিয়ব্রতর কাছে বর্ণনা করেছিল তাদের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা। নকুল সেপাই চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'বাপরে, কত দূর থিক্যে শুনা যাচ্ছিল হাজার হাজার মানুষের শ্লোগান। মনে হচ্ছিল, যেন ঘন ঘন মেঘ গুরলাচ্ছে আকাশে।'

কংগ্রেস নেতা অন্নদা চক্রবর্তীরা নিজের বাড়ির তিনতলার খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপচাপ। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ জনা বিশেক। অন্নদার সারামুখে কে যেন একপোচ কালি লেপে দিয়েছে। কারণ সারা সহরের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছে এক অনাবিল অফুরন্ত জনস্রোত। অসংখ্য কালো কুচকুচে মানুষ। অর্ধনগ্ন মহিলা। তাদের চোখে মুখে অস্থির প্রতিজ্ঞা। সরল, অকপট চাউনি। এদেরই তবে এতদিন ডাকাত বলে চালাতে চেয়েছে অন্নদা চক্রবর্তীর দল! ডাকাত কি অমন সারবন্দী হাঁটতে পারে প্রকাশ্য রাজপথে! অমন সুশৃঙ্খলভাবে, দু'পায়ে সাহসী ছন্দ তুলে, অমন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে! অমন সরল-অকপট মুখ কি হয় তাদের! গলার আওয়াজে কি অমন দামামা বাজে! মিছিলটা তিনতলা বাড়ির তলা দিয়ে যাচ্ছিল। ওপরে দাঁড়িয়ে অন্নদারা ভুলভুল করে দেখছিলেন। এখন শুধু মিছিলের পেটখানাই দেখা যাচ্ছিল। মুখ এবং লেজ কোন্ বাঁকের আড়ালে উধাও। ঐ পেটখানা দেখেই আতঙ্কে শিউরে উঠছিলেন অন্নদা চক্রবর্তীর দল।

অকস্মাৎ শ্লোগান দেন মৃত্যুঞ্জয়। এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। হাজার হাজার কণ্ঠ গর্জন তোলে, এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। বোঝা গেল অন্নদা চক্রবর্তীর বাড়ির তলা দিয়ে যেতে যেতে ইচ্ছে করেই শ্লোগানটা দিলেন মৃত্যুঞ্জয়। যেন বোঝাতে চাইলেন, দ্যাখ হে, বুঝে লাও এবার। কেবল মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা, গুটিকয় সাগরেদ লিয়া তোমাদের সাধের আজাদীকে ঝুটা বলছে নাই। হাজার হাজার মানুষ, কেমন গলার শিরা ফুলিয়ে একই কথা বলছে, দ্যাখ। হাজার হাজার মানুষ যাকে ঝুটা-পাথর জ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তুমি যদি ওটাকে কুড়িয়ে নিয়ে গলায়

লকেট করে ঝুলিয়ে রেখে সুখ পাও তো আমাদের কিছু বইল্‌বার নাই। কিন্তু মানুষ বুঝে গেছে, তুমরা পিটালি-গোলা জলকে দুধ বলে চালাতে চাইছ। অশ্বত্থামার দুগ্ধপান। দেশের কোটি কোটি মানুষকে অশ্বত্থামা বানাতে চাইছ তুমরা।

মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় বাঁধা ছিল লাল রঙের ফেট্টি। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে অন্নদা চক্রবর্তীর এক চেলা, মুকুন্দ হাজরা ফিসফিস করে বলে, 'দাদা, হুই দেখুন, মৃত্যুন্ বাঁড়ুজ্জা যায়। হুই যে— মাথায় লাল ফেট্টি।'

অন্নদা অনেক আগেই দেখেছেন মৃত্যুঞ্জয়কে। ময়রাপুকুর থেকে যখন রসিকগঞ্জে উদয় হল মিছিলের পেট, তখনই, পয়লা নজরেই তিনি দেখে ফেলেছেন মৃত্যুঞ্জয়কে। ওকে না দেখে উপায় আছে অন্নদার! মূর্তিমান বিভীষিকার মতো মানুষটা সর্বক্ষণ চোখের সুমুখে নৃত্য করছে। দিনে-রাতে, নিদ্রা-অনিদ্রায়, ঐ একখানা মুখ সহস্র মুখ হয়ে ভয় দেখিয়ে চলেছে অন্নদাকে। লোকটাকে তিনি আজন্ম দেখছেন। সেই অনুশীলন সমিতি থেকে। ভারি জেদি আর একরোখা। একটিবার যা ভাবে, দিনরাতের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় তা। শেষ না করে থামে না কিছুতেই। মানুষটাকে মনে মনে বড় ভয় অন্নদার। একটা ওলোট-পালোট না করে সে যে ছাড়বে না কিছুতেই, এটা যেন বুকের মধ্যে বিশ্বাস করেন তিনি।

সহসা ওপরের দিকে মুখ তোলেন মৃত্যুঞ্জয়। চোখাচোখি হয় অন্নদার সঙ্গে। হাসেন। বলেন, 'ভুলভুল কইর্‌য়ো কি দেখছো দাদা? ধরিয়ে দিতে পারলে একটি হাজার টাকা পুরস্কার। অমন সুযোগটা ছেইড়ে দিবে?'

অন্নদাও হাসেন। রক্তহীন ফ্যাকাসে হাসি। এই কিছুদিন আগেও তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করেছেন। মৃত্যুঞ্জয়কে ধরিয়ে দেবার আহবান জানিয়েছেন মানুষকে। এক হাজার টাকার লোভ দেখিয়েছেন। পুলিশকে উত্তেজিত করেছেন। আজ এক চিলতে নীরক্ত হাসি হেসেই কোনক্রমে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। যে মানুষটির জন্য পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের এত আয়োজন, সে-ই কিনা আজ তাঁরই নাকের ডগা দিয়ে গর্বিত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে, উল্লসিত স্লোগানের চাবুক মারতে মারতে। আজ তার গায়ে হাতটি ছোঁয়ানোর ক্ষমতা নেই অন্নদার। কারণ, লোকটার চারপাশে আজ মানুষের শরীর দিয়ে তৈরি দুর্ভেদ্য বর্ম। এক সময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অন্নদা চক্রবর্তী। একটা পরাজয়বোধ তাঁকে কুরে কুরে খায়। অন্যমনস্ক করে দেয় বারবাব।

বাসে চড়ে যাচ্ছিলেন অবন্তী দত্ত। কট্টর কংগ্রেসী, সৎ, পরিশ্রমী মানুষ। মিছিলটা দেখে কিছুক্ষণের জন্য চোখে পলক পড়ে না তাঁর। এরা করেছে কি! বাসটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাস্তার ধার ঘেঁসে। চলবার সাধ্য ছিল না ওর। অকস্মাৎ বাস থেকে নেমে পড়লেন অবন্তী দত্ত। ছুটে এলেন মিছিলের দিকে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখি হে, তুমাদ্যার পতোকা দাও তো একখানা। একজনের হাত থেকে একখানা লাল ঝাণ্ডা কেড়ে নিয়ে ফের চড়ে বসলেন বাসে। বাস একটু বাদে আস্তে আস্তে গড়াতে লাগল। জানলার বাইরে অবন্তী দত্তর হাতে পতপতিয়ে উড়তে লাগল লাল ঝাণ্ডা।

থানায় পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই। ওখানে কাল রাত থেকে সবাই প্রস্তুত। বাছা বাছা ফৌজ নিয়ে অফিসাররা তৈরি। কাল সারারাত ঘুম হয় নি কারো। জল্পনা-কল্পনা

মন্ত্রণাতেই কাবার হয়ে গিয়েছে রাত। মুহুর্মুহূ খবর বয়ে এনেছে ওয়াচারের দল। টেলিফোন, ওয়্যারলেস চলেছে রাতভর। এখন সারারাতের ক্লান্তি জড়ানো চোখগুলো সহসা উত্তেজনায় জ্বলে উঠতে চায়।

এক সময় উঠে দাঁড়ালেন এস-ডি-পি-ও সাহেব। ফস করে সিগারেট ধরালেন। তারপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরময়। সর্বশেষ খবর যা এসেছে, হাজার দশেক মানুষ আসছে। তার মধ্যে আড়াই হাজার মহিলা। সকলেব হাতেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। গোপন খবর যা পাওয়া গেছে, থানা লুট করে আগুন ধরিয়ে দেবে ওরা। কথাটা তিনিও বিশ্বাস করেন। অস্ত্রশস্ত্র লুট করবার একটা প্রবণতা এই দলের লোকগুলোর মধ্যে রয়েছে। কেবল বক্তৃতা দিয়ে লড়াই নয়, এরা সত্যি সত্যিই অস্ত্র ধরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে অনেকদিন। জঙ্গলের মধ্যে এরা সংগঠিত হচ্ছে দিনের পর দিন। অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। সংগ্রহ করছে খাবার-দাবার, রসদ। এবং নিজেদের চারপাশে তিলতিল জড়ো করছে অনেক অনেক মানুষ। এমন অবস্থায়, এত মানুষ নিয়ে যখন আসছে, তখন থানা লুট করাটা খুবই সম্ভব। ভাবতে ভাবতে এস-ডি-পি-ও সাহেবের ডান হাতখানা বারবার কোমরের কাছে নেমে আসে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়।

অকস্মাৎ গর্জে ওঠে হাজার হাজার কণ্ঠ। লাঙ্গল যার, জমিন তার। থানাব একেবাবে কাছেই আওয়াজটা আছড়ে পড়ে প্রবলভাবে।

জানলা দিয়ে জনস্রোতটা প্রত্যক্ষ করেই সহসা মাটিতে শুয়ে পড়েন এস-ডি-পি-ও সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে পজিশন নেয় দুশো সশস্ত্র পুলিশ। মাটির কাছাকাছি চলে আসে বুক, সেখানে মানুষের পায়ের শব্দ বুকের কাছাকাছি দামামাব মতো বাজতে থাকে। থানার গেট থেকে বারান্দা অবধি পর পর দরজাগুলোতে আট-দশখানা ভারি ভারি তালা লাগানো হয়েছে ভেতর থেকে। বালির বস্তা ডাঁই করা হয়েছে থরে থবে। কাঁদুনে গ্যাসের সেলগুলো পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হয়েছে। তবুও হাজাব হাজার মানুষের পায়েব ছন্দোবন্ধ আওয়াজে চমকে চমকে ওঠে থানার মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী প্রশাসন।

নকুল সেপাই প্রিয়ব্রতকে বলেছিল, 'রাইফেল কি ধইব্‌ব, ছোটবাবু, হাতের মইধ্যে অস্ত্রগুলান সদ্য ধরা রুই মাছের পারা ছটকাতে লেগেছে তখন!'

মিছিলের মাঝখান থেকে মৃত্যুঞ্জয় থানাব দিকে তাকান। থানার এত কাছাকাছি বহুদিন আসেন নি তিনি। যারা ওঁকে ধরবার জন্য এতদিন এত জায়গায় এত ফাঁদ পেতেছে, তাদের গা ঘেঁসে নির্ভয় পদক্ষেপে চলে যাচ্ছেন তিনি! ভাবতে গিয়ে সারা শরীর জুড়ে এক ধরনের শিহরণ জাগে। একবার চিৎকার করে জানান দেবেন নাকি ব্যাপারটা? বলবেন, ধরো হে পুলিশের পো, আমি তুমাদ্যার যম, রাতের তরাস, এই যে তুমাদ্যার থিক্যে মাত্তর দশ হাত দূরে খাড়া রয়েছি। ধরবে তো ধর হে। মৃত্যুঞ্জয় জানেন, এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও একটি প্রাণীও বেরোবে না থানার ভেতর থেকে। দশ হাজার সশস্ত্র মানুষের বেষ্টনী থেকে ওঁকে এ্যারেস্ট করবার সাধ্য এই মুহূর্তে মহামান্য সরকার বাহাদুরের নেই।

স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মিছিলটা এক সময় থানা অতিক্রম করে যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের বুকের মধ্যে সীমাহীন উল্লাস। দশ হাজার মানুষ, গ্রামের দরিদ্র, নিরক্ষর এস-

মানুষ, সেই সকাল থেকে সারবন্দী হাঁটছে। এখন দুপুর। এখনও অবধি একজন মানুষও লাইন থেকে মুহূর্তের জন্য বেরোয় নি। বিড়ি-চুটিও ধবায়নি একজনও। এমন বিশাল সমাবেশে নগণ্য কোনও ব্যাপারকে কেন্দ্র করেও যে কোনও মুহূর্তে ঘটে যেতে ধুন্দুমার কাণ্ড। জেলা কমিটি বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সাবধান, দশহাজার সশস্ত্র আদিবাসী-প্রধান মানুষকে নিয়ে মিছিল করবার অনেক ঝুঁকি। যে কোনও মুহূর্তে প্রাণঘাতী সমর বেধে যেতে পারে। আগুন জ্বলে যেতে পারে শহরের ঘরবাড়ি, দোকান-বাজারে। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি সেক্ষেত্রে পুরোপুরি চলে যাবে আমাদের বিরুদ্ধে। অতএব, খুব সাবধান। মিছিলটা শুরু হওয়ার মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয়ের বারেকের তরে মনে পড়েছিল সেই সতর্কবাণী। যদি কোনও অঘটন ঘটে, পার্টি ছেড়ে কথা কইবে না ওঁকে। কিন্তু ধীরে ধীরে, বাঁকাদহ, মড়াচাতাল, মড়ার, রঘুনাথপুর পেরিয়ে বিষ্ণুপুর সহরে ঢুকেছে মিছিল। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ জমায়েত হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে সে দৃশ্য। কেউ কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে ফুলের মালা। মনের চরম দুর্ভাবনাটা কখন যেন উল্লাসের রূপ নিয়েছে। এই মুহূর্তে মৃত্যুঞ্জয়ের বুক জুড়ে বর্ষার নদীর মত উচ্ছ্বাস।

শহরের বাইরে বেরিয়ে আসে পুরো মিছিলটা। বিশাল অজগর সাপটা ধীরে ধীরে কুণ্ডলি পাকাতে থাকে বাঁধগাবার বিস্তীর্ণ ডাঙায়। তখন ঠিক মাথার ওপর সূর্য। একটা আগুনের বলের মতো জ্বলছিল।

মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে পাশে সারাক্ষণ হাঁটছিল প্রিয়ব্রত। তার স্পষ্ট মনে আছে, মৃত্যুঞ্জয় একবার তার কানের কাছে মুখ এনে খুব একান্তে বলেছিলেন, 'বুঝলে কোকিল, আমি এই সূর্যটাকে পেড়ে নামাব।'

প্রিয়ব্রত তখন কেবলই ভাবছিল, এমন অবিস্মরণীয় দৃশ্যখানি যদি অন্তত তিনজনকে দেখানো যেত। প্রথম জন পরীক্ষিত বাউরি, সে কোনও প্রকাশ্য জমায়েতে থাকে না। দ্বিতীয় জন দীপমালা, সে কোনও রহস্যময় কারণে এল না।

তৃতীয় জন সুদর্শন সিংহবাবু, এমন একখানা মিছিল সারাজীবনে একটি বারের জন্য প্রত্যক্ষ করলে তাঁর হয়ত বামনাকার মানুষ পুষবার সাধখানা আর থাকত না, কিন্তু তিনি আজ তিন বছর হল সব কিছু দেখাশোনার ওপারে চলে গিয়েছেন।

৪৫. জখমী বাঘের হুঙ্কার

এস-ডি-ও'র চেম্বারখানা হিমঘরের মতো ঠাণ্ডা।

জনা দশেক মানুষ নীরবে অনুসরণ করে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। মুখগুলো যেন এক অদৃশ্য সুতোয় সেলাই করে দিয়েছে কেউ। সারা ঘরটাতে এক অস্বস্তিকর নীরবতা। কেবল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একঘেঁয়ে আওয়াজ। শেষবারের মতো ঘড়ির ডায়ালে চোখ রেখে ডি-এম বললেন, 'সময় হয়ে গেছে।'

সে কথায় চমকে ওঠেন সবাই। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ ক'টি যেন ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সকলের মাথার ওপর।

সময় হয়ে গেছে!

ঘরের মধ্যে প্রশাসন ও পুলিশ মিলে জনা দশেক অফিসার। কথা ক'টি সকলের বুকের মধ্যে ঘণ্টার মতো বাজতে থাকল। যে যার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করছিলেন সময়ের কুটিল রূপ।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিভাগীয় কমিশনার আসবেন।

জঙ্গলমহলের মহা মিছিলের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সারা জেলায়। সারা দেশে। রাজধানীতেও তড়িৎগতিতে পৌঁছে গিয়েছে খবরটা। খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে তীব্র ভাষায়। মানুষ কলরব জুড়ে দিয়েছে। মন্ত্রীরাও হতবাক। এতবড় বিস্ফোরণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল কবে, কী করে? কারা এদের চূড়ামণি? তারা কি চায়? প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছিল বিস্ফোরণ ঠেকাতে! স্বাধীন ভারতে তো নয়ই, পরাধীন ভারতেও বাঁকুড়ার মতো পিছিয়ে পড়া, কংগ্রেস অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন বিশাল স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র মিছিল আর হয়নি কোনও দিনও। এ'তো মিছিল নয়, জনসমুদ্র!

সরকারী মহল পর্যুদস্ত। একেবারেই কোণঠাসা। কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম গেল, এক্ষুনি পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দাও। ভাল করে পোস্টমর্টেম কর। কার দোষে এটা ঘটল, খুঁজে বের কর।

ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করতে থাকে সবার। একখানা ধারাল খাঁড়া অবিরাম ঝুলছে প্রত্যেকের মাথার ওপর। যে কোনও মুহূর্তে, যে কারুর মাথা উড়ে যেতে পারে। ঘড়ির ওপর চোখ রেখে সেই ভয়ানক মুহূর্তটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ডি-এম সাহেব।

সময় হয়ে গেছে!

ইনস্পেকশন বাংলোয় বিশ্রাম করছেন কমিশনার সাহেব। বাংলোর বাইরে অন্নদা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে শহরের বাছাবাছা মানুষ ভিড় জমিয়েছে। তাদের অনেক বক্তব্য, অনেক অভিযোগ। কমিশনার সাহেবকে আগেভাগে জানাতে চায় সব।

বাইরে উর্দিপরা চাপরাশি। অন্নদা চক্রবর্তী একখানা স্লিপ লিখে পাঠিয়ে দিলেন ভেতরে। ডিস্ট্রিক্ট লিডারস্ অব্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস ওয়ান্ট্ টু মিট, ইয়োর অনার। সময় বয়ে যায়, কোনও খবর আসে না ভেতর থেকে। বাইরে দাঁড়িয়ে অন্নদা চক্রবর্তীর দল ক্ষেপতে থাকেন। স্বাধীন ভারতে, কংগ্রেসের রাজত্বে কম্যুনিস্টরা এমন এক কাণ্ড ঘটাল দিনে-দুপুরে! কী করে মানুষের কাছে মুখ দেখাবেন ওঁরা? প্রশাসনের হালচাল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! দেশটা কি কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দিতে চান সরকার বাহাদুর? ক্ষতি যা হয়ে গেছে, তা পূরণ করবার নয়। একদিকে ছোটলোকদের মনোবল বেড়ে গিয়েছে হাজার গুণ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে গেছে। এখন ভয়ে, দুর্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে সবাই। সরকারি দলের নেতাদের ওপর আর তিলমাত্র আস্থা অবশিষ্ট নেই।

সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে অন্য জায়গায়।

এতদিন ধরে তিলতিল পরিশ্রম করে তাঁরা প্রচার করেছেন, কম্যুনিস্টরা গুণ্ডা, ডাকাত। ছোটলোকদের একত্র করে তারা ডাকাতি-লুটতরাজ চালাতে চাইছে। নইলে জঙ্গল কোনও রাজনৈতিক দলের ঘাঁটি হয় না। ওদের অকাজ-কুকাজের নানান মনগড়া গল্প

সুকৌশলে চাউর করা হয়েছে মানুষের মধ্যে। মানুষ তা ধীরে ধীরে বিশ্বাসও করেছিল। কিন্তু এই একটিমাত্র ঘটনায় চাকাটা পুরোপুরি ঘুরে গেছে উল্টো দিকে। যাদের পেছনে হাজার হাজার মানুষ, এমন সারবন্দী, সুশৃঙ্খল, রাস্তার দু'ধারে যাদের এত সমর্থক দাঁড়িয়ে থাকে ফুলের মালা নিয়ে, তারা কখনোই ডাকাত হতে পারে না। সাধারণ মানুষ এই ঘটনার পর থমকে দাঁড়িয়েছে। নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে ওদেব নিয়ে। অন্নদা চক্রবর্তীদের কাছে এ এক ভয়ানক ক্ষতি।

এসব কথা কমিশনার সাহেবকে বোঝানো দরকার।

আধঘণ্টা টাক বাদে বাংলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কমিশনার সাহেব। গায়ে ময়ূরকণ্ঠী রঙের গাউন। কাঁচাপাকা চুলের তলায় প্রশস্ত গৌরবর্ণ ললাট। মুখে লম্বা চুরুট দপদপিয়ে জ্বলছে।

'কি চাই আপনাদের?'

অন্নদা চক্রবর্তীরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান। নমস্কার স্যর। যে ঘটনাটা ঘটে গেল স্যর, সে বিষয়ে—।

'সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসি নি আমি।' ধীর অথচ কঠিন গলায় বলেন কমিশনার সাহেব,' আমি কথা বলব আমার অফিসারদের সঙ্গে। আপনারা যেতে পাবেন।'

মুহূর্তে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। চোখের সুমুখে বাহারি পর্দাখানা দুলতে থাকে। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন অন্নদা চক্রবর্তীর দল। চরম অপমানে কাঁপতে থাকে তাঁদের শরীর।

অফিসারদের মুখ থেকে ঘটনাটা আদ্যপ্রান্ত শুনলেন কমিশনার। কাগজপত্র দেখলেন। জনে জনে প্রশ্ন করলেন।

বোঝা গেল, সমগ্র জঙ্গলমহল জুড়ে আগুনটা ধোঁয়াচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। পুলিশের নজরেও ছিল সেটা। ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেয় নি প্রশাসন। তারা আসলে কল্পনাও করে নি, দু'তিন জন খাটো মাপের মানুষ ভেতরে ভেতরে এমন বড়সড় আগুন জ্বেলে দিতে পারে। স্বাধীনতার ঠিক দু'বছরের মাথায়, জাতির জনকের তিরোধান এই সেদিনের ঘটনা, এরই মধ্যে এত মানুষ উল্টো শিবিরে চলে যাবে, এটা বুঝি স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

'একটা ছোট্ট ফোঁড়া এখন কার্বাঙ্কলের রূপ নিয়েছে।' ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন কমিশনার, 'দুটো চারটে মানুষকে মারলে যে আগুন নিভিয়ে ফেলা যেত, তার জন্য আজ হাজার মানুষকে মারবার আয়োজন করতে হবে। শুনুন, যেভাবেই হোক পালের গোদাগুলিকে ধরুন। যে ভাবেই হোক, যত জলদি সম্ভব। ওদের ঘাঁটিগুলোর খোঁজ খবর লাগান। রেইড শুরু করুন সর্বত্র। গাঁয়ে গাঁয়ে হামলা চালান প্রতি রাত্রেই। একটা সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। অধিকাংশ মানুষই কাওয়ার্ড। ইনডিভিজুয়্যালি হেল্পলেস। তাদের বিচ্ছিন্ন করুন। প্রতিটি গাঁয়ে ইনফর্মার বাড়ান। রুলিং পার্টির লোকেরা গাঁয়ে-গঞ্জে গিয়ে মিটিং করুক। দু'দিন বাদের চাষের কাজকর্ম কিছু থাকবে না। বেকার হয়ে যাবে গাঁয়ের মানুষ। অভাবও বাড়বে।

এ সময়টায় জঙ্গল এলাকায় কিছু মাটি-কাটার কাজকর্ম শুরু করুন। মানুষ এন্‌গেজড্ থাক কমিশনার সাহেব উঠে দাঁড়ান। দাঁতের ফাঁকে চুরুটখানা চেপে ধরে শেষ কথা উচ্চারণ করেন, 'যতদিন না প্রথম সারির লিডাররা এ্যারেস্টেড হচ্ছে, ততদিন এই জেলার একজন অফিসারও ছুটি পাবেন না।'

৪৬. ইঁদুর-বেড়াল খেলা

জঙ্গল মহলের গাঁ'গুলোতে একটা থমথমে ভাব।

মানুষ আচমকা মুখে কুলুপ এঁটেছে। আকারে ইঙ্গিতে কথা বলছে সবাই। একটা দুর্যোগের আভাস ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

রাজপথ দিয়ে দিনরাত ছুটে যায় পুলিশের জীপ। তারের জাল দেওয়া কালো গাড়ি। তার মধ্যে ডজনে ডজনে লোহার টুপি পরা জলপাই রঙের মানুষ। যখন তখন আচমকা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ওরা ঘরে ঘরে ঢোকে। জিনিসপত্তর তছনছ করে। বেওনেট দিয়ে বাকসো-প্যাঁটরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখে। একে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ষণ্ডা মানুষজন দেখলেই তুলে নেয় গাড়িতে।

আগের এস-ডি-ও, এস-ডি-পি-ও বদলি হয়ে গিয়েছেন সাতদিনের মাথায়। ওদের জায়গায় এসেছেন দু'জন জাঁদরেল অফিসার। দিনরাত মন্ত্রণা চালাচ্ছেন ওঁরা, প্ল্যান ছকছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ও সেটা বিলক্ষণ জানেন। সেই কারণেই তিনিও ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা সতর্ক। প্রায় রোজ রাত্তিরে ডেরা বদলাচ্ছেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর চলছে নিত্যিদিন ইঁদুর-বেড়াল খেলা। নিশ্চিত খবর পেয়েছে পুলিশ, গভীর রাতে ঘিরে ফেলেছে তাঁর ডেরা। কিন্তু তার আগের মুহূর্তে সুদক্ষ কুরিয়ার মারফৎ খবর পেয়ে পালিয়ে গিয়েছেন তিনি। পুলিশ এসে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে, পাখি শিকলি কেটে ভাগল্‌বা। কোনরাতে পুলিশ হয়ত ঘিরে ফেলেছে মাঝি পাড়াটাই। ঐ পাড়ার একটি বাড়িতেই বাস্তবিক শুয়ে রয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়। পুলিশের হল্লায় জেগে উঠেছে পুরো পাড়া। মৃত্যুঞ্জয় শেষ মুহূর্তে পরনের ধুতি খুলে পরে নিয়েছেন একখানি গামছা। মিশে গিয়েছেন জনতার মাঝে। একটি একটি ঘর ধরে ধরে তল্লাসী শুরু করেছে পুলিশ বাহিনী। যে ঘরটিব তল্লাসী শেষ হল, সেটিতে ঢুকে পড়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকেছেন ভাদ্রের পচা গরমে। মাঝিপাড়ার সবগুলি বাড়ি তন্নতন্ন করে তল্লাসি চালিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছে হায়েনার দল। মৃত্যুঞ্জয় তখন গাঢ় ঘুমে অচেতন।

তা সত্ত্বেও হপ্তাটাক আগে আচমকা পুলিশের জালে আটকা পড়ে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়। সে রাতে ছিলেন ক্ষীরাইবনি গাঁয়ে পুষ্পর বাড়িতে। সন্ধের পর অন্ধকারে গা লুকিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন পুষ্পর ঘরে। কাকে-পক্ষীতেও টের পাওয়ার কথা নয়। তবুও কেমন করে যেন জেনে গেল পুলিশ বাহিনী। গভীর রাতে একেবারে নিঃশব্দে ঘিরে ফেলল পুষ্পর বাড়ি। পুষ্প বাল্যবিধবা। বুড়ো বাপের কাছে থাকে। পুষ্পর বাবাও এই দামাল মানুষটিকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন। গভীর রাতে সদর ও খিড়কি দরজায় এক সঙ্গে ঘা পড়তে থাকে। পুষ্পরা বুঝে ফেলেন কী চরম সঙ্কটে পড়ে গেছেন ওঁরা। এখন আর কোনও দিক থেকেই পালিয়ে যাওয়ার

উপায় নেই। মৃত্যুঞ্জয় তখন ব্যূহ মধ্যে অভিমন্যু। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেললেন পুষ্প। ঘরের কোণে সম্বৎসরের চাল রাখবার একটি মাঝারি সাইজের বাঁশের ডোল ছিল। ভাদ্রমাসে চাল কই গরীব মানুষের ঘরে! ডোলখানি ফাঁকা। চক্ষের পলকে ডোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়কে। ডোলের ঢাকনা চাপা দিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দিলেন রাজ্যের কাঁথা-কম্বল-বালিশ। দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল পুলিশ বাহিনী। সারাঘর তন্নতন্ন করে খুঁজল, ডোলের গায়ে লাঠির ঘা মারল বারকয়। পুষ্প এবং তার বাপকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর হতাশ মনে বেরিয়ে গেল। ভাদ্রের পচা গরমে ছোট্ট ঢোলের মধ্যে তখন সেদ্ধ হচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয়। মুক্তি পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে খোলা হাওয়ায় দম নিলেন।

সে রাতে আর ঘুম হল না কারোরই। ঘরের মধ্যে চাপা গলায় গল্প করলেন দু'জনে। এক সময় পূব আকাশ ধূয়া হল, পাখি-পাখাল ডাকল। ভোরের আলো ফুটল। তার আগেই দুটি হৃদয় অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। মৃত্যুঞ্জয় সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন পুষ্পকে। আবেগ মথিত গলায় বলেছেন, সহধর্মিণী হওয়ার পক্ষে তুমার চাইতে যোগ্য নারী আমার চোখের সুমুখে নাই।

জেলা অফিসে সমস্ত খবর যাচ্ছে। নেতারা উৎকণ্ঠিত। বারংবার জরুরি খবর আসছে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে। খুব সাবধান। জানোয়ারগুলো ক্ষেপে গিয়েছে। তারা হাজার মানুষের রক্তের বদলেও এ আগুন নেভাতে বদ্ধ পরিকর।

মৃত্যুঞ্জয়ের কপালে ভাবনার রেখা জমে। বিমল সরকার, মানিক দত্তর মতো সহযোদ্ধাদের সঙ্গে চলে অষ্টপ্রহর মন্ত্রণা। এ ভারি বিষম সময়। সারা জঙ্গলমহল তোলপাড় করে পুলিশ বাহিনী ওঁদের খুঁজছে। পার্টি থেকে ঘন ঘন নির্দেশ আসছে, পালাও। অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও ঐ এলাকা থেকে সরে যাও। মানিক দত্তরও একই মত। আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের অন্তত কিছুদিন গা-ঢাকা দেওয়া উচিৎ। এ সময় আচমকা ধরা পড়লে তিলতিল গড়ে তোলা সংগঠন খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে। পাঁচ-সাত-দশ বছর বাদে জেল থেকে ফিরে এসে আবার নতুন করে তা গড়ে তোলার আশা সুদূর পরাহত।

মনে মনে জ্বলে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয়। তবুও সংযত গলায় বলেন, 'তুমিই একমাত্র গড়ে তোলার হকদার, এমনটাই বা ভাবছ কেন? ইতিহাসের প্রয়োজনে আগুন জ্বালাবে মানুষ। যে কোনও মানুষ। ইতিহাসই নিয়োগ করবে তাকে। তুমি নিজেকেই সর্বময় ভাবছ কেন?'

মানিক দত্ত মনে মনে সায় দিতে পারেন না মৃত্যুঞ্জয়ের কথায়। কেমন ধোঁওয়া-ধোঁওয়া লাগে। ইতিহাস নিযুক্ত মানুষকে তিনি চেনেন না। তিনি শুধু দেখেছেন, তাঁরা ক'জন কয়েকদিন এলাকায় না থাকলে কেমন এলোমেলো হয়ে যায় মানুষগুলো। তাঁরাই যে দিনরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা এলাকায় আগুনটা জ্বালিয়ে রেখেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাঁরা তিন-চারজন ধরা পড়ে গেলে পুরো এলাকাটা দু'দিনেই তছনছ হয়ে যাবে। যে পরিণতিকে আগাম প্রত্যক্ষ করতে পারছেন তিনি, তাকে ছোট করে দেখবার মতো মনের বাঁধুনি তাঁর নেই।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে ধৈর্য ধরে বোঝাতে থাকেন। বহুদিনের বহু পরিশ্রমে মানুষকে জাগানো

গেছে। তাদের প্রজন্মতাড়িত ভয়খানা একটু একটু করে ভাঙছে। ফুলের কুঁড়িগুলি সবেমাত্র পাপড়ি মেলেছে। এখন তাদের দিনরাত পরিচর্যা করা চাই। তারা এখনও বোঝে না, ঐক্য কি, সংগ্রাম কি, ঝড়ঝাপটা কত দামাল হতে পারে। এখন তাদের ছেড়ে পালাবার অর্থ, অল্প সাঁতার শিখিয়ে ওদের ভর-ভরন্ত মাঝ নদীতে ফেলে দেওয়া। সাঁতরাতে না পেরে মরে যাবে অনেক মানুষ। যারা কোনও গতিকে বেঁচে যাবে, তারা আর জীবনেও জলে নাবতে সাহস পাবে না। এই সময়টাই ওদের পক্ষে এক জটিল সন্ধিক্ষণ।

'কিন্তু ধরা পড়ে গেলেও তো অবস্থাটা একই হবে।'

'না। ধরা পড়া আর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে দুস্তর ফারাক। এ সময় যতদিন ওদের সঙ্গে থাকা যাবে, ততই লাভ। এটাই ওদের বোঝানোর, শেখানোর উপযুক্ত সময়। অনেক মানুষের সঙ্গে মিছিল করাটা কিছু নয়। পুলিশের ধারাল থাবার সামনে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাওয়াটাই আসল সংগ্রাম। ওদের কাছে কাছে থেকে প্রতি মুহূর্তে শেখাতে হবে সে লড়াইয়ের কৃৎকৌশল। ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও কীভাবে মাটি কামড়ে এগিয়ে যেতে হয়, সেটা শেখানোর উপযুক্ত সময় এটাই। এ সময় পালিয়ে গেলে চলে? এই আন্দোলনের শেষ পর্ব অবধি আমাদের থাকতেই হবে. এমন কোনও কথা নেই। আমাদের কাজ শুধু যতখানি সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখন যদি আমরা ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে যাই, তবে এই আধ-জাগা মানুষগুলি ভয়ে-আতঙ্কে আধ-মরা হয়ে যাবে। পুলিশের অত্যাচারের সামনে আনাড়ির মত আচরণ করবে। পোকা মাকড়ের মতো মরবে। সবচেয়ে বড় কথা ওদের বুকের মধ্যে তৈরি বিশ্বাসটা ঘা খাবে প্রচণ্ড। দুর্দিনের সময় পাশে না থাকলে ঐ মার খাওয়া মানুষগুলোকে আর কখনই পাশে পাবো না আমরা।

'কিন্তু জেলা কমিটি যে বার বার পালিয়ে যাবার নির্দেশ পাঠাচ্ছেন?'

'তাঁদের বোঝাতে হবে। তাঁরা শুধু নেতৃত্বের নিরাপত্তার দিকটাই বেশি করে ভাবছেন। অন্য দিকগুলো সম্ভবত তাঁদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আমাদের এখন তবে কি কর্তব্য?'

'মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থেকেই পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হবে আমাদের। এক ঘাঁটিতে এক রাতের বেশি থাকা চলবে না কিছুতেই। মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে এক-আধটা ছোটখাটো আঘাতও হানতে হবে শত্রুকে।'

'এই পরিস্থিতিতে আঘাত হানবার কথা ভাবা যায়?'

'অবশ্যই। মানুষকে অফেন্স ও ডিফেন্স দুটি কৌশলেই দক্ষ করে তুলতে হবে। একটানা আত্মরক্ষা করতে করতে বুকের সাহস, শরীরের বল, স্নায়ুর কর্মক্ষমতা কমে আসে। শত্রুকে সর্বদাই বলীয়ান মনে হয়। সেটা খুবই ক্ষতিকারক।'

স্থির হল, মৃত্যুঞ্জয়, মানিক দত্ত ও বিমল সরকার এই লড়াইয়ের তিন প্রধান সেনাপতি এক সঙ্গে থাকবেন না। তিনজন সর্বদাই তিন জায়গায় থাকবেন এবং সর্বদা স্থান পরিবর্তন করবেন। তিনজনের মধ্যে যোগাযোগ রাখবে একজন অতি বিশ্বস্ত কুরিয়ার। সেই কেবল জানবে তিন নেতার গতিবিধির হদিশ।

এ কাজে পবীক্ষিত বাউবিব চেযে যোগ্য ব্যক্তি আব নেই। ঝটিতি প্রিযব্রত মাবফৎ খবব চলে যায পবীক্ষিতেব কাছে।

৪৭. অবাঞ্ছিত জলোচ্ছ্বাস

বেলা দশটা নাগাদ ঝাঁ-ঝাঁ কবে তিনখানা পুলিশেব গাডি এসে দাঁডায বাঁধগাবায, ভট্চাজদেব বাইস মিলেব পেছনে। শ'খানেক সশস্ত্র পুলিশ গাডি থেকে নেমে চটপট ঢুকে পডে বাইস মিলেব মধ্যে।

এদিকে চাবপাশেব গ্রাম থেকে মানুষ আসাবও বিবাম নেই। দূব-দুবান্ত থেকে দলে দলে যোগ দিচ্ছে অসংখ্য লডাকু মানুষ। পাঁচ হাজাব-সাত হাজাব—এখন দশ হাজাব ছুঁই ছুঁই। আধঘণ্টাটাক খোঁজাখুঁজিব ফলে কেবল কালিপদ লোহাব ছাডা আব কাউকেই পেলেন না মৃত্যুঞ্জয। এই বিশাল জনসমুদ্রে কাউকে খুঁজে বেব কবা সত্যিই অসম্ভব।

কালিপদব দু'হাত চেপে ধবেন মৃত্যুঞ্জয, 'শুন, কালিপদ ভাই, মাথা ঠাণ্ডা কইব্যে বিচাব কব অবস্থাটা।'

কে শোনে কাব কথা! কালিপদ তখন উত্তেজনায থবথ'বিযে কাঁপছে। বিচাব বিবেচনাব মতো মনেব অবস্থায নেই সে। মৃত্যুঞ্জযেব হাতদুটোকে ছাডাবাব চেষ্টা কবে সে। হিসহিসে গলায বলে, 'ছেড্যে দ্যান আমাকে। শালাব খাঁকি শিযালেব ল্যাজ কাইট্বো আজ। উযাদ্যাব লাশগুলান পাঠাবো কিষ্টোবাঁধেব জলে।'

মানুষেব প্রবল চাপ আসছিল পেছন থেকে। এক ঠাঁই স্থিব হযে দাঁডাতে পাবছিলেন না মৃত্যুঞ্জয। কালিপদকে ছেডে দিযে তিনি এগোতে থাকেন সামনেব দিকে।

গেল বাতে ক্ষীবাইবনি গাঁযে বাত্রিবাস কবেছিলেন মৃত্যুঞ্জয। তখন ভোব সাডে-পাঁচটা কি ছ'টা, পবপব পাঁচটি গুলিব আওযাজ ভেসে এল। ধডমডিযে উঠে বসে ভাবছিলেন, কোন দিক থেকে ভেসে এল গুলিব আওযাজ, হেনকালে বেজে উঠল লাকডা, বাঁধগাবাব দিক থেকে। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চাবটে, আটটা, ষোলটা । মৃত্যুঞ্জয এব অর্থ বোঝেন। তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌডুতে লাগলেন বাঁধগাবাব দিকে।

বাঁধগাবাব সামান্য তফাতে লটাহীডেব জঙ্গল। জঙ্গলেব পাশেই লটাহীড গাঁ। মৃত্যুঞ্জয সেখানে পৌঁছে দেখলেন, ছুটে চলেছে কাতাবে কাতাবে মানুষ। পূবে পানশিউলি, দক্ষিণে মানসা—চাব পাশেব সমস্ত গ্রাম থেকে অসংখ্য মানুষেব স্রোত তীব্রগতিতে বযে চলেছে বাঁধাগাবাব দিকে। মনে মনে ভারি বিপন্ন বোধ কবেন মৃত্যুঞ্জয। নিজেব জন্য নয়। এই উন্মত্ত মানুষগুলোব জন্য। ভোবে বন্দুকের আওযাজগুলো যে পুলিশেব সে বিষযে কোনও সন্দেহ নেই তাঁব। পুলিশেব গুলিতে যদি এক আধজন মাবা গিযে থাকে, এবং সেই কাবণেই যদি জমায়েত হয এত এত মানুষ, তাহলে আজ তুমুল সংঘর্ষ বাধবে। দু'পক্ষেব অনেকেই হতাহত হবে। আজ বাঁধগাবা থেকে আবও একটা নদী বইবে দ্বাবকেশ্ববেব দিকে। মানুষেব বক্তে ভবা লাল টকটকে এক নদী। প্রায পঞ্চাশ জনের একটি দল ছুটে যাচ্ছিল মৃত্যুঞ্জযের পাশ দিযে। মৃত্যুঞ্জয় প্রাণপণ চেষ্টায় ওদেব থামালেন। ওবাও কেউ কিছুই জানে না। বন্দুক এবং লাকডার আওযাজ শুনে ওবা ছুটছে।

লোকগুলোর পিছু-পিছু বাঁধগাবার ডাঙায় পৌঁছে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ কপালে উঠে গেল। সারা ডাঙা জুড়ে আট-দশ হাজার মানুষের একটি সমুদ্র যেন। উত্তেজিত মানুষ চিৎকার করছে সমানে। মাঝে মাঝে তীর-ধনুক তাক করে ছুটে যাচ্ছে রাইস মিলের দিকে।

দু'একজনকে থামিয়ে ঘটনাটা আদ্যপ্রান্ত শুনলেন মৃত্যুঞ্জয়।

গেল রাতে ওঁরা বাঁধগাবাতে মিটিং সেরে চলে যাওয়ার পর গভীর রাতে হানা দিয়েছিল পুলিশ বাহিনী। রাতের বেলায় গাঁয়ে ঢুকতে সাহস পায় নি। রাইস মিলের মধ্যে রাত কাটিয়েছে চুপিসারে। ভোর বেলায় বৃন্দা বাউরি ও সুরধনী দাসী জঙ্গলের দিকে পা বাড়াতেই পুলিশ বাহিনী রাইসমিল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পথ আটকায়। দু'একজন ওদের জাপটে ধরে অশ্লীল গালাগাল সহযোগে মৃত্যুঞ্জয় বাড়ুজ্জার হাল হদিশ জানতে চায়। পুলিশের হাত থেকে নিজেদেব কোনও গতিকে ছাড়িয়ে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে বৃন্দা আর সুরধনী। সবাইকে বলে ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে লোহার আর বাউরির দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশকে তাড়া করে। পুলিশ ছুটে গিয়ে রাইসমিলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। কালিপদ লোহার ছিল সবার আগে। সে চিৎকার করে শাসাতে থাকে পুলিশকে। এবং ক্ষিপ্ত জনতা রাইসমিল ঘিরে ফেলে। রাইসমিলের মধ্যে ছিল জনা দশেক সশস্ত্র পুলিশ। বাইরে অন্তত দুশো জন মানুষ। প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক, ক্যাঁচা, বল্লম...। কালিপদ লোহার এমনিতেই জেদি মানুষ। কচ্ছপের মতো গোঁ তার। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'শালারা, মৃত্যুন বাঁড়ুজ্জ্যাকে ধইর্‌তে চাস্‌? কুত্তাদের উচিত শিক্ষা দিব আজ।'

নিয়ম মতো মেয়েদের সামনে এগিয়ে দেয় কালিপদ। পুরুষেরা পেছন থেকে কাঁড়-বাঁশ ছুঁড়তে থাকে এলোপাতাড়ি। রাইসমিলের চালে, দেওয়ালে অসংখ্য তীর আছড়ে পড়ে মুহুর্মুহু। কাঁকুরে ডাঙা থেকে পাথর-রড়া কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে থাকে ঝাঁকেঝাঁকে।

এক সময় পুলিশও গুলি ছুঁড়ল। পরপর তিনটে। গুলি লাগল বৃন্দা আর সুরধনীর পায়ে। বাঁধগাধার রুক্ষ্ম কল্লাচ মাটি রক্তে ভিজে যায় মুহূর্তে। মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে বৃন্দা আর সুরধনী।

জনতা থমকে দাঁড়ায়। পুলিশ লক্ষ করে, ওদের তীর প্রায় নিঃশেষিত। সাহস করে দরজার বাইরে আসে ওরা। পর পর দু'রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। বৃন্দা আর সুরধনীকে কাঁধে তুলে নিয়ে কালিপদর দল পিছু হটে তখনকার মতো। পুলিশ বাহিনী মহা উল্লাসে ওদের তাড়া করে।

বাঁধগাবা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে পড়তে কালিপদরা দেখতে পায় পুলিশ বাহিনী জোর কদমে এগিয়ে আসছে গাঁয়ের দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গ্রাম জুড়ে তাণ্ডব চালাবে ওরা। ভয়ে, আশঙ্কায়, পার্টির নির্দেশ ভুলে গিয়ে কালিপদ লাকড়ায় কাঠি দেয়। আর, তার পরিণতি হয়েছে এই। বনবাদাড় ভেঙে শয়ে শয়ে মানুষ ছুটে আসে বাঁধগাবা নিশানা করে।

শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে যান মৃত্যুঞ্জয়। তিনি রয়েছেন জনসমুদ্রের একেবারে সম্মুখভাগে। মানুষের মনোবল একেবারে ভেঙে না দিয়ে যতটা সম্ভব তাদের নিরস্ত্র করবার চেষ্টা করেন তিনি। এতকাল প্রতিকূল পরিবেশে লড়াই চালিয়ে অন্তত এই অভিজ্ঞতাটুকু

হয়েছে যে, অযথা শক্তিক্ষয় করলে আসল যুদ্ধে জেতা যাবে না। আজ এই পর্যন্ত থাক। পুলিশ দেখে যাক মানুষের জাগ্রত রূপ।

আসল যুদ্ধের দিন আসছে। সে বড় ভয়ঙ্কর দিন। আসল অগ্নিপরীক্ষা ঐ সব দিনেই হবে। আজ মানুষ উত্তেজিত, কেবলই উত্তেজিত। এমন মানুষ আর যা হোক আন্দোলনের বিশ্বস্ত সৈনিক হতে পারে না। উত্তেজনার আগুন পুইয়ে দু'দণ্ড আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে থাকা যায়, তার বেশি কিছু নয়। মৃত্যুঞ্জয় স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, পুলিশ আজ মার খেতে আসে নি। মারতে এসেছে। মরতে মৃত্যুঞ্জয়ের ভয় নেই, ভয় নেই নির্মল লায়েক, সহদেব টাঙ্গি, শরৎ লোহারদেরও। কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুব একটা সুস্পষ্ট অর্থ থাকা চাই। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অকারণে মৃত্যুবরণ করা কোনও লড়াইই নয়। ভীষণ লড়াইয়ের দিন সামনে। মৃত্যুঞ্জয় চান না, তার আগেই কিছু প্রাণ চলে যাক, কয়েক হাজার মানুষ বিভ্রান্ত হোক, মনের বল হারিয়ে ফেলুক...।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে জনতার একেবারে সামনে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয়। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, কমরেড্‌স্‌, আমি মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী বলছি। তুমরা একটুখানি ধৈর্য ধইরে শুন আমার কথা।

মৃত্যুঞ্জয়কে জমায়েতের সামনে দেখে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে।

মৃত্যুঞ্জয় বলতে থাকেন, 'উয়াদ্যার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। তিন-চারটা মানুষকে ধরতে এসে দশহাজার মানুষের জাঁতাকলে পড়েছে। এই শিক্ষাটুকু দিযে আজ আমরা উয়াদ্যার ছেইড়ে দিব।'

'লয়—।' জনতার ভেতর থেকে একটা জেদি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। মৃত্যুঞ্জয় তাকিয়ে দেখেন, কথাটা বলেছে কালিপদ লোহার।

বুনো মোষের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসে কালিপদ। চিৎকার করে বলে, 'আমাদ্যার বৃন্দা-সুরধনী গুলি খেয়েছে। তার শোধ আজ লিবই লিব।'

মৃত্যুঞ্জয় জবাব দেন, 'সে বিচারও হবেক। আমরা উয়াদ্যার ঘিরাও করে রাইখ্‌ব উই রাইসমিলে। সদর থিক্যে ম্যাজিস্ট্রেট আসুক, তদন্ত হোক।'

কালিপদ লোহার চিৎকার করে ওঠে, 'লয়—। আমরা রক্তের বদলে রক্ত চাই।'

তখন আন্দাজ বেলা এগারোটা। ভাদ্র মাসের পচা গরমে হাঁফাচ্ছে সবাই। গলগলিয়ে ঘামছে। লটাইড়ের জঙ্গল এলাকা থেকে জল বয়ে বয়ে একটা নালা মতন সৃষ্টি হয়েছে। নালার দু'পাশের উঁচু বাঁধ ভেঙেচুরে দাঁত বেব করে শুয়ে রয়েছে। ঐ নালার তলায় তলায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকে গোটাকয়েক কম বয়েসী ছেলে। কৃষ্ণ বাঁধের দিকেই অতি সন্তর্পণে এগোচ্ছে ওরা। প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। নালাটা চওড়ায় ছোট, কিন্তু গভীরতায় তিন ফুটের কম নয়, এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে মোরাম দেওয়া মোটর রাস্তার দিকে। রাইস মিলের পেছন দিয়ে খানিক এগ্গিয়ে নালাটা হল্‌দি-জোড়ে মিশেছে। নালায় এখন একবিন্দু জল নেই। লালচে মোরাম আর মোটা বালি দিয়ে ঢাকা তার বুক। নালার তলাটা দূর থেকে নজরে পড়ে না। সেই সুযোগটি নিয়েছে ছোকরার দল। সামনে হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে পুলিশ বাহিনী যখন তটস্থ, তখনই ওরা নিঃশব্দে চলেছে এক প্রলয়ংকর ঘটনা ঘটাতে।

৪৮. হটকারী রক্তপাত

মাত্র জনা দশেক পুলিশ শশকেব মতো ঘাড় গুঁজে বসেছিল রাইসমিলের মধ্যে। আচমকা তিন গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ এসে যাওয়ায় তাদের মনোবল চতুর্গুণ বেড়ে যায়। পবপর গোটা কয়েক টিয়ার গ্যাস ফাটায় ওরা। বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। পার্টির গোপন বৈঠকগুলিতে বারবার বোঝানো হয়েছে, পুলিশের মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়। গুলি, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, সবকিছুরই মোকাবিলা করবার উপায় জেনে গেছে জঙ্গলমহলের মানুষ। টিয়াবগ্যাস মাটিতে পড়তে না পড়তে দশবিশ জন ছুটে গিয়ে ভিজে বালি চাপা দেয় সেলের ওপর। টিয়ার গ্যাস ফাটেই না। তাছাড়া, ভাদ্র মাসে, চারদিকেই খানাখন্দে থইথই জল। দু'একটা সেল ফাটলেও, মানুষগুলো দৌড়ে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আসে।

পুলিশের প্রথম অস্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় উল্লাসে ফেটে পড়ে কালিপদ লোহারের দল। বৃন্দা আর সুরধনী তাদের জখম পা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে রাইসমিলের দিকে। পেছনে সাত-আটশো মহিলা।

বাঁধগাবার ডাঙা তখন স্পষ্টতই এক রণক্ষেত্র।

পশ্চিমে কৃষ্ণবাঁধ এবং অল্প তফাতে হলদি-জোড়। উত্তরে দ্বারকেশ্বর উথালপাথাল। বেঘোরে পড়লে এই দু'দিক দিয়ে পালানোর উপায় নেই কোনও পক্ষেরই। এখন দু'পক্ষের জন্য দুটি দিক খোলা। পুলিশের জন্য খোলা রয়েছে বিষ্ণুপুবের দিকটা। ঐ দিক থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে পুলিশ বাহিনী এসে ঢুকে পড়ছে রাইসমিলের মধ্যে। জনতার জন্য খোলা রয়েছে লটাহীড়ের জঙ্গল। বাঁধগাবার ডাঙা থেকে অল্প তফাতে শুরু হয়েছে জঙ্গলটা, সে জঙ্গল পেরোলেই পরপর দালালডাঙার জঙ্গল, তাঁতীপুকুরের জঙ্গল, মাচানতলার জঙ্গল, এবং সব শেষে দুর্ভেদ্য সেনাপতির জঙ্গল। কিন্তু খোলাপথ ব্যবহারের লক্ষণটুকুও দেখা যাচ্ছে না কোনও পক্ষের মধ্যে। জনতার দিক থেকে পাথর এবং তীর সাঁই সাঁই করে আছড়ে পড়ছে রাইমিলের দেয়ালে, ছাদে। পুলিশ ও পাল্টা টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ছে।

ওদিকে নালার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে ছোকরার দল পৌঁছে গিয়েছে একটা কালভার্টের তলায়। পাশেই একটা ঝাঁকড়া আমগাছ। অনেকখানি পথ সরীসৃপের মতো হেঁটে হেঁটে একটুখানি দম নিচ্ছে ওরা কালভার্টের তলায়। কালভার্ট থেকে নালাটা অল্প বেঁকে রাইসমিলের পেছন দিকে গিয়েছে। ছোকরাগুলো আবার এগোতে থাকে। এবার আরও সন্তর্পণে।

ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় প্রাণপণে জনতাকে শান্ত করতে ব্যস্ত। শরৎ লোহার কি একটা বলবার জন্য এগিয়ে আসছিল, তার আগেই ঘটে গেল অঘটন। রাইসমিলের মধ্যে সহসা পাঁচ-সাতজন সশস্ত্র পুলিশ আর্তনাদ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। মৃত্যুঞ্জয় চকিতে তাকালেন। দেখলেন, প্রত্যেকের পিঠে একটি করে তীর বিঁধে রয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাইস মিলের পেছন থেকে আওয়াজ উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

পলকের মধ্যে পুলিশ পজিশন নিল। এবং এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে লাগল জনতার দিকে। .

সহসা সারা ডাঙা জুড়ে কলরব, আর্তনাদ, বিক্ষিপ্ত আতঙ্কিত ছোটাছুটি...চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

আচমকা একটা গুলি এসে বিঁধল শরৎ লোহারের বুকে। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন ঠিক হাত দশেক দূরে। প্রচণ্ড আর্তনাদ করে শরৎ লোহারের বিশাল দেহখানা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরপর দুটো গুলিতে লুটিয়ে পড়ল বৃন্দা আর সুরধনী । এবং তৃতীয় গুলিতে বাঁকু লোহার।

অকস্মাৎ এমন এলোপাতাড়ি গুলি চলায় মানুষ মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করেছিল। শরৎ লোহারকে লুটিয়ে পড়তে দেখে তারা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যারা চলে যাচ্ছিল লঠীহীড়ের জঙ্গলের দিকে, তারা ঘুরে দাঁড়াল আবার। সাঁই সাঁই তীর ছুড়তে লাগল শয়ে শয়ে। দু'একজন পুলিশ আহত হল। যাদের তীর-ধনুক নেই, তারা ডাঙার মোরাম-পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়তে লাগল প্রচণ্ড আক্রোশে। মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন, জনতা একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। ওদিকে পুলিশবাহিনীও মরিয়া।

রাইসমিলের হাত বিশেক দূরে একটা বুনো খেজুরের ঝোপ। কাটুলের সহদেব টাঙ্গি হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঝোপটার দিকে। মৃত্যুঞ্জয় বুঝতে পারেন, সহদেব কাছাকাছি গিয়ে তীর ছুঁড়তে চায়। মানুষের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি ছুটতে লাগলেন সহদেবকে ঠেকাতে। পার্টিব এমন একজন নির্ভরযোগ্য কর্মী এমন বেকুবের মতো মরলে পার্টির অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ভিড় ঠেলে এগোনো দায়। কেউ কারো কথা শুনছে না। ভাদ্রের গরমে গলগলিয়ে ঘামছে সবাই। চোখগুলো ভাঁটার মত জ্বলছে। ক্ষিপ্ত মানুষের এমন ভয়াল রূপ মৃত্যুঞ্জয় এর আগে দেখেন নি।

মৃত্যুঞ্জয় তখনও হাত পনের তফাতে, অকস্মাৎ খেজুর ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল সহদেব টাঙ্গি। ধনুকে তীর জুড়ে প্রচণ্ড বেগে টান দিল। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলি এসে ঝাঁঝরা করে দিল তার বুক।

দু'হাতে মুখ চেপে বসে পড়লেন মৃত্যুঞ্জয়। মাথাটা সহসা ঘুরে গেল তাঁর। পর মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জনতার মধ্যে ঢুকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। কমরেড্স্, তোমরা থামো। আমি মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী বলছি। থামো। পিছিয়ে পিছিয়ে সবাই চল লটীহীড়ের জঙ্গলে। সেখানে আলোচনা করি। উপায় ঠিক করি। এভাবে গুলি খেয়ে মরবার কুনো অর্থ নাই। কমরেড্স্, উয়াদ্যার হাতে বন্দুক আছে, তিনশো। ঢিল আর কাঁড়-বাঁশ দিয়ে উয়াদ্যার সাথ কতক্ষণ লড়াই করবে তুমরা?

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গুলি এসে বিঁধল মাঝিপাড়ার পশুপতি লোহারের বুকে।

কমরেড্স, আমি তুমাদ্যার নেতা। আমি বলছি, তুমরা চলে এসো। সময় পাবো আমরা। পাবোই। এ একদিনের লড়াই লয়। এ গোটাকতক ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে মরে যাবার লড়াই লয়। আরও বহুৎ বড় লড়াই সামনে। তুমরা অবুঝ হয়ো নাই।

প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় সেদিন ক্ষিপ্ত জনসমুদ্রকে শান্ত করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। সরিয়ে এনেছিলেন পুলিশের রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে।

সেই রাতেই লটাইহীড়ের জঙ্গলে বসেছিল জরুরি বৈঠক। বিমল সরকার, মানিক দত্ত, প্রিয়ব্রত—সবাই উপস্থিত ছিল বৈঠকে। আত্মগোপনই স্থির হয়েছিল সেই বৈঠকে। কিন্তু একা নয়, সারা জঙ্গলমহলের বাছাবাছা কয়েকশো কর্মীকে নিয়ে সেই রাতেই দুর্ভেদ্য সেনাপতির জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

লাশগুলোকে নিয়ে আসতে পারে নি জনতা। পুলিশবাহিনী ওগুলোকে ঠিক শুয়োর বয়ে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে হাত-পা বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুপুরে।

আর, সেই বিকেল থেকে কালিপদ লোহারের কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নি। সে যেন হাওয়ায় মিশে গিয়েছিল।

তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, বহুদিন বাদে, গভীর রাতে, সেনাপতির জঙ্গলে।

৪৯. এক ঐতিহাসিক আত্মগোপন

জঙ্গলের নাম সেনাপতির জঙ্গল। জয়পুর থানার তাঁতীপুকুর এলাকায় বারো-চোদ্দ মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ ঘন জঙ্গল। ঐ জঙ্গলের সঙ্গে সোনামুখী হয়ে গঙ্গাজলঘাটির জঙ্গলের যোগ। এদিকে তালডাংরা হয়ে সিমলাপাল হয়ে রানীবাঁধ, ঝিলিমিলির জঙ্গল...। ওদিকে গড়বেতার বিস্তীর্ণ জঙ্গল... সব গা ছোঁয়াছুঁয়ি বসবাস। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা শুঁড়ি রাস্তা, অসংখ্য। ঐ সব পথ ধরে, এঁকে বেঁকে যেতে হত, ঘুরেঘুরে। জঙ্গলের ধারে ধারে গ্রাম। গ্রামে পৌঁছুবার সরু রাস্তা। সাধারণত ঐ সব পথ দিয়ে গাঁয়ের গরু-কাড়া চরতে যায় জঙ্গলে। রাস্তাগুলোকে বলে গো-বাথান। জঙ্গলের মধ্যে গরুর গাড়ি চলাচলের কাঁচা রাস্তাও ছিল।

ঐ জঙ্গলে অচেনা মানুষেরা ঢুকলে আর দেখতে হত না। পথ হারাবার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। অনেক সময় পথ হারিয়ে রাতভর জঙ্গলের মধ্যে বাউটি ঘুরণ চলত। এসব জঙ্গলে ঢুকতে হলে চাই অভিজ্ঞ গাইড। এলাকার লায়েক, লোহার—তারা ছিল জঙ্গল-চরা বুনো মানুষ। জঙ্গলের পোকা। জঙ্গলের অন্দিসন্ধি তারা চিনত নিজেদের হাতের তালুর মতো। পুলিশের তাড়া খেয়ে অতীতে বহু নেতা ঐসব জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দু'চার দিন বাদে, বিপদ কেটে যাওয়ার পর বেরিয়ে এসেছেন। পুলিশবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও ঐ সব জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পায়। বহুবার জঙ্গলের ভুলভুলাইয়ায় পথ হারিয়ে ওরা নাজেহাল হয়েছে। কখনও বা পার্টির লড়াকু বাহিনীর হাতে প্রচণ্ড ঠ্যাঙ্গানি খেয়ে ফিরেছে। জঙ্গলের ঝাঁকড়া গাছগুলোতে বসে বসে সাঁই-সাঁই তীর চালালে পুলিশের বড় বড় বাহিনীও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কোনদিক থেকে তীর আসছে বুঝতে না পেরে ওরা এলোপাতাড়ি দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেয়।

ঐ দুর্গম সেনাপতির জঙ্গলে শালকাঠের খুঁটি পুঁতে, শালপাতার ছাউনি দিয়ে বাস করছিলেন মৃত্যুঞ্জয়রা। সংগে ছিলেন হাজার-বারোশো জোয়ান মানুষ।

প্রিয়ব্রত একবার বহু মেহনতে পৌঁছেছিল ওদের কাছে, পরীক্ষিত বাউরির সঙ্গে। দেখেছিল, সেনাপতির জঙ্গলের দুর্গমতর অঞ্চলে চার-পাঁচশো কুঁড়েঘর। ঐ ঘরে বাস করছে কয়েক হাজার মানুষ। জঙ্গলের চিতাবাঘ, ভালুক, হুড়ার, বিষ-পিঁপড়ে, বিছে, বোলতা, ভীমরুলদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে বেঁচে রয়েছে ওরা। খাদ্য বলতে বনের ফল-মূল,

বনমোরগ, তিতির, গুডুর ও নানাজাতের পাখি। লাল রঙের বাবলা আলু, সেদ্ধ করলে বেলের মোরব্বার মতো, সামান্য তেতো স্বাদ, কষ বের করে নিতে হত। বর্ষায় সারা জঙ্গল জুড়ে হরেক কিসিমের ছাতু। বালি ছাতু, টিকবা ছাতু, কুড়কুড়িয়া ছাতু, কাড়াং ছাতু, মৌডাল ছাতু...। মৌডাল ছাতুর এক-একটার ওজন একপোয়ারও বেশি। কুঁড়িগুলো রাজহাঁসের ডিমের মতো। মাঝে মাঝে চাবপাশেব গাঁ'গুলো থেকে মেয়েরা বনে কাঠ ভাঙবার ছলে চলে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে যথাসাধ্য ভাত, চাল, চিঁড়া, মুড়ি, মতিহার, চা-চিনি আর কেরাসিন। রাতে জ্বলত কেরাসিনের ডিবরি।

প্রিয়ব্রত ক'রাত ছিল ওদের মধ্যে। সে এক অবর্ণনীয়, দুঃসহ জীবন। ভাদ্রমাসে সারা জঙ্গলে ছিপছিপে জল, কাদা, পাতাপচা, ভিজে-স্যাঁতস্যাতে কুঁড়েঘর। শয়ে শয়ে সাপ-কেউটে, চন্দ্রবোড়া, বাঁশমুগরা, ময়াল...। কাঠপিঁপড়ে, বিষ পিঁপড়ে, কাঁকড়া বিছেও অজস্র। রাতের বেলায় লাখে লাখে ঝিঁঝি ডাকত। আর শয়ে শয়ে খেঁকশিয়াল। হিংস্র বন্যজন্তুর ডাক ভেসে আসত আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে। কিন্তু মানুষগুলি ছিল অকুতোভয়। জঙ্গলে তাদের দিন কেটে যেত খাদ্য সংগ্রহে, পড়াশুনোয়, আলাপ আলোচনায়, গল্পে-গুজবে। দিনের বেলায় পার্টি-ক্লাস চলত নিয়মিত, রাতের বেলায় পালাক্রমে পাহারা দিত সবাই এমন কি মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা, মানিক দত্তও।

লায়েকরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। লায়েকদের গ্রামগুলোতেই পুলিশী অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। সম্ভবত লায়েক সম্প্রদায়ের একটি জোয়ানও গ্রামে থাকত না ঐ দুঃসহ দিনগুলোতে। প্রিয়ব্রত দেখেছিল, লায়েকরা শুধু নিজেরাই নয়, তাদের গরু ছাগলগুলোকেও এনে রেখে দিয়েছিল জঙ্গলে। জঙ্গলের মধ্যে রীতিমতো তাদের গেরস্থালি।

মাঝে মধ্যে সাপ মারা হত। আর, বনশুয়োর তেড়ে এলে গাছে চড়ে বসত সবাই। শুয়োরের ঘাড় সোজা। ঘাড় তুলে ওপরে তাকাতে পারে না। গাছের ডালে সামান্য উঁচুতে উঠে পড়লেই ওদের আর কিচ্ছু করবার থাকে না।

ওরা সেনাপতির জঙ্গলে ছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রিয়ব্রত ফিরে এসেছিল বাইরে। তার শরীর তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। সর্বদা খকখক করে কাশত। কাশির সঙ্গে দলাদলা শুকনো কফ।

মৃত্যুঞ্জয় বলেছিলেন, তুমি বাইরেই থাক কোকিল। নিজেকে নিরাপদ রেখে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে থাক। সেটাই এই মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন। আমাদ্যার কথা ভেবো নাই। পুলিশের সাধ্য নাই, এই জায়গার সুড়ুক সন্ধান পায়। পেলেও এই দুর্গম জঙ্গলে ঢুকে আমাদেরকে ধরবেক, অত সাহস শ্যালাদ্যার নাই।

৫০. কনকপ্রভার জন্য একটি ঝরনা

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জার নির্দেশকে মান্য করতে পারেনি প্রিয়ব্রত। উনিশ শো উনপঞ্চাশের তেরোই আগস্ট পবন শিকারী মারফত যে আশ্বাসবাণী পাঠিয়েছিল মায়ের কাছে, রক্ষা করতে পারে নি তাও। কারণ, ঐ সেনাপতির জঙ্গল থেকে বেরোবার কিছুদিন বাদেই আচমকা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল সে। এবং তার দিন কয়েক পরেই একদিন আচমকা শেষ

রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল মৃত্যুঞ্জয়দের পুরো ডেরাটিকে। পালাতে পারে নি বারোআনা মানুষ। এবং নেতাদের প্রত্যেকেই ধরা পড়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়েও রেহাই পান নি। ওরা শেষ অবধি চিনে ফেলেছিল ওঁকে। কেমন করে পুলিশ এত নিশ্চিতভাবে মৃত্যুঞ্জয়দের দুর্গম গোপন ডেরার সন্ধান পেয়ে গেল, এ ধন্ধ নেতাদের মধ্যে বহুদিন যাবৎ ক্রিয়াশীল ছিল। অবশেষে পার্টিই খুঁজে বের করেছিল বিশ্বাসঘাতকটির নাম। কালিপদ লোহার।

পাক্কা আড়াইবছর জেলে কাটিয়ে বাহান্নতে যখন ঘরে ফিরল প্রিয়ব্রত, তখন কুন্তী, প্রিয়ব্রতর একমাত্র সন্তান, সিংহগড় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল কুন্তী। কিছুতেই বাপের কোলে আসতে চায় নি পাক্কা এক হপ্তাকাল।

সেই কুন্তী আজ কত্তো বড় হয়ে গিয়েছে। মায়ের মতো রূপ পেয়েছে সে। আর, বাপের মতো জেদ। সে এখন সকাল-সন্ধ্যা নিয়ম করে পান্নালালের তালিমে গান শেখে। ইস্কুলে যায় পড়তে। সারাক্ষণ মায়ের চারপাশে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কাছে আসতে চায় না সহজে। প্রিয়ব্রত সারা দিন একতলার ঘরে একলাটি শুয়ে থাকে। কনকপ্রভা কখনো সখনো এক-আধদণ্ডের জন্য আসে। তখন কুন্তী আসে মায়ের গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে। মায়ের সঙ্গেই ফিরে যায় সে। তার একান্ত আপন একজনের কাছে যে এসেছে, এমন অভিব্যক্তি কখনই ফুটে ওঠে না তার চোখে মুখে। বরং, প্রিয়ব্রত খুব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে, কুন্তীর চোখের তারায় খুব চাপা অভিমান। খুবই কি অভিমান জমেছে মেয়ের মনে! জন্মলগ্নে প্রিয়ব্রত উপস্থিত থাকতে পারেনি, তাই? মাঝে মাঝে প্রিয়ব্রতর খুব ইচ্ছে হয়, কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। বলে, আমার ওপব কি খুবই রেগে আছিস মা? মনের ইচ্ছে মনেই থেকে যায়। প্রিয়ব্রত, নিজের সন্তানকে কাছে ডেকে নিতে পাবে না, চায় না। তার শরীর জুড়ে কালব্যাধির বসবাস। সে চায় না, সেই ব্যাধিগ্রস্থ শরীরখানি দিয়ে সে তার আত্মজর কচি শরীরখানিকে ছোঁয়। বরং ইদানিং প্রিয়ব্রত মনে মনে চায়, কুন্তী যেন কিছুতেই না আসে ওর ঘরে। কনকপ্রভাও।

এই মুহূর্তে দোতলার দক্ষিণের ঘরে কুন্তী গাইছে। প্রিয়ব্রত কান এড়ে শুনতে থাকে।

সিংহগড়ের একতলায় রোজ সন্ধ্যে হলেই ঘনিয়ে আসে আঁধার। হরিণমুড়ি নদী এবং তার দু'ধারের ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, ক্ষেত-মাঠ,—সবকিছু ডুবে যায় অসীম অন্ধকারে। কিন্তু সিংহগড়ের দোতলায় রাত্রি মানেই অন্ধকার নয়। সন্ধের আঁধার নামলেই দোতলায় হ্যাজাকের আলো জ্বলে ওঠে। আধো আধো বাজতে থাকে হারমোনিয়ম। তবলায় মৃদু মৃদু হাতুড়ির ঘা পড়ে। এক সময় ভেসে আসে কুন্তীর কচি গলা। সদা শিব ভজ মন...। ইমনকল্যান। মাঝে মাঝে কুন্তীর ভুল শুধরে দেবার ছলে গেয়ে ওঠে পান্নালাল।

ইদানিং সিংহগড়ের দোতলায় কোন কোনদিন বসে যায় জমজমাট জলসার আসর। রাধানগর থেকে তবলা বাজাতে আসে নওলকিশোর দাস। সে জলসায় নিকুঞ্জপতিও যোগ দেয়। কুন্তী একটা-দুটো গান গাইবার পর গান ধরে পান্নালাল। একের পর এক গেয়ে যায় সে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে সে গানের কলি ছড়িয়ে পড়ে সিংহগড়ের আনাচে কানাচে। হাওয়ায় মিশে যায় সুর। পান্নালাল গাইতেই থাকে।

পান্নালাল।

সিংহগড়ে এসেছিল উনিশশো পঞ্চান্ন-ছাপান্ন নাগাদ। লাবণ্য তখন বেঁচে ছিলেন। পান্নালাল নাকি কনকপ্রভার দূর সম্পর্কের ভাই। সাত বছরের কুন্তীকে গান শেখাবার জন্য এসেছিল সে। কোলকাতার কোন অপেরাদলে নাকি দীর্ঘদিন ছিল পান্নালাল। দীর্ঘকায়, মেদহীন যুবক। তীক্ষ্ম নাসা, পরিপাটি গোঁফ, আর ঘাড় অবধি নেমে আসা ঝাঁকড়া চুল। গলায় সুর আছে পান্নালালের। কনকপ্রভাই প্রায় জেদ করে সিংহগড়ে নিয়ে আসে ওকে। প্রিয়ব্রত তখন বাঁকুড়ায় বিড়ি-শ্রমিকদের লড়াই, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের লড়াই, সাঁওতাল বিদ্রোহের শতবর্ষ উদ্‌যাপন, বিষ্ণুপুরে তাঁত-শিল্পীদের লড়াই,— সারা জেলার তাবৎ লড়াইয়ের মধ্যে ডুবে রয়েছে।

পান্নালালকে সিংহগড়ে আমদানি করবার ব্যাপারে সম্ভবত লাবণ্যর সায় ছিল না। কিন্তু সে কথা কোনদিনও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন নি তিনি। বরং ছাপান্ন সালে, যখন প্রিয়ব্রত নিদারুণ অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিল সিংহগড়ে, থিতু হয়েছিল কিছুদিন, দেখেছে, পান্নালালের প্রসঙ্গ উঠলে লাবণ্য বরাবর কনকপ্রভাকেই সমর্থন করে গেছেন। বলেছেন, ভালই তো করেছে বৌমা। দিনকাল বদলাচ্ছে। মেয়েদের তো একটু আধটু গান-বাজানা শিখা দরকার। যে যুগের যা। বলতেন, শহরে তো ঘরে ঘরে ভদ্দর ঘরের মেয়েরা মাস্টার রেখ্যে গান শিখছে। প্রিয়ব্রত শুনে যেত। মায়ের মুখখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করত। ক্রমে ক্রমে তার বিশ্বাস হয়েছিল, লাবণ্য এই তেতো বড়িটি গিলতে বাধ্য হয়েছেন। সম্ভবত দুটো কারণে লাবণ্য নিঃশব্দে মেনে নিয়েছিলেন এই ব্যবস্থা। এক, কনকপ্রভার কাজকর্ম প্রিয়ব্রতর মনে কোনও বিরূপ ধারণা তৈরি করুক তা তিনি কিছুতেই চাইতেন না। প্রিয়ব্রত তো দেখেছে, সারাটা জীবন ধরে লাবণ্য কী আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন, যাতে প্রিয়ব্রত এবং কনকপ্রভার মধ্যে মিল হয়, মিলন ঘটে। এবং দুই, লাবণ্য তখন ছিলেন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। হরেক কিসিমের রোগ-ব্যাধি তাঁর শরীরে ও মনে নিঃশব্দে বাসা বেঁধেছিল। প্রিয়ব্রতর ধারণা, এক নিদারুণ হতাশা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। ফলে, অমন পঙ্গু শয্যাশায়ী শরীর নিয়ে কোনও কিছুর বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব। মেনে নিয়েছিলেন লাবণ্য, জীবনের শেষ পর্বে, সকলের সবকিছুকেই তিনি নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোনও কিছুরই প্রতিবাদ করা, রুখে দাঁড়ানোটাকে সম্ভবত তাঁর অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক মনে হত। এমন কি, জীবনের ঐ পর্বে পৌঁছে প্রিয়ব্রতকেও 'মন দিয়ে সংসার ধর্ম' করবার চিরাচরিত উপদেশটা আর দিতেন না তিনি। বাহান্নতে, যখন বাঁধাগাবা কেসে জেল খেটে ঘরে ফিরল প্রিয়ব্রত, দেখল, একখানা গ্রামোফোন এসেছে সিংহগড়ে। হিজ-মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানীর গ্রামোফোন। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দম দিতে হয় আর মাঝে মাঝেই পিন বদলাতে হয়। শুনল, লাবণ্যই নাকি কনকপ্রভার জন্য আনিয়েছেন যন্ত্রটি। পান্নালাল কোলকাতায় গিয়ে কিনে এনেছে। কনকপ্রভার দোতলার ঘরে মাঝে মাঝেই বাজে ওটা। সবাই বলে, কলের গান। একদিন শুনল, কনকপ্রভা গলা মেলাচ্ছে ঐ গানের সঙ্গে। অনুযোগ জানাতেই লাবণ্য ম্লান হাসেন। পরমুহূর্তেই আক্ষেপ ঝরে পড়ে তাঁর কণ্ঠে। বলেন, ' তুই তো আজীবনকাল উড়ে উড়ে বেড়ালি। ঐ টুকুন মেয়াটার সময় কী কর্যে কাটে, ভেবেছু?' কিন্তু প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছে, এই গানের যন্ত্রটি কেনার ক্ষেত্রে লাবণ্যর মমতা যত না ছিল, তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে কনকপ্রভার জেদ।

পান্নালাল প্রথমের দিকে সদর মহলের একেবারে পূব-দক্ষিণ কোণের ঘরখানায় থাকত। কেবল কুন্তীকে গান শেখাবার সময়টুকু অন্দরমহলের একতলায় যেত। অন্দরমহলের একতলার একখানা ঘরে থাকত নিকুঞ্জপতি। সে শঙ্করপ্রসাদের ভাইপো। তাকে এস্টেটের অন্য কর্মচারীদের মতো সদর মহলে রাখা চলে না। প্রিয়ব্রত তো আজীবনকাল উড়ন্ত পাখি। কোকিল। পান্নালালকে সদরমহলে দেখে সে উড়ে গিয়েছিল বছরখানেকের জন্য। বাঁকুড়ায় বিড়ি-শ্রমিকদের আন্দোলনে একেবারে ডুবে গিয়েছিল সে। সাতান্ন নাগাদ যখন ফিরে এল সিংহগড়ে, দেখল, পান্নালালের ঠাঁই হয়েছে অন্দর মহলের একতলায়।

প্রায় রুখে উঠেছিল প্রিয়ব্রত। কনকপ্রভাকে সরাসরি শুধিয়েছিল, 'এসবের মানে কি?'

'কিসের মানে কি?' কনকপ্রভা না বোঝার ভান করেছিল। অন্তত তেমনটাই মনে হয়েছিল প্রিয়ব্রতর।

'মেয়ের গানের মাস্টার, তারও ঠাঁই হয়েছে অন্দরমহলে?'

একটু বুঝি হকচকিয়ে গিয়েছিল কনকপ্রভা। সামলে নিয়ে বলেছিল, 'মায়ের কথামতোই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'মা বলেছেন থাকতে?'

'বিশ্বাস না হয় মাকেই শুধোও গিয়ে।'

'মায়ের কি মাথা খারাপ হল? কোথাকার—।'

এবার কনকপ্রভাকে একটুখানি গম্ভীর দেখাল। মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ কঠিন। বলেছিল, 'শুনতে পাই, তুমি নাকি কম্যুনিস্ট। তোমারও তো দেখছি আভিজাত্যবোধ টনটনে! উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তো বেশ বোঝ তুমি!'

প্রিয়ব্রত ভীষণ অস্বস্তিবোধ করেছিল। কনকপ্রভার সঙ্গে তর্কে নামতে প্রবৃত্তি হয় নি তার।

লাবণ্য শুনে বলেছিলেন, 'উয়াতে কি আছে? নিকুঞ্জপতিও তো রয়েছে।'

'নিকুঞ্জপতি আর পান্নালাল এক হল তোমার কাছে? নিকুঞ্জদা আমাদের আত্মীয়।'

'পান্নালালও আমাদের কুটুম্ব। বৌমার দূর সম্পর্কের ভাই সে।'

প্রিয়ব্রত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। মায়ের দু'চোখের তারায় খোঁজাখুজি জুড়েছিল অনেকক্ষণ। কথাগুলো মায়ের সত্যিকারের মনের কথা কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল তার। লাবণ্যর তখন শেষ অবস্থা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছিলেন তিনি। দু'চারটে কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। প্রিয়ব্রতর হাতখানি আস্তে আস্তে টেনে নেন তিনি। রাখেন নিজের কোলের ওপর। খুব শীর্ণ গলায় বলেন, 'উসব ছোটখাটো কথাকে বড় করে তুলিস নাই খোকা। বৌমার ভাই, সে যদি সদরমহলে কর্মচারীর মতো থাকে, উয়াতে নিন্দা হয়।' একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন লাবণ্য। তারপর বলেন, 'তুই বরং আমাকে একটা কথা দে।'

'কি কথা?'

'বল্, আর পালাবি নাই। থিতু হবি এবার। বৌমাটা বড় কাঁদে রে। আমি চোখ তুলে উয়ায় পানে তাকাতে পারি না।'

প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে সহসা অচেনা মোচড়। কনকপ্রভার মুখখানি চকিতে মনে পড়ে যায়। কাঁচা সোনার বর্ণ, পানপাতার মত ঢলোঢলো মুখখানি, আজও কনকপ্রভা কী সুন্দরী!

তবে খুঁটিয়ে লক্ষ করলে বোঝা যায়, ঐ মুখখানাতে সর্বদা এক ম্লান বিষাদের ছায়া, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে যেমন ঝামরে যায় মাধবীলতার শরীর। অনেকদিন বাদে, ঐ সন্ধ্যায় সহসা মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল প্রিয়ব্রতর, কনকপ্রভার কথা ভেবে।

৫১. পরীক্ষিত বাউরির আজন্ম পিপাসা

উনিশশো সাতচল্লিশের ঘোর বর্ষাকালে রোদনমুখর যে রাতে আমাদের দেশে স্বাধীনতা এল, সে রাতে সিংহগড়ের খুব কাছাকাছিই ছিল প্রিয়ব্রত। পরীক্ষিত বাউরির ঝোপড়িতেই ছিল সে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লুকিয়ে ছিল পুলিশের ভয়ে। পরে লোকমুখে যা সংবাদ পেয়েছে, ষোলই আগস্ট সারা বাঁকুড়া, বিষ্টুপুর জুড়ে উৎসবের নাকি প্লাবন বয়ে গেছে। কংগ্রেসের ডাকে সাধারণ মানুষ মিছিল করে পথ পরিক্রমা করেছে। আবির খেলেছেন নেতারা। পথের মোড়ে মোড়ে জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছে। মিষ্টান্ন বিতরণ, কোলাকুলি... শহরে মানুষজন একেবারে ভেসে গিয়েছিল খুশির জোয়ারে। কোলকাতা শহরে নাকি ঐদিন বাসে কোনও ভাড়া লাগে নি, খাবার দোকানে বিনে পয়সায় খেয়েছে শয়ে শয়ে মানুষ, কেন কি, স্বাধীনতা এসেছে দেশে।

ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাওযায় কাদের অতখানি আনন্দ হল, কেনই বা, সেটা বুঝতে প্রিয়ব্রতর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু সে অবাক হয়ে গিয়েছিল পরীক্ষিত বাউরির কথায়। হলুদ দাঁত গিজুড়ে পবীক্ষিত বলেছিল, 'বেল পেইকেছে আইজ্ঞা, বেল-খাউকাদিগের ফুর্তি, আমরা হইল্যম কাগের জাত।' সামান্য থেমে পরীক্ষিত বলেছিল,— 'আমার ইখন একটাই ভাবনা, কী কর‍্যে লিয়ে যাই আপনাকে বিষ্টুপুর শহরে।'

স্বাধীনতার হপ্তাটাক পরের কথা এসব। কথা হচ্ছিল পদমদীঘির পাড়ে বসে। সে ছিল এক গাঢ় অন্ধকারের রাত। শনশন হাওয়া বইছিল। দূরে লোখেশোল গাঁয়ে তুমুল হল্লা সহকারে নাচ-গান হচ্ছিল। ভাদুগান গাইছিল বাউরিপাড়ার মেয়েরা।

হপ্তাটাক ধরে পরীক্ষিত বাউবির ঝোপড়িতেই লুকিয়ে ছিল প্রিয়ব্রত। গুরুতর অসুস্থ সে। কাশির সঙ্গে সামান্য রক্ত বেরিয়েছে। খুব দ্রুত শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। কিন্তু পুলিশ ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। শহরে গেলে যে কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়ে যেতে পারে প্রিয়ব্রত। আরও দু'চার দিন হয়ত বা পরীক্ষিতের ঝোপড়িতে লুকিয়ে থাকত, কিন্তু বিকেলের দিকে হরবল্লভকে শালকাঁকির ডাঙায় অকারণে ঘুরে বেড়াতে দেখে আর ঝুঁকি নেয় নি পরীক্ষিত। সন্ধের আঁধারে ওকে নিয়ে চলে এসেছে পদমদীঘির পাড়ে।

ওরা বসেছিল ঈশেন কোণের বুড়ো তেঁতুল গাছটার তলায়। গেল দু'দিন বৃষ্টি হয় নি। তবে আকাশে মেঘ রয়েছে। সমস্ত তারা ঢেকে গিয়েছে।

ওরা একজনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ভাদুগানের সুর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ছিল, চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল নিঃশেষে। পরীক্ষিত বাউরি হাতের মুঠির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে শালপাতার তৈরি জ্বলন্ত 'চুটি'। মাঝে মাঝে লম্বা টান মারছে আর পুকপুক করে গরম ধোঁয়া ছাড়ছে। ওদের সুমুখে পদমদীঘির ঘুটঘুটে কালো জল। জলের ওপারে উঁচু পাড়। ঐ পাড়ের গা ঘেঁসে লাল কাঁকর বিছানো রাস্তাটা চলে গেছে জয়রামপুরের দিকে। অন্ধকারের মধ্যে চোখ অভ্যস্ত

সয়ে গিয়েছে। দু'জনেই দেখতে পাচ্ছিল চারপাশের নিকষ প্রকৃতিকে। ঝাপসা, অস্পষ্ট, মায়াবী কালো ওড়নায় ঢাকা।

পদমদীঘির পশ্চিমে চুয়ামসিনা গাঁয়ের শুরু। পূর্বপাড়ে প্রাচীন অর্জুনের সারবন্দী মিছিল। তার ওপারে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। এখন সারা মাঠ জুড়ে হাঁটুপ্রমাণ ধানের গাছ। দক্ষিণে লাল মেঠো রাস্তার ওপারে বিস্তীর্ণ শালকাঁকির ডাঙা। এবড়ো-খেবড়ো, উঁচালি-নীচালি, ঝোপঝাড়ে ভরা। আর, সারা মাঠ জুড়ে, এই ঘোর বর্ষাকালে, পিংদোঘাসের ঠাসবুনোট। ওখান থেকেই একটা খবর আসবে। ঐ খবরটার জন্যই দু'জনের উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

পরীক্ষিত বাউরি থিরপলকে তাকিয়েছিল মাঝদীঘির দিকে। ঘুটঘুটে কালো জলের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়েছিল চোখ।

শরীরের যন্ত্রণা প্রাণপণে চাপতে চাপতে প্রিয়ব্রত শুধোয়, 'কি দ্যাখ?'

জল থেকে দৃষ্টি সরায় না পরীক্ষিত। দীঘির কালো জলের মতোই থমথমে হয়ে ওঠে ওর মুখখানি। খানিক বাদে খুব মৃদু গলায়, অনেকটা নিজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গিতে বলে, 'মাঝে মইধ্যে ইচ্ছা জাগে, যদি সিদিন এই দীঘিটাকে এক গণ্ডুষে পান কইর্‌ঢ্যে ফেলতে পারথ্যম্। অগস্ত্য মুনির মতন।'

অগস্ত্য মুনির এক গণ্ডুষে সমুদ্রের তাবৎ জল নিঃশেষে পান করে ফেলার বৃত্তান্ত পরীক্ষিতের মুখেই শুনেছিল প্রিয়ব্রত। এক সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কাহিনীটা বলেছিল পরীক্ষিত।

পরীক্ষিত নিজের মনে বিড়বিড় করে চলে। তখন আমার বাপ নিশান বাউরি মাঝদীঘিতে সমানে হাপুচুপু খাচ্ছে। এই তেঁতুলগাছটার তলায় সিংহগড়ের বড়বাবু পারিষদসহ বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে দেখছেন সেই দৃশ্য। রুদ্র শিকারী এবং আরও তিন-চারটা লগদি পাকা বাঁশের লাঠি বাগিয়ে দীঘির চারদিকে কোমরসমান জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাতে কোনওগতিকে নিশান বাউরি জল থেকে উঠে পালাতে না পারে। আর মাঝদীঘিতে দুটো লগদি নিশান বাউরিকে পালা করে চোবাচ্ছে। ওদের থেকে কোন গতিকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ের দিকে এগোলেই কোমর জলে খাড়া থাকা লগদিগুলো জলে লাঠি আছড়ে নিশানকে পুনরায় ভাগিয়ে দিচ্ছে মাঝদীঘির দিকে। হাঁসফাঁস করছে নিশান বাউরি। কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে। আর, সিংহগড়ের বড়বাবু তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এই তেঁতুলতলার ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে বসে সেই সুখকর দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। দীঘির বিপরীত পাড়ে দাঁড়িয়ে শালকাঁকির পুরো বাউরিপাড়া ভয়ে-আতঙ্কে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লেগেছে। ঐ জমায়েতের মধ্যে পরীক্ষিতও ছিল। নিশানের দ্বিতীয়পক্ষ, পরীক্ষিতের মা, তখন নিরুপায় কান্না জুড়েছে। আর পরীক্ষিত, মায়ের আঁচলখানা চেপে ধরে কাঠ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নিশানকে যখন চুবিয়ে ধরছে লগদিগুলো, পরীক্ষিতের মা আকুল আর্তনাদ তুলে ছুটে যেতে চায় জলের দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় জলে। ত্রাণকর্ত্রী হতে চায় নিশান বাউরির। পাড়ার মুরুব্বিরা তাকে দু'হাতে জাপটে কোন মতে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। বলা যায় না, নিশানের বউয়ের জলে ভেজা শরীরখানা দেখে ফের কোন্ মজাদার খেলা মাথায় খেলে যায় বাবুদ্যার।

পরীক্ষিত বাউরি তখন দশ-এগারো বছরের বাচ্চা। গাঙ্গুলিদের বাড়িতে পেট-ভাতুয়ায় গরু চরায়। আর, রাতের বেলায় আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। একা একা চলে যায়

বিষ্ণুপুরের তুরকির ডাঙায় মেলা দেখতে। রাতভর কথকতার গান শোনে বৈত্যা-অর্জুনপুরের নাটমণ্ডপে। বত্রিশভাগীর জঙ্গলে পোড়া মউলের থানে ঘুরঘুর করে ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত। শেষ রাতে ফিরে আসে ঘুম ঘুম চোখে। নিশাচর হিসেবেই একদিন নিশুতরাতে এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে মোলাকাত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জার সঙ্গে। সে প্রসঙ্গ পরে। উপস্থিত, পদমদীঘির পাড়ের জমায়েতের মধ্যে রোদনরতা মায়ের পাশে খাড়া থাকতে থাকতে পরীক্ষিত বাউরির সর্বাঙ্গে অচেনা শিহরণ। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুক জুড়ে মরুভূমির পিপাশা। এক সময়, ওর পাশটিতে রুখা কাঁকুরে ভূমির ওপর লুটিয়ে পড়ে কাটা পাঁঠার মত ছটকাতে লাগল মা। তার বুক ফাটা আর্তনাদ মিশে যাচ্ছিল দুপুরের তপ্ত বাতাসে। ঠিক সেই মুহূর্তে পরীক্ষিত বাউরির এমনই পিপাসা পেল বুক জুড়ে, মনে হল, পদমদীঘির সবটুকু জল এক গণ্ডুষে শুষে নেয়। কারণ, শুকনো দীঘিতে মানুষকে চোবানো যায় না।

পদমদীঘিটা ছিল সিংহগড়ের বড় তরফের। গাঁ-ছাড়া দীঘি হলে যা হয়, চার পাশের গরীব-গুরবোরা চুনোজাল, গাঁতিজাল ফেলে, কুঁড়োজালি ডুবিয়ে চুনোপুঁটি ধরে ধরে খেত। সিংহবাবুরা ধমক-চমক দিলেও খুব একটা আপত্তি কোনদিনই করেন নি। কিন্তু নিশান বাউরির ক্ষেত্রটাই স্বতন্ত্র। সে সিংহগড়ের চোখের বালি। দু'চক্ষের বিষ। তার জন্য বহুকাল ধরে বহু তরিকার সাজা গচ্ছিত রয়েছে সিংহগড়ে। তার কোনও ক্ষমা নেই। কাজেই কুঁড়ো জালি ডুবিয়ে পদমদীঘি থেকে তার সামান্য চাঁদা-চিংড়ি ধরবার খবরটাও, যথা সময়ে পৌঁছে যায় সিংহগড়ে। এবং সেই সুবাদে, ঐদিনই আড়াইপহরটাক বেলায় তার বিচার শুরু হয় পদমদীঘির পাড়েই।

সেদিন সূর্য যখন মধ্য আকাশ থেকে হেলে পড়েছে, নিশান বাউরির জীবন্মৃত শরীরখানাকে পাঁজাকোলা করে বয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে বাউরি পাড়ার মানুষ।

নিশান বাউরির প্রতি সুদর্শন সিংহবাবুর এমন ক্ষমাহীন ক্রোধের পর্যাপ্ত কারণ ছিল। মঙ্গল শিকারির পরেই নিশান বাউরিই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যে কিনা সুদর্শনের আকাশ প্রমাণ দম্ভের শরীরে আঘাত করেছিল। এমন কিছু বড়সড় ছিল না সে আঘাত, কিন্তু হৃদয়বিদারী ছিল। লৌহমুষল দিয়ে মাথায় নয়, নিশান বাউরি বুঝি বনকলমির এক গাছা কাঁচা লিকলিকে ডাল দিয়ে আলতো কয়েকটি ঘা মেরেছিল সুদর্শনের পশ্চাদ্দেশে। লিকলিকে বনকলমির ডালের গুটিকয় ঘা মাত্তর, হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, নিতান্তই সামান্য জ্বলুনি, আধঘণ্টার বেশি তার আয়ু নয়, কিন্তু সুদর্শন তার দরুনই বুঝি নিজের মহার্ঘ মাথাখানি আকাশের দিকে তুলতে সঙ্কোচ বোধ করতেন আজীবনকাল। কেন না, সুদর্শনের হুকুম মেনে নিশান বাউরি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, নিজের দু'হাতের আঁজলায় প্রথম পক্ষের সুন্দরী যুবতী বউটাকে বসিয়ে ঠিক অঞ্জলি দেবার মুদ্রায় সুদর্শনের পাদপদ্মে অর্পণ করল না। সে রাতে বউ সিংহবাবুদের জয়রামপুরস্থ 'লৈতন কাচারি ঘরে' এলোই না। সুদর্শন সিংহবাবু রাতভর আশায় আশায় বসে থাকতে থাকতে এক সময় দেখলেন, দাপানজুড়ির জঙ্গলের মাথায় পুব আকাশ ধূস্না হয়ে এসেছে। সুদর্শন খুব আশা করেছিলেন, সকাল হলেই সিংহগড়ের লগদিরা গিয়ে আবিষ্কার করবে, নিশান বাউরি বউকে নিয়ে পালিয়ে গেছে রাতের আঁধারে সিংহগড়ের এলাকা ছেড়ে। হয়ত বা আশ্রয় নিয়েছে কোনও দুর্গম জঙ্গলে, কেবল সিংহগড়ের রোষ থেকে

প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। কিন্তু না, বনকলমির লিকলিকে ডালের দ্বিতীয় ঘা'খানি পড়ল, যখন নিশান বাউরি পালাল তো না-ই, বরং পরের দিন, সকালে, নির্দিষ্ট সময়ে যথারীতি কাজে এল, এবং সুদর্শন সিংহবাবু কতখানি ক্ষেপেছেন, কতখানি ফুঁসছেন, ফুটছেন, তার কোনও খোঁজখবর না নিয়েই লেগে গেল নিজের কাজে। তার ঐ নির্লিপ্ত ভাবখানা যে সুদর্শনের চণ্ডাল ক্রোধের আগুনে ঘি ঢেলে দিতে পারে, সেটাও তেমন করে গায়ে মাখল না উজবুক। তৃতীয় ঘা'খানি পড়ল কিছু পরে, যখন নিশানের সেই সুন্দরী বউ সিংহবাবুদের 'লৈতন কাচারি ঘর'-এ রাতভর ধর্ষিতা হয়ে শেষ রাতে ওখানেই গলায় দড়ি দিয়ে মরল এবং সর্বসমক্ষে সুদর্শনের মুখ পোড়াল। বছরটাক বাদে যখন নিশান বাউরি তার পিসির জোগাড় করা সুন্দরী মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করে বসল এক কুৎসিত রমনীকে, যাকে বলে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা। পরবর্তীকালে খুব একান্তজনদের কাছে বলেছিল নিশান বাউরি, 'এ হইল্যাক গায়ে গু মেইখ্যে ভূত খেদানো।' সুদর্শনের কানে যথাসময়ে পৌঁছেছিল নিশান বাউরির উক্তিগুলি। বনকলমির লিকলিকে ডাল দিয়ে এই চতুর্থ ঘা'খানাই ছিল সুদর্শনের পক্ষে বাস্তবিকই মর্মান্তিক।

আর পঞ্চম ঘা'খানি হল, ঐ কুৎসিত রমনীর গর্ভে জন্মাল কিনা এমন এক সন্তান, যার চোখে আগুন, মুখে আগুন, দু'হাতে, দু'পায়ে, সর্বাঙ্গে আগুন। সেই আগুন সে ছুঁইয়ে দিয়েছে সিংহগড়ের চূড়োয়। সে সিংহগড়ের বড় তরফের একমাত্র উত্তরাধিকারীকে টেনে নিয়ে গেছে অসিংহগড়ীয় তাবৎ কর্মযজ্ঞের মাঝখানে। ফেলে দিয়েছে জেলাব্যাপী বয়ে যাওয়া এক প্রবল ঘূর্ণীঝড়ের কেন্দ্রভূমিতে। স্বদেশী আন্দোলন থেকে, তেভাগা। তেভাগা থেকে বিড়িশ্রমিকদের আন্দোলন। সেখান থেকে জলডুবি আন্দোলন...। আর সেই সুবাদে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে নিজের ঝুপড়িতে। স্যাঁতস্যাঁতে মাটির ওপর নোংরা চটের বিছানায় শুইয়েছে। তাকে খাইয়ে দিয়েছে পান্তা-আমানি, শুকরের মাংস, গেঁড়ি-গুগলি...। সব মিলিয়ে স্বর্গের দ্যাবতাকে নামিয়ে এনেছে একেবারে ধুলোবালির মধ্যে। পান্তা-আমানিকে রাজভোগের বিকল্পে পরিণত করেছে। আর তারই সুবাদে সিংহগড়ে বারংবার শত্রুর বেশে এসেছে খাঁকি পুলিশ, দু'চোখে কুটিল সন্দেহ নিয়ে গড়ময় খুঁজেছে প্রিয়ব্রতকে , ঠিক যেমন করে দাগী চোরের বাড়িতে মাল খোঁজে ওরা। সদরে রিপোর্ট গিয়েছে সিংহগড়ের বড় তরফের নামে। সরকার বিরূপ হয়েছে। কংগ্রেস অস্বস্তিবোধ করেছে। আর সবকিছু সুদর্শনকে মাথা হেঁট করে হজম করতে হয়েছে। প্রিয়ব্রত জেলে গেছে, চোর-ডাকুদের সঙ্গে হাজত বাস করেছে, সেইসব চোর-ডাকুরা বেরিয়ে এসে সাতকাহন করে গল্প করেছে, কেমন করে এ ক'টা দিন তারা সিংহগড়ের খোকাবাবুর সঙ্গে এক হাজতে কাটাল। তারা রঙ চড়িয়েছে আসল ঘটনার ওপর। অনেক অনেক পোচ রঙ। আর, পাশের গড়ে প্রতাপলাল এবং তার ছেলে হরবল্লভ সব কিছু দেখেশুনে ভেতরে ভেতরে হেসে কুটিকুটি হয়েছে।

সুদর্শন সিংহবাবু অবশ্য জীয়ন্তে দেখে যেতে পারেন নি সবটুকু। তেভাগা আন্দোলনের আগেই তিনি চলে গেছেন ওপারে। কিন্তু বেঁচে থাকতে যতটুকু দেখে গেছেন, তাতেই তাঁর ক্রোধ, তীব্র হলাহলের মতো ফেনিয়ে উঠেছে প্রথমে প্রিয়ব্রতর ওপর, তার থেকে পরীক্ষিত বাউরি হয়ে একেবারে নিশান বাউরি পর্যন্ত। তাই জীয়ন্তে সামান্যতম সুযোগ পেলেই নিশান

বাউরিকে ছাড়েন নি সুদর্শন। ওকে বাগে পাওয়ার জন্য পেতেছেন নিত্য-নতুন ফাঁদ। পরীক্ষিত তার কিছু কিছু জানে। অনেকটাই হয়ত বা জানে না। যেটুকু জানে, সেটাও বুকের মধ্যে বরফের মতো জমিয়ে রেখেছে। গলিয়ে তা তরল করতে চায় না কারো কাছেই। কেবল দৈবাৎ কোনও দুর্বল মুহূর্তে সে বুকের খাঁচাখানি মেলে ধরে, কেবলমাত্র প্রিয়ব্রতর সুমুখে। গলিয়ে দেয় বুকের সামান্য বরফ কোনও নিবিড় উষ্ণ সান্নিধ্যের মুহূর্তে।

মৃত্যুর আগে নিশান বাউরিকে শেষ শাস্তি দিয়ে গিয়েছিলেন সুদর্শন। পরীক্ষিত বাউরি তখন স্বদেশী আন্দোলনে ঘরছাড়া। একদিন রুদ্র শিকারীর দল ঘিরে ফেলল নিশান বাউরির ঝুপড়ি। ওকে তুলে আনা হল সিংহগড়ে। তারপর তাকে এমনই এক শাস্তি দেওয়া হল, যা বাউরি সমাজে কেউ কল্পনাও করে না। মারধর নয়, টাঙানোঝোলানো নয়, সুদর্শনের আদেশে আস্তাবল থেকে ঘোড়ার নাদি এনে নিশান বাউরির দু'হাতে আচ্ছা করে মাখিয়ে দেওয়া হল। খানিকটা পুরে দেওয়া হল ওর মুখে। বাউরি সমাজে ঘোড়ার নাদি যে কী পরিমাণ অস্পৃশ্য বস্তু, তা সুদর্শনের অজানা ছিল না। সারা জীবনে যে মানুষটা একদিনের তরেও চোখের কোল ভেজায় নি, সেই নিশান বাউরির দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা।

পরের দিনই শালকাঁকির বাউরিরা নিজেদের সমাজ ডেকে একঘরে করে দিল নিশানের পুরো পরিবারকে। কারণ ঘোড়ার নাদি একটিবার ছুঁয়েছে যে বাউরি, হাজার প্রায়শ্চিত্তেও কাটে না তার দোষ। বাউরি-সমাজে সে চিরতরে অচ্ছুৎ।

এখন নিশান বাউরি হাসে না, কথা কয় না, দিনরাত কেবল সামনের ডোবার জলে নেমে গিয়ে হাতদুটিকে রগড়ে রগড়ে ধোয়। বারবার কুলকুচো করে জল ছুঁড়ে দেয় আকাশের দিকে।

গভীররাতে তেঁতুলতলার গাঢ় অন্ধকারে নিঃশব্দে বসে ছিল পরীক্ষিত বাউরি। মুঠির মধ্যে জ্বলন্ত 'চুটি' পুড়ে পুড়ে ছাই। কেবল চোখ দুটি তখনও অন্ধকারে জ্বলছিল।

পরীক্ষিত আবারও বিড়বিড়িয়ে উচ্চারণ করে, 'সিদিন যদি পদমদীঘির সবটুকু জল এক গণ্ডুষে পান কইর‍্যে ফেইল্‌তে পারথ্যম্!'

প্রিয়ব্রত জবাব দিতে পারে নি। কোনও জুতসই জবাব খুঁজেই পায় নি সে। কিন্তু চুবুনি খাওয়া নিশান বাউরির কষ্টটাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে সেও। তাকেও যে নিশান বাউরির মতই চুবোনো হয়েছে দীঘির জলে। প্রাচুর্য এবং আভিজাত্যের এক অতলস্পর্শী দীঘি। তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে ঢকঢকিয়ে গিলতে হয়েছে সেই দীঘির জল। তার পুরো শৈশব, কৈশোর জুড়ে তাই কেবলই এক দম আটকানো স্মৃতি।

তেঁতুলতলার গাঢ় অন্ধকারে রাত্রি উজাগর করতে করতে কখন জানি বুঁদ হয়ে গিয়েছিল প্রিয়ব্রত। আচমকা ঠেলা খেয়ে হুঁশ ফিরল। ঠেলা মেরেছে পাশ থেকে পরীক্ষিত বাউরি। প্রিয়ব্রত অন্ধকারে ওর দিকে তাকায়।

ফিসফিসিয়ে পরীক্ষিত বলে, 'ওই বুঝি আইল্যাক।'

প্রিয়ব্রত অন্ধকারে চোখ চারায়। ঠাহর করে দেখে। একখানা গাঢ় ছায়ামূর্তি খুব সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে তেঁতুল তলার দিকে।

একটু বাদে সে পাশটিতে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল। কোনও সন্দেহ নেই, শঙ্কা নেই তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

অবলা। পরীক্ষিত বাউরির বউ।

পরীক্ষিতের গা ঘেঁসে বসে পড়ে অবলা।

ফিসফিসিয়ে বলে, 'কেঁদগাছের তলায় ডুলি তিয়ার।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় তিনজন। পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে কেঁদতলার দিকে।

দড়ির খাটিয়ায় বাঁশ বেঁধে ডুলি বানানো হয়েছে। চারপাশটা কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। লাবণ্যর সরু কালোপেড়ে কাপড়। মায়ের কাপড়ের সুবাস নির্ভুল নিশানায় চলে আসে প্রিয়ব্রতর নাকে। পাশে অপেক্ষা করছিল কুম্বা শিকারি, তার ছেলে পবন শিকারি। পিট পিট করে দেখছিল প্রিয়ব্রতকে। মঙ্গল শিকারির ছেলে কুম্বা শিকারি, আজ লাবণ্যর অতি বিশ্বস্তজন।

ওরাই প্রিয়ব্রতকে বয়ে নিয়ে চলল পিচ্ছিল আলপথ ধরে বিষ্টুপুরের দিকে। প্রিয়ব্রতর সারা শরীরে তখন বৃশ্চিকদংশন শুরু হয়েছে। বুকের মধ্যে গরগর করছে জমাট বাঁধা কফ। তার মধ্যেও লাবণ্যর মুখখানা চকিতের জন্য ভেসে ওঠে মনে।

৫২. মঙ্গল শিকারির উত্তরাধিকার

বহুবছর আগে, সুদর্শনের বাবা দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবু বত্রিশভাগীর জঙ্গলে সামান্য মহুল কুড়োবার অপরাধে মঙ্গল শিকারিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। সে এক নির্মম মৃত্যুদণ্ড। বত্রিশভাগীর জঙ্গলে মহুলগাছের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলেন ওকে। রাতের বেলায় ভালুকের দল মহুল খেতে এসে শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করেছিল। আজ তারই আত্মজরা প্রিয়ব্রতকে গভীর রাতে বয়ে নিয়ে চলেছে নিজেদের প্রাণকে তুচ্ছ করে।

সামান্য মউল কুড়োবার জন্য মঙ্গল শিকারিকে অমন নির্মম শাস্তি কেন দিয়েছিলেন দ্বারিকাপ্রসাদ সে বৃত্তান্ত প্রিয়ব্রত শুনেছে পরীক্ষিত বাউরির মুখ থেকে।

দ্বারিকপ্রসাদের আমলে, বাঁকুড়া জেলায়, ডাঙা ভেঙে চাষযোগ্য জমিন তৈরি করাত জমিদাররা। প্রধানত নিম্নবর্গের মানুষজন দিয়েই এ কাজ করানো হত। লোহার মতো শক্ত উঁচু উঁচু ডাঙাকে শরীরের তাবৎ ঘাম ঝরিয়ে ভাঙত বাউরি-বাগদি-খয়রা-লোহারের দল। তারপর, দু'এক বছর সাঁজায় চাষ করিয়েই তৈরি জমিটি কেড়ে নিত জমিদার। বন্দোবস্ত দিত মধ্যবিত্ত চাষীদের। বাউরি-শিকারিদের বলত, আর একটা ডাঙা ভাঙ্। তিয়ার কর্ জমিন। চাষ কর্ সাঁজায়। মানুষগুলো আবার ভাঙত ডাঙা, শরীরের তাবৎ রক্ত জল করে, আবারও কেড়ে নেওয়া হত সে জমি। একজন খাল সিঁচতো, কই খেত অন্যজন। পরীক্ষিত বাউরির ভাষায়, বাছুরেরা মায়ের বাঁটে ঢুশ মেরো মেরো দুধ পানাত, দুধ দুয়ে লিথ্যো গিরস্থ। বাছুরটা কেবল চেঁইয়ে দেখ্থ ভুলভুল চোখে। যুগে যুগে হতভাগ্য মানুষগুলো মুখ বুঁজে সয়ে গিয়েছে ঐ বঞ্চনা। কেবল মঙ্গল শিকারিই তৃতীয় বারে আচমকা বিদ্রোহ করে বসে। সে তার তৈরি ডাঙা জমিনের দখল ছাড়তে চায় নি। কার উস্কানিতে যেন, সে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্জি জানিয়েছিল। একটা 'ইন্‌কুঁয়ারি' ও এসেছিল সেই বাবদ। সেই 'ইন্‌কুঁয়ারি অফিসারের' কাছে দস্তুরমতো বয়ান দিতে হয়েছিল দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবুকে। সাক্ষী সাবুদ জোটাতে হয়েছিল

নিজের পক্ষে। ভুরিভোজ খাওয়াতে হয়েছিল। নগদ অর্থ, গাওয়া ঘি, পাকা রুই,—শেষ অবধি প্রায় ছ'মাস বাদে 'হঁদকুঁয়ারি অফিসার'-এর থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর তবেই লগদি-লেঠেল সহকারে রীতিমতো বলপ্রয়োগ করে সে জমির দখল নিতে হয়েছিল। জমিটা শেষ অবধি নিজের কব্জায় রাখতে পারে নি মঙ্গল শিকারি। কিন্তু দ্বারিকাপ্রসাদের আত্মমর্যাদায় সে শেল হেনেছিল। সারা এলাকা দম বন্ধ করে দেখেছিল সেই হাড়-হিম-করা নাটক। শত্রুরা মুখ টিপে হেসেছিল। একটা সামান্য প্রজাকে টিট করতে গিয়ে ভুরিভোজ, গাওয়া ঘি, নগদ অর্থ, পাকা রুই..., প্রায় মশা মারতে কামান দাগবার সামিল। একটা হাতির জন্য হলেও কথা ছিল, নেহাতই একটা মশার জন্য!

অযোধ্যার বাঁড়ুজ্জাদের সঙ্গে কিংবা শালুকার জঙ্গল নিয়ে শিমলাপালের ষড়ঙ্গীদের সঙ্গে দীর্ঘ মামলা-মোকর্দমা, লড়াই চলত চুয়ামসিনার সিংহবাবুদের। বহু অর্থ ক্ষয় হয়েছে তাতে। বহু রক্তপাত হয়েছে। রাজকর্মচারীদের হাত করবার জন্য মদ-মাংস-মেয়েছেলে, অর্থ, উপঢৌকন দিয়ে, অনেক সময় সামান্য হীন হয়েও রাজপুরুষদের কৃপা ও আনুকূল্য ভিক্ষা করতে হয়েছে। সেটা হাতির জন্য। মঙ্গল শিকারির সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রায় তেমনটাই করতে হল দ্বারিকাপ্রসাদকে। এর ফলে মঙ্গল শিকারির তো লেজ ফুলে শুয়াপোকা। এলাকার চাষাভুষোরা তো বটেই, সচ্ছল মধ্যবিত্তরাও ওকে সমঝে চলতে শুরু করেছিল। কারণ সে আর কারো নয়, খোদ চুয়ামসিনার সিংহবাবুদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এটা মঙ্গল শিকারির যতখানি উত্তরণ তার চেয়ে ঢের বেশি সিংহবাবুদের অবনয়ন।

পিঁপড়ের পাখনা গজালে নাকি সে পাখায় ফরফরানি আওয়াজটা বেশি হয়। সে আওয়াজ অসহ্য। পাখি-পাখালের নয়, বাজ-শিকর‍্যার নয়, একটা পিঁপড়ার পাখার অমন ফরফরানি আওয়াজ সহ্য করা যায়?

দ্বারিকাপ্রসাদ তক্কেতক্কে ছিলেন। লোক লাগিয়ে রেখেছিলেন মঙ্গল শিকারির পেছনে। যেই না জঙ্গলে ঢুকে মউলটি কুড়োল, অমনি দ্বারিকাপ্রসাদ সুযোগ পেয়ে গেলেন।

দ্বারিকাপ্রসাদের সন্দেহ হয়েছিল, মঙ্গল শিকারি নিজের বুদ্ধিতে এসব করে নি। অতখানি দুঃসাহস হওয়ার ওর কথা নয়। কেউ ওকে পেছন থেকে উসকে দিয়েছিল। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। মঙ্গল শিকারি নামক মেড়াটির খুঁটি ছিল সম্ভবত অযোধ্যার বাঁড়ুজ্জারা। ওরাই সম্ভবত, সিংহবাবুদের হেয় করবার উদ্দেশ্যে, পেছন থেকে যাবতীয় কলকাঠি নেড়েছিল। কিন্তু পরীক্ষিত তা মানে না। মঙ্গল শিকারির মধ্যে তার নিজস্ব আগুন ছিল। তার পূর্বপুরুষ চুয়াড় বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। পরীক্ষিতের মতে, মঙ্গল শিকারি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, রাঢ়ভূমিতে আরও একবার চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটত, এমনই ছিল তার মনের শক্তি, বুকের সাহস আর রাজা-জমিনদারদের প্রতি সুগভীর ঘৃণা।

প্রিয়ব্রতরও মনে হয় পরীক্ষিত বাউরিই ঠিক। ঐ শিকারি বংশে এক অন্যতর আগুন রয়েছে। আনুগত্য নয়, সেই আগুনের টানেই ওরা আজ অসুস্থ প্রিয়ব্রতকে কাঁধে নিয়ে পিচ্ছিল আলপথে, সাপখোপ অগ্রাহ্য করে, নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে উল্কার বেগে ছুটছে।

৫৩. প্রিয়ব্রতর আশ্রয়

প্রবল জ্বরে প্রায় বেঁহুশ প্রিয়ব্রতকে নিয়ে শেষ রাতে কুম্বা শিকারিদের ডুলি এসে পৌঁছেছিল বিষ্ণুপুর শহরে। পরীক্ষিত বাউরিরা তখন তাকে ময়রাপুকুরের একটা পুরাতন

আদলের বাড়িতে নিয়ে তুলেছে, শুইয়ে দিয়েছে পরিপাটি বিছানায়, কখনই বা পার্টির বিশ্বস্ত ডাক্তার গৌরদাস দত্তকে ডেকে এনেছে, কিছুই তেমন করে বুঝতে পারে নি প্রিয়ব্রত। অনেক বেলায় জ্বর একটুখানি কমলে পর তার যখন হুঁশ ফিরল চারপাশে চোখ চারিয়ে প্রিয়ব্রত তো অবাক। মাঝারি সাইজের ঘরখানা সবদিক থেকেই অনাড়ম্বর। কিন্তু অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন আর পারিপাটি করে সাজানো। ঘরের একদিক ঘেঁষে একটি কাঠের তক্তপোশের ওপর পাতলা বিছানা পাতা। ঐ বিছানায় শুয়েছিল প্রিয়ব্রত। ঘরের অন্যপ্রান্তে একটা কাঠের টেবিলে কিছু বইপত্তর, এ্যালার্ম ঘড়ি..., ঘড়িতে তখন প্রায় দশটা বাজে। টেবিলের পেছনের দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে একখানা বড়সড় আয়না। টেবিলের উলটো দিকের দেওয়ালে একখানা সস্তা কাঠের আলনা। তাতে খানকয়েক শাড়ি, একখানা গামছা, খান কয় শায়া-ব্লাউজ পাট করে গোছানো। আলনার পাশেই দেওয়ালে ঝোলানো এক রূপবান মানুষের ছবি। অবাক হতে তখনও খানিক বাকি ছিল প্রিয়ব্রতর...কিন্তু আচমকা দেওয়ালের আয়নায় একখানা প্রতিবিম্ব দেখে সে চমকে উঠে-বসতে গিয়েই মাথা ঘুরে শুয়ে পড়ল।

ততক্ষণে পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে দীপমালা। তার দু'চোখের তারায় মমতা আর দুর্ভাবনা মিলে মিশে একাকার।

'দীপমালা, তুমি।' ফের উঠে-বসতে চায় প্রিয়ব্রত।

দীপমালা ওকে পরম মমতায় শুইয়ে দেয়।

ম্লান হেসে বলে, 'অতখানি অবাক হবার কি আছে প্রিয়দা? তুমি কি ভেবেছিলে দীপমালা মরে গিয়েছে? এমনভাবে তাকাচ্ছ আমার দিকে, যেন ভূত দেখছ।'

'তুমি এতদিন কোথায় ছিলে দীপমালা? আমি তোমাকে—তোমাকে— ।' বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে প্রিয়ব্রত।

'মরিনি যে তাতো বুঝতেই পারছ।' দীপমালা ঠোঁট টিপে হাসতে থাকে, 'কোথাও ছিলাম নিশ্চয়ই।' একখানা সুতির চাদরে প্রিয়ব্রতকে ঢেকে দেবার ফাঁকে বলে দীপমালা, 'সব বলব। তুমি এখন চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি তোমার জন্য গরম দুধ আনছি।'

পায়ে পায়ে বেরিয়ে যায় দীপমালা। প্রিয়ব্রত পেছন থেকে দেখতে থাকে ওর চলে যাওয়া। একখানা গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরেছে দীপমালা। গায়ে দুধ-সাদা ঘটিহাতা ব্লাউজ। একরাশ কালো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। সবেমাত্র স্নান সেরেছে দীপমালা। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে। চুলের ডগা থেকে তখনও টপটপিয়ে জল ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। শরীর জুড়ে এক ধরনের সুবাস। প্রসাধনের সুবাস নয়, এ অন্য গন্ধ। দীপমালা চলে যাওয়ার পরও ঘরের বাতাসে ভাসতে থাকে সেটা। প্রিয়ব্রত দু'চোখ বুঁজে পরম আয়েসে সেই সুঘ্রাণ নিতে থাকে বুক ভরে। এবং মনে মনে ওকে স্বীকার করতেই হয়, দীপমালা আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে।

দীপমালা।

প্রিয়ব্রত জানে, ওর জীবনে দীপমালা চিরদিনই এক লুকোচুরি খেলা। চোখের সামনে এই আছে তো এই নেই। যখন প্রিয়ব্রত ওকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখন সে লুকিয়ে থেকেছে

কোন অচেনা অন্তবালে, আবার যখন ওর স্মৃতিব ওপর দীর্ঘদিন ধুলো জমতে জমতে ঝাপসা, ঠিক সেই মুহূর্তে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সে সামনে এসে হাজির। এই ছোট জীবনে ওকে কতবার যে হারাল প্রিয়ব্রত, কতবার যে খুঁজে পেল, তার বুঝি কোনও ইয়ত্তা নেই।

সেদিন সারা দুপুর, বিকেল, প্রিয়ব্রতর পাশটিতে বসে দীপমালা ওকে শুনিয়েছে তার পৌনঃপুনিক অন্তর্ধানের বৃত্তান্ত। ইতিমধ্যেই বার দুই জেল থেকে ঘুবে এসেছে সে। তবে দু'বারই স্বল্প সময়ের জন্য। পার্টি তাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে রেখে নানাবিধ কাজকর্ম করাচ্ছে। প্রকাশ্য মিটিং-মিছিলে সে যায় না। একটা সেলাইয়ের স্কুল খুলেছে পোকাবাঁধের পাড়ে। জনা দশেক মেয়ে শেখে। স্কুলটা লোক দেখানো। অন্তরালে পার্টির গোপন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সে। তার মধ্যে একটি হল, পার্টির লুকিয়ে বেড়ানো কমরেডদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের সঙ্গে পার্টি-নেতৃত্বের যোগাযোগ রক্ষা করা।

'এই যেমন তোমাকে শেলটার দিলাম।' দীপমালা দু'চোখে তরঙ্গ তুলে বলে। তার চোখের মধ্যে লুকোনো হাসিই বলে দিচ্ছিল, এটা নিছক রসিকতা। অন্তত প্রিয়ব্রতর তেমনটাই মনে হল। তাকে আশ্রয় দেওয়াটা আর যাই হোক ষোলআনা পার্টি-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না দীপমালার।

রাত একটু গভীর হলেই অন্ধকারে গা লুকিয়ে হাজির হয়েছিল পরীক্ষিত বাউরি। সঙ্গে ছিল ডাঃ গৌরদাস দত্ত। সারা বিকেল দীপমালার সঙ্গে গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে কেবল একটা কথাই বারবার ভেবেছে প্রিয়ব্রত। দীপমালা যে বিষ্টুপুরে রয়েছে একথা তো সে এতদিন জানতেই পারে নি। অথচ পরীক্ষিত বাউরি তো জানত সে কথা। সে কেন ঘুণাক্ষরেও প্রিয়ব্রতকে বলে নি। *কেন? কেন? কেন?*

কিন্তু তার চেয়েও বড় রহস্য অপেক্ষা করছিল প্রিয়ব্রতর জন্য। আরও দিন তিনেক বাদে অনাবৃত হল তা, যখন সন্ধ্যের আঁধারে মাথায় একরাশ ঘোমটা টেনে লাবণ্য এলেন দীপমালার বাসায়।

অনেক ঝুঁকি নিয়ে লাবণ্য প্রিয়ব্রতকে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়েছিলেন কুম্বা শিকারিদের মতো বিশ্বস্তজনের সাহায্যে। কিন্তু মায়ের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। বিষ্ণুপুরে কার বাড়িতে প্রিয়ব্রতকে তোলা হয়েছে, কুম্বা শিকারিরা তা বলতে পারে নি। হাজার বিশ্বস্ত মানুষ হলেও দীপমালার ডেরা কুম্বাদের চেনায় নি পরীক্ষিত বাউরি। পরীক্ষিতই এক সময় গিয়ে অতি গোপনে লাবণ্যকে নিয়ে এনেছিল প্রিয়ব্রতর কাছে। ফলে, ঘরে ঢুকে দীপমালাকে দেখেই বিস্ময়ে থ'হয়ে গেলেন লাবণ্য। দীপমালাও এতদিন বাদে লাবণ্যকে দেখে কী যে করে, কোথায় যে বসাবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু লাবণ্যর সেদিকে হুঁশ ছিল না। তিনি স্থির পলকে তাকিয়েছিলেন দেওয়ালে টাঙানো রূপবান মানুষটির ছবির দিকে। এবং খুব আস্তে আস্তে তাঁর দু'চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল অজান্তে।

সেই রাতেই প্রিয়ব্রত জানল ঐ রূপবান মানুষটির পরিচয়। ইনিই যে লাবণ্যর সেই ছেলেবেলার মাস্টারমশাই সেটা জানার পর প্রিয়ব্রতর বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। দীপমালা এতদিন প্রিয়ব্রতকে কিছুই বলে নি। কিন্তু প্রথমবার চুয়ামসিনার সিংহগড়ে গিয়েই সে সব কিছু খুলে বলেছিল লাবণ্য ও সরযুকে।

স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন দীপমালার বাবা। সিংহগড় থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি বাঁকুড়ার বিশ্বেশ্বর মুখার্জির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ আশ্রয়ে থাকতে থাকতেই বিশ্বেশ্বরের বড় মেয়ে অতসীকে বিয়ে করেছিলেন অরিজিৎ। পরবর্তীকালে ইংরেজের পুলিশ তাঁকে ধরে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিল। সেখান থেকে আর কোন দিনই ফেরেন নি তিনি। দীপমালা তাই খুব ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে চলে এসেছিল বাঁকুড়ায় মামার বাড়িতে। জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও অরিজিতের এমন ছন্নছাড়া আচরণে ওঁর বাড়ির সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল ওঁর ওপর। ইংরাজ সরকারের কাছে তাদের মাথা নাকি হেঁট হয়ে গিয়েছিল। আন্দামানে চলে যাওয়ার পর অরিজিতের স্ত্রী-কন্যা তাদের বিদ্বেষের শিকার হতে থাকে দিনের পর দিন। বাধ্য হয়ে দীপমালার মা দীপমালাকে নিয়ে চলে আসেন বাপের বাড়িতে।

নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যেস ছিল অরিজিতের। দীপমালার মনে পড়ে না বাবার মুখখানি। শুধু ছবি দেখে আর তাঁর লেখা ডায়েরিগুলি পড়ে বাবার সম্পর্কে একখানা পূর্ণাঙ্গ ধারণা তৈরি করে নিয়েছে সে নিজের মতো করে। ওদের কাঁথির বাড়িতে অরিজিতের নিজস্ব ঘরখানি বন্ধ থাকত বারো মাস। দীপমালাই একদিন ঐ বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে প্রায় জেদ করে ঘরখানা খোলায়। বাবার বইপত্তর, কলম, খাতা এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে খুঁজে পায় ঐ ডায়েরিগুলো। অরিজিত যেদিন শেষবারের মতো ঘর ছাড়ে তার আগের দিন অবধি লেখা ছিল ঐ ডায়েরির পাতায়। ঐ ডায়েরি পড়েই দীপমালা জেনেছে সবকিছু। ডায়েরির একটা বড়সড় অংশ জুড়ে রয়েছে চুয়ামসিনার সিংহগড়। সেখানে তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন চারমাস বাইশদিন। সেই সময়টুকুর অনেক কথা অনুপুঙ্খ সহকারে লিখে গিয়েছেন অরিজিৎ, যার বারো আনা জুড়ে রয়েছেন লাবণ্য। অরিজিৎ যেদিন সিংহগড় ছেড়ে চলে যান, সেদিন নাকি তেতলার ছাদে দাঁড়িয়ে লাবণ্য কেঁদেছিলেন। খুব। নিশ্চিতভাবেই অরিজিৎ লিখে গিয়েছেন তা।

অরিজিতের ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় বুক ভাসাচ্ছিলেন লাবণ্য। প্রিয়ব্রতর দৃষ্টি এড়ায় নি সেটা। সে রোদনের জাতই ছিল আলাদা। কোনও মহার্ঘ পরশপাথরের মতো বস্তুকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা ছিল সেই রোদনে।

৫৪. লাবণ্যর প্রিয় খেলা

খুব ছেলেবেলায়, তখন ভাল করে জ্ঞানই হয়নি, লাবণ্যর প্রতি বিকেলের একটি প্রিয় খেলা ছিল। খেলার উপকরণ ছিল একটি সোনার সুতোহার আর কুম্বা শিকারি। মঙ্গল শিকারি, যাকে রাজদ্রোহের অপরাধে চরম শাস্তি দিয়েছিলেন সুদর্শনের বাবা দ্বারিকাপ্রসাদ সিংহবাবু, তারই ছেলে কুম্বা শিকারি। মঙ্গল শিকারির শোচনীয় মৃত্যুর পর দ্বারিকাপ্রসাদ কুম্বাকে এনে রেখেছিলেন সিংহগড়ে। কুম্বার বয়েস তখন চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়। সিংহগড়ের রাখালবাহিনীর কনিষ্ঠতম সদস্য ছিল সে। কুম্বাকে সিংহগড়ে বন্দী করবার সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। এক, বিদ্রোহীর পুত্রকে দাসে পরিণত করবার তৃপ্তি উপভোগ করা, এবং দুই, প্রকৃতির বুকে, খোলা হাওয়ায়, কাঁকুরে ডাঙা-ডিহি, শাল-মহুয়া, টুশু-ভাদুর মধ্যে স্বাধীনভাবে বড় হতে

হতে যদি কালক্রমে আর এক মঙ্গল শিকারি হয়ে ওঠে কুম্বা। বাপকা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া...।

তো, কুম্বা শিকারি যখন আটকা পড়ল সিংহগড়ে, লাবণ্যর বয়েস তখন ছয় কি সাত। ঐ বয়েসেই সেই বৈকালিক খেলাটি লাবণ্যর ভারি প্রিয় ছিল। কাচারির সামনে সদর দীঘির সিঁড়ি-বাঁধানো ঘাট, দু'পাশে শান-বাঁধানো লম্বা বেঞ্চি। ঘাটের দু'ধারে দু'টি ভরভরন্ত স্বর্ণচাঁপার গাছ। পাকার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অনেকখানি জলের তলায়। বিকেলে, পড়ন্ত বেলায়, যখন কমলা রঙের রোদ্দুরে ভরে যেত দীঘির ঘাট, ঘাটসংলগ্ন জলের রঙ হত ঘোর কমলা বর্ণ, তখনই কুম্বা শিকারি গরু চরিয়ে ফিরে এসে জলে নামত স্নান করতে। শান বাঁধানো ঘাটে স্নান করবার অনুমতি ছিল না মুনিষ-মাইন্দারদের। তাদের জন্য ছিল দীঘির উল্টোদিকে অন্য ঘাট, মাকড়া পাথরের একখানি চাঙড়, তার ওপরেই বসে গা ঘসা, কাপড় কাচা, পা রগড়ানো...। কুম্বা শিকারী যখন সিনান করত, পশ্চিমের ঘাটে, তখনই লাবণ্য এসে দাঁড়াত পূবের সিঁড়ি বাঁধানো ঘাটের একেবারে ওপরের ধাপে। ইঙ্গিতে ডেকে নিত কুম্বাকে। তারপরেই শুরু হত খেলা।

লাবণ্য গলায় সর্বদাই পরে থাকত একটি সোনার সুতোহার। কুম্বা শিকারি জল কেটে কেটে পুবের ঘাটে এলেই লাবণ্য গলার হারখানি খুলে ছুঁড়ে দিত জলে। কুম্বাকে জলে ডুবে ডুবে খুঁজে পেতে হত হারখানি। ফেরৎ দেওয়া মাত্তর আবার তা ছুঁড়ে দিত লাবণ্য। কুম্বা আবার ডুব দিত জলে। শান বাঁধানো সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে চলে গিয়েছিল জলের অনেক গভীরে। সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাড়িয়ে ছ-সাত বছরের লাবণ্য যত জোরেই ছুঁড়ুক না কেন, হারখানা ডুবে থাকা সিঁড়ির কোন না কোনও ধাপেই পড়ত। কাজেই প্রতিবারেই হারখানা তিন-চার ডুবেই খুঁজে পেয়ে যেত কুম্বা শিকারি। আর, বারবাব খুঁজে পেত বলে, লাবণ্যরও ওটাকে বারবার হারিয়ে ফেলবার প্রবণতা যেত বেড়ে। খেলাটা, কাজেই, জমে উঠত। খিলখিলিয়ে হেসে উঠে লাবণ্য বারবার হারখানি ছুঁড়ে দিত, সারা বিকেল জুড়ে চলত খেলাটা। রোদ্দুরের হলুদ রঙ ক্রমশ ঘোর কমলা বর্ণ হত, আস্তে আস্তে সে রঙ মুছেও যেত জলের শরীর থেকে, কিন্তু লাবণ্যর খেলা আর শেষ হতে চাইতো না কিছুতেই। মাঝের থেকে, দিনভর অভুক্ত, অবসন্ন কুম্বা শিকারির, শেষ বেলায় নাগাড়ে জলে ডুবে ডুবে, দু'চোখ শু'ড়ি পেঁয়াজের মতো লাল হয়ে যেত।

একদিন হারখানা আর কিছুতেই খুঁজে পেলনা কুম্বা শিকারি। বেত খেয়ে খেয়ে তার পিঠে কালসিটে পড়েছিল অজস্র। কিন্তু হারখানি আর পাওয়া যায় নি কিছুতেই।

হারাবার আর খুঁজে পাওয়ার খেলা, লাবণ্যর শৈশবের সেই প্রিয় খেলা শেষ অবধি হারাবার এবং খুজে না পাওয়ার খেলায় পরিণত হয়েছিল। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক সেই অকরুণ খেলাখানি তাকে খেলে বেড়াতে হয়েছে সারাজীবন। অরিজিৎ এসেছে, হারিয়ে গিয়েছে। অনেক দিন বাদে সময়ের বুকে ডুব-সাঁতার দিতে দিতে দীপমালার মধ্যে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন অরিজিতকে। দীপমালাও হয়ত বা হারিয়ে যাবে।

প্রিয়ব্রতও যেন, লাবণ্যর জীবনে, ঐ হারাবার এবং ফিরে না পাওয়ার খেলার অংশ বিশেষ। আজীবনকাল।

৫৫. গোরাবাড়িতে জলজ গর্জন

সিংহগড়ের দোতলায় জমে উঠেছে জলসা। একতলার এক্কেবারে কোণের ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিল প্রিয়ব্রত।

দরবারি কানাড়ায় লম্বা তান তুলেছে পান্নালাল। ধীর লয়ে আলাপ জুড়েছে। ঘনঘন তেহাই পিটছে নওলকিশোর। তবলায় নয়, নওল কিশোরের তালিম পাওয়া আঙুলের চাঁটি সরাসরি প্রিয়ব্রতর ব্রহ্মতালুতে ঘা দিচ্ছিল।

এক সময় বিছানায় উঠে বসেছিল প্রিয়ব্রত।

অগ্নি নিথর হয়ে বসেছিল ঘরের বাইরে। বারান্দার মোটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল তার শরীর। যেন ঘন অন্ধকারের মধ্যে ততোধিক কৃষ্ণকায় পিণ্ড একটি। ঘরের মধ্যে বিষ্টুপুরী চৌকোনো লণ্ঠনখানি জ্বলছিল। জানলা গলে এক চিলতে আলো লুটিয়ে পড়েছিল বারান্দায়। সহসা অগ্নি দেখতে পেয়েছিল, বারান্দায় শুয়ে থাকা আলোটুকু ভাঙচুর হচ্ছে নিঃশব্দে। আলোর ভাঙচুর দেখে অগ্নি বুঝতে পারে, প্রিয়ব্রত আর স্থির নেই বিছানায়। ঘরের মধ্যে নড়াচড়া শুরু করেছে। বারান্দায় আলোর ভাঙচুর সেটাই জানান দিচ্ছে। অগ্নি উঠে দাঁড়ায়। ধীরপায়ে ঘরে ঢোকে। দরজার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়।

প্রিয়ব্রত বসেছিল বিছানার ওপর। বলে, 'কিছু বলতে চাউ, অগ্নি মা?'

অগ্নি কি বলবে, ভেবে পায় না। খোকাবাবু কেন উঠে বসল বিছানায়, সেটাই দেখতে এসেছিল সে। বলে, 'জল দিব?'

'নাহ্, তুই যা।'

অগ্নি তবুও দাঁড়িয়ে থাকে।

'কিছু বলবি? অগ্নি?'

অগ্নি সামান্য ইতস্তত করে। এক সময় বলে, 'তুই কি সত্যি সত্যিই যাবি, খোকাবাবু?'

'কোথায়?'

'গোরাবাড়ি? যাবি?'

প্রিয়ব্রতর এতক্ষণে মালুম হয় পুরো ব্যাপারটা। আজ বিকেলে পরীক্ষিত এসেছিল। সারা বিকেল বসে বসে শোনাল গোরাবাড়িতে গড়ে ওঠা জলডুবি আন্দোলনের কথা।

গোরাবাড়িতে ড্যাম হচ্ছে কংসাবতীর ওপর। ড্যামের পেছনে বিশাল জলাধার হচ্ছে। বিশ-পঁচিশটা গ্রাম পড়ে গেছে ঐ জলাধারের মধ্যে। এতগুলো গ্রামের তাবৎ মানুষজন ভূমিহীন, গৃহহীন হতে চলেছে। তাদের কোনও বিকল্প জমি দেওয়া হচ্ছে না, ভিটে দেওয়া হচ্ছে না, বাড়ি তৈরির খরচও না, এর বাবদ কোনও ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা, পেলে কবে পাবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। এদের বারো আনাই আদিবাসী ক্ষেত মজুর। এদের কথা ভাববার কেউ নেই, এদের কান্না শোনার কেউ নেই। আজ যাও বা শোনা যাচ্ছে, দু'দিন বাদের যখন দিগন্ত ছোঁয়া জলাধারে থই থই করবে টলটলে জল, যখন ড্যামের স্লুইশ গেট ধরে প্রবল গর্জনে ছুটতে থাকবে শেচের জল, সেই জলজ গর্জনে অবশ্যই চাপা পড়ে যাবে হাজার হাজার অসহায় মানুষের সর্বস্ব হারানোর কান্না। এর বিরুদ্ধেই সেই সাতান্ন সাল থেকে সারা গোরাবাড়ি জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে কম্যুনিস্ট পার্টি। না, সেচ প্রকল্পের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন নয়। সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক হাজার সম্পন্ন চাষীর জমিনকে দো-ফসলা

করতে গিয়ে হাজার হাজার ভূমিহীন, ক্ষেতমজুরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। জলডুবি আন্দোলন।

আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে রয়েছেন গুরুসদয় হাঁসদা। ভেদুয়াশোল হাইস্কুলের হেড মাস্টার তিনি। আর রয়েছেন জলেশ্বর হাঁসদা, মতি মাহাতো, নকুল মাহাতো, বিজয় রজক...। খাতড়া, রানীবাঁধ আর পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রতিরোধ। সে প্রতিরোধ আজও চলছে। অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রিয়ব্রত একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন সে লড়াই।

প্রিয়ব্রতর কাছে সেই আন্দোলনের সাম্প্রতিক খবর বয়ে এনেছে পরীক্ষিত বাউরি। নতুন সংগ্রাম কমিটি তৈরি হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন বিজয় রজক, সম্পাদক জলেশ্বর হাঁসদা। পার্টি থেকে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্য আর গুণধর চৌধুরীকে গোরাবাড়িতে পাঠানো হয়েছে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে। তাঁরা তিনটি থানার গ্রামে গ্রামে চরকির মতো ঘুরছেন। এদিকে সরকারী ট্রাক্টর রোজ আসছে জলাধারের জমিকে সমতল করবার জন্য। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভেদ্য পাঁচিল গড়ছে ট্রাকটরের সামনে। পুলিশ কর্ডন করে রুখতে চাইছে ঐ বিপুল জনস্রোত। এলাকার শতশত আদিবাসী মহিলা আগুয়ান হয়ে সেই কর্ডন ভেঙে দিচ্ছে। পুলিশ শয়ে শয়ে মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরছে রোজ...।

বলতে বলতে পরীক্ষিত বাউরি উল্লাসে হাসে, 'কিন্তু অত মানুষকে আটক কইর‍্যে রাইখ্‌বার মতো জেল কুথা পাব্যেক উয়ারা? সরকার ইখন অন্য পথ লিয়েছে?'

'কি পথ?' প্রিয়ব্রত বিস্ফারিত চোখে শুধোয়।

'উয়ারা ইখন শয়ে শয়ে মানুষকে ধরে. গাড়িতে চাপিয়ে লিয়ে গিয়ে, ছেইড়্যে দিচ্ছে দূর-দূরান্তের জঙ্গলে। জঙ্গলে জঙ্গলে পথ চিনে ফিরে আসতে উয়াদ্যার সাতদিন দশদিন লেইগ্যে যাচ্ছে। ক্ষিদায় তিষ্টায় কাহিল হইয়েঁ যাচ্ছে মানুষ। কিন্তু চেৎ মানছে নাই কিছোতেই। ফিরে এইস্যে ফের দাঁড়াচ্ছে সরকারী ট্রাকটরের সুমুখে। আগে ক্ষতিপূরণ দাও, দুশরা জমিন দাও, তবেই হব্যেক বাঁধ।'

বলতে বলতে এক সময় পরীক্ষিত বাউরি লক্ষ করে প্রিয়ব্রতর দু'চোখ পাথরের মতো স্থির। চোখেব পাতনিও অনড়। মুখমণ্ডলে কোনও জাগতিক অভিব্যক্তি নেই। শরীরখানি সিংহগড়ে থাকলেও ওর মনখানা উধাও হয়ে গেছে অন্য কোনও জগতে।

পরীক্ষিতের ডাকাডাকিতে আচমকা সাড় ফিরে পায় প্রিয়ব্রত। বিড়বিড়িয়ে বলে ওঠে, 'আমি গোরাবাড়ি যাব। উখেনে মানুষ লড়ছে। আমি যাব...।'

শরীরের এই অবস্থায় ঘরের বাইরে যাওয়াটা প্রিয়ব্রতর পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। তাও প্রিয়ব্রত পরীক্ষিতকে জানিয়ে দিয়েছে, অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যও সে গোরাবাড়ি যাবেই। হাজার হাজার মানুষের রক্তক্ষয়ী লড়াইখানা দেখে আসবে স্বচক্ষে।

অগ্নির প্রশ্নে অস্বস্তিবোধ করে প্রিযব্রত। কী চোখেই যে মেয়েটা দেখেছে প্রিয়ব্রতকে। পরীক্ষিত ওকে বহাল করেছিল শুধু দিনের বেলাটার জন্যই। সন্ধে পহরে তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল শালকাঁকির ঝোপড়িতে। বাড়িতে তার কচি বাচ্চা। ফরসা, ফুটফুটে ছেলেটি, বাউরি

জাতে এমনভরো গায়ের রঙ বিরল, সবাই আদর করে নাম দিয়েছে গোরা, গোরাচাঁদ। খুবই ছটফটে আর চোখেমুখে বাচ্চা। কেবল ওর টানেই দিনান্তে অগ্নির ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত। বুড়ি ঠাকুমার কাছে দিন-রাত অষ্টপ্রহর থাকতে কোন্ বাচ্চারই বা ভাল লাগে। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই অগ্নি জিদ ধরল, রাতেও থাকবে খোকাবাবুর কাছে। এখন অগ্নি প্রিয়ব্রতর দিনরাতের সেবিকা, শুশ্রূষাকারিণী, আবার অভিভাবিকাও। সময় মতো ওষুধপত্র না খেলে, সামান্যতম বেনিয়ম করলে সে ইদানিং প্রিয়ব্রতকে রীতিমত ধমক দেয়।

মেয়েটা প্রিয়ব্রতকে তিলতিল এক অপার স্নেহে বেঁধে ফেলেছে। প্রিয়ব্রত বুকের মধ্যে উপলব্ধি করে সেটা। এখন, কথায় কথায় যখন ওর দু'চোখ ছলোছলো হয়ে ওঠে, প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে স্পষ্টতই মোচড় লাগে।

প্রশ্নটা শুধিয়েই থিরপলকে দাঁড়িয়ে রয়েছে অগ্নি। জবাবের জন্য নিঃশব্দে ক্ষণ গুনছে। চোখদুটি ক্রমশ ভিজে আসছে অজান্তে। প্রিয়ব্রত বুঝতে পারে, 'যাব' বললেই এক্ষুনি চোখের পাতা আরও ভিজে আসবে মেয়ের। কেঁদে কেঁদে হয়ত বা বুক ভাসাবে সারারাত।

প্রিয়ব্রত ওকে কাছে ডেকে নেয়। নিঃশব্দে হাত রাখে ওর পিঠে। আর তখনই টের পায়, অগ্নির শরীরখানা ফুলে ফুলে উঠছে বাক্যহারা কান্নার দমকে।

৫৬. পান্নালালের পোষা বেহালা

ইদানিং চোখে ঘুম আসে না প্রিয়ব্রতর। দিনভর সে জেগেই কাটিয়ে দেয়। প্রখর গ্রীষ্মে রোদ্দুরের তাত সামান্য বাড়তে না বাড়তেই রাঢ়ের লাল কল্লাচ মাটি আর মাকড়া পাথরের ডাঙাগুলি নিঃশব্দে পুড়তে থাকে। দিনভর ঝলা বাতাস বয়। রুক্ষু তামাটে হয়ে আসে আকাশ। আগুনের হল্কা নাচে দিগন্তেব গায়ে। মধ্যদুপুরে ন্যাড়া ক্ষেতের মধ্যিখানে ধুলুণ্ডি ভূত, শুকনো পাতা আর লালচে ধুলোসহ কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠে যায়। চুয়ামসিনায় বাবা কপিলেশ্বরের থানে গাজনের ভক্তরা প্রহরে প্রহরে বোল তোলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। এইভাবে প্রখর গ্রীষ্মের ছোবল খেতে খেতে রাঢ়ভূমে সকাল, দুপুর গড়ায়, বিকেল আসে। বিকেলে, দিনের আলো নিভে এলে, হরিণমুড়ির দিক থেকে শীতল হাওয়া বইতে শুরু করলে, দু'চোখ অবসাদে বুঁজে আসতে চায়। কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। তার বদলে, সন্ধেটি নামলে যেমন করে পিনপিন আওয়াজ তুলে হাজারে হাজারে মশা বেরিয়ে আসে ঘরের আপাত নিরীহ কোণগুলো থেকে, ঠিক তেমনি করে প্রিয়ব্রতর মগজের হরেক খোপ থেকে বেরিয়ে আসে রাশি রাশি ভাবনা, অন্তহীন। ওরা শয়ে শয়ে, ঠিক উপোসী মশার মতো উড়তে থাকে পিনপিন আওয়াজ তুলে। তখন, প্রিয়ব্রতর মগজের মধ্যে এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ওরা উড়তে থাকে, হুল ফোটাতে থাকে, প্রিয়ব্রতকে একতিল স্বস্তি দেয় না কিছুতেই। একটু বাদেই অগ্নি ঘরে ঢোকে। লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয়, ধুনো দেয় সারাঘরে, মশারি খাটিয়ে দেয়...। প্রিয়ব্রত চোখ মুদে শুয়ে থাকে, কখনও নিষ্পলক দেখতে থাকে অগ্নিকে। বাইরের মশাদের থেকে কোনও গতিকে রেহাই পেলেও মগজের মশাদের থেকে কিছুতেই রেহাই পায় না প্রিয়ব্রত। তখন দ্বারিকাপ্রসাদ, সুদর্শন, শঙ্করপ্রসাদ, লাবণ্য, দীপমালা, কুন্তী... সবাই একে একে ভিড় করে। শয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়ায় মঙ্গল শিকারি, নিশান বাউরি, চন্দ্রকান্ত আচার্য,

সরযূবালা...এরা রাতভর প্রিয়ব্রতর সঙ্গী হয়। সারারাত, সিংহগড়ের একতলার ঘরখানাতে জ্বালা-যন্ত্রণায়, শোকে-ভাবনায় প্রিয়ব্রতর বিনিদ্র কেটে যায়। শেষ রাতে হরিণমুড়ির শীতল হাওয়া ওকে একটুখানি ঘুম পাড়ায়। ঠিক ঘুম নয়, সামান্য তন্দ্রামত আসে। কিন্তু সেই তন্দ্রা খানখান হয়ে ভেঙে যায় চিৎকারে। দোতলায় কুন্তী এবং একতলায় পান্নালাল তারস্বরে গলা সাধতে থাকে।

একদিন ভোরবেলায় কনকপ্রভার গলা শুনতে পেল প্রিয়ব্রত।

গলা সাধছে কনকপ্রভা। ভোরের হাওয়ায় মিহি মিহি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার গলার চিকন সুর। প্রিয়ব্রত কান এড়ে শুনতে থাকে।

বিয়ের আগে গান গাইত কনকপ্রভা। বিয়ের পরেও মাঝে মাঝে গাইত। প্রিয়ব্রত অবশ্য বড় একটা শোনে নি। গান শোনার সময় কোথায় তার! তবে যেটুকু শুনেছে, তাতে ওর কোনই সন্দেহ নেই, কনকপ্রভার গলায় সুর আছে। ধীরে ধীরে ওর গলা থেকে গানটা কখন জানি চলে গিয়েছিল। বিকেলের রোদ্দুর যেমন করে গাছ-গাছালির ডালপালার শরীর থেকে একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে, কিংবা প্রখর গ্রীষ্মে একটু একটু করে শুকিয়ে যায় দীঘির জল, কিংবা শরীরের থেকে আতরের গন্ধ যেমন একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসে..., ঠিক তেমনি করে কবে যেন একটু একটু করে কনকপ্রভা হারিয়ে ফেলেছিল তার সুর। কিছুদিন ধরে কনকপ্রভাকে যন্ত্রের সঙ্গে গলা মেলাতে শুনেছিল প্রিয়ব্রত। এখন আর কলের গানের সঙ্গে গলা মেলায় না সে। গ্রামোফোনখানি আর বড় একটা বাজে না তার দোতলার ঘরে। তার বদলে কনকপ্রভাই বাজে। ইদানিং আবার সে গলায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেই সুর। ফের গলা সাধতে শুরু করেছে কনকপ্রভা। সম্ভবত পান্নালালের অনুপ্রেরণায় এটা সম্ভব হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে প্রিয়ব্রতর সহসা খেয়াল হয়, কনকপ্রভার প্রতি তার মনের গভীরে তেমন একটা বিদ্বেষ নেই। বরং মাঝে মাঝে তার জন্য প্রিয়ব্রতর মন করুণায় ভিজে আসে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে সিংহগড়ে ঢুকেছিল কনকপ্রভা। বয়সের তুলনায় একটু বেশি ছেলেমানুষ এবং আদুরে ছিল সে। লাবণ্য তাকে নিজের মেয়ের মতই আদর দিয়েছিলেন। কনকপ্রভার বয়স কত হল? প্রিয়ব্রত মনে মনে হিসেব করে। একত্রিশে পা দিয়েছে কনকপ্রভা। পুরো একটি দশক তার কেটে গেল সিংহগড়ে। এই এক দশকে সে অনেক বদলেছে নিজেকে। অনেক উদাসীন, আর উচ্ছৃঙ্খল। প্রিয়ব্রতর প্রতি তার নিরাসক্তি বাড়তে বাড়তে আজ বুঝি একেবারেই দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। নইলে, স্বামীর এই গুরুতর রোগ-ব্যাধি দেখে যে কোনও স্ত্রী দিনরাত স্বামীর শয্যার কাছে আলুথালু বুক ভাসিয়ে কাঁদত। কিন্তু তার বদলে, কনকপ্রভা এখনো দু'বেলা পরিপাটি করে সাজে, বাহারি খোঁপা বাঁধে, সারা গায়ে গয়না পরে, সন্ধেবেলা মেয়েকে গান শেখানোর ছলে জলসার আসর বসায়, আবার নিজেও গলা সাধতে শুরু করেছে। কনকপ্রভা নিজে এসব নিয়ে কী ভাবে সেটা জানা নেই প্রিয়ব্রতর। কিন্তু, এমন ঘটনায় স্বামী হিসেবে প্রিয়ব্রতর মন বিষাক্ত অসূয়ায় ভরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারি আশ্চর্যের বিষয়, অসূয়া তো নয়ই, বরং যতবারই প্রিয়ব্রত কনকপ্রভার এবংবিধ কার্যকলাপ

নিয়ে ভাবতে বসেছে, ততবারই শেষ অবধি কনকপ্রভার জন্য তার সারা মন মমতায় ভরে গিয়েছে। কেমন জানি প্রিয়ব্রতর মনে হয়, কনকপ্রভার এই বিলাস, অপচয় আর উচ্ছৃঙ্খলতার পেছনে রয়েছে তার কিছু নিজস্ব ব্যথা, জ্বালা, অপ্রাপ্তি। স্বামী হিসেবে প্রিয়ব্রতকে সে প্রায় একেবারেই পায় নি। সেই বঞ্চনা তাকে প্রতিমুহূর্তে জ্বালিয়ে মারতে পারে। তার ওপরও রয়েছে নিরাপত্তার অভাব জনিত আশঙ্কা। সারা সিংহগড়ে পুরুষ সদস্য বলতে প্রিয়ব্রতই। গত এক দশক ধরে সে এক অনির্দিষ্ট আকাশের উড়ন্ত পাখি। লাবণ্য বেঁচে থাকতে তাও বা ছিল, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে সারা সিংহগড়ের নিজস্ব বাসিন্দা বলতে তো কনকপ্রভা এবং দশ বছরের কুন্তী। প্রিয়ব্রতর মনে হয়, নিরাপত্তার অভাব জনিত শঙ্কা ঢাকতেই কনকপ্রভা সিংহগড়ে লোকজনের হাট-বাজার বসিয়ে রাখতে চায়। আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনার শব্দ দিয়ে ঢেকে ফেলতে চায় একাকীত্বের নিস্তব্ধতাকে। এবং বর্তমানে পান্নালালই তার সে কাজের একমাত্র সহায়।

প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করে কনকপ্রভার সঙ্গে পান্নালালের সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হচ্ছে। পান্নালাল এখন অনেক সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে সিংহগড়ে। আগের মতো সেই আড়ষ্ট ভাবখানা একেবারেই উধাও। বরং তার ইদানিংকালের হাঁটায়-চলায়, আচার আচরণে একটা পরিণত ভাব এসেছে। মেরুদণ্ড অনেক সোজা হয়েছে তার। মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখায় এসেছে আত্মবিশ্বাস। দোতলার সিঁড়িতে ওঠার সময় আগে এক ধরনের ভীরু মেনিমুখো সংকোচ ছিল, বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে সন্তর্পণে উঠে যেত সে। এখন সেই পদক্ষেপে এসেছে অকুতোভয় ছন্দ, বেশ আত্মপ্রত্যয়ী পদক্ষেপে মসমসিয়ে হেঁটে যায় সে। কথা বলে উচ্চগ্রামে। কারণে-অকারণে হো-হো করে হেসে ওঠে। আর কনকপ্রভাও ইদানিং পান্নালালের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করে। পান্নালালের সংস্পর্শে তার মুখমণ্ডলের কঠিন রেখাগুলি অনেক ঢিলেঢালা নরম হয়ে ওঠে। অকারণে প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠে পান্নালালের সঙ্গে কথা বলবার সময়। যে কাজ অন্যের হাজার অনুরোধেও করেনা, পান্নালাল একটিবার বললেই নিঃশব্দে মেনে নেয়। সব মিলিয়ে পান্নালালের সঙ্গে কনকপ্রভার সম্পর্ক ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রায় সারাদিন শয্যাবন্দী থাকলেও এসব সূক্ষ্ম পরিবর্তন প্রিয়ব্রতর নজর এড়ায় না।

কিন্তু তবুও, কনকপ্রভা দুশ্চরিত্রা এমনটা প্রিয়ব্রত ভাবে না এখনও। অবৈধ প্রেম না হলেও পান্নালালের কাছে ওর এক ধরনের আত্মসমর্পণ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে প্রিয়ব্রতর দৃষ্টিতে। সে কি ওই মানুষটার কাছে, নাকি তার কণ্ঠের কাছে, ভেবে পায় না প্রিয়ব্রত। সে যাই হোক না কেন, পান্নালাল যে কনকপ্রভার গলায় পুনরায় সুর ফিরিয়ে এনেছে, এর জন্য পান্নালালের কাছে এক ধরনের ঋণ তৈরি হয় প্রিয়ব্রতর মনে। শুকিয়ে যাওয়া গলায় সুর আনা তো ফলের গাছে মুকুল আনার তুল্য, কিংবা মজে যাওয়া নদীতে ঝিরঝিরে স্রোত, রুপোলি মাছের পেটে ডিম।

দীপমালার কথা মনে পড়ে।

ইদানিং দীপমালা বড় বেশি ঘন ঘন হাজির হচ্ছে প্রিয়ব্রতর ভাবনায়। পরিণত

দীপমালার চেয়ে কিশোরী দীপমালা যেন ঢের বেশি উজ্জ্বল প্রিয়ব্রতর স্মৃতিতে। সেই দামাল দস্যিপানা মেয়েটি, ধারাল চোখমুখ, অশান্ত। দীপমালাই সিংহগড়ের বধূ হয়ে আসতে পারে, এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লাবণ্য। দীপমালাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন তিনি। কিন্তু প্রিয়ব্রত বুঝতে পেরেছিল, দীপমালাকে পুত্রবধূ হিসেবে সিংহগড়ে তুলতে তাঁর মনে মনে প্রবল আপত্তি ছিল। লাবণ্য আজ বেঁচে নেই। থাকলে প্রিয়ব্রত সুস্পষ্টভাবে শুধিয়ে নিত, এ ব্যাপারে তাঁর মনোগত ইচ্ছাটা ঠিক কী ছিল। সেদিন পারে নি, আজ এমন প্রশ্ন করা যেত লাবণ্যকে। তবে চলে যাওয়ার আগে লাবণ্য প্রিয়ব্রতর কাছে তিনটি অনুরোধ রেখেছিলেন। খোকা এবার থিতু হ। আর, বৌমার মুখে যেন হাসি ফোটে। তৃতীয় অনুরোধটি প্রিয়ব্রতকে বাস্তবিকই অবাক করেছিল। প্রিয়ব্রতর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে খুব মৃদু গলায় বলেছিলেন, আর, দীপাকে দেখিস। দীপমালাকে লাবণ্য ঐ নামেই ডাকতেন। প্রাণের অধিক ভালবাসা সত্ত্বেও দীপমালাকে পুত্রবধূ হিসেবে কেন বেছে নিলেন না লাবণ্য, আজ আর তা পুরোপুরি জেনে নেবার অবকাশ নেই। তবে প্রিয়ব্রতর ধারণা, নিতান্ত মরিয়া হয়ে মা তার জন্য একটি সোনার শেকলই পছন্দ করেছিলেন। দীপমালা, আর যাই হোক, সিংহগড়ের অন্তঃপুরে বন্দী হয়ে থাকত না কিছুতেই। সেও যে সেই ছেলেবেলা থেকে প্রিয়ব্রতর মতই এক অদৃশ্য আগুনে পুড়ছে, লাবণ্য তা ভালভাবেই জানতেন। এমন মেয়ে যে তাঁর একমাত্র সন্তানকে অন্তঃপুরে বাঁধবার বদলে আর কঠিন বহির্মুখী লড়াইয়ের ময়দানে পৌঁছে দেবে, এমন আশঙ্কা বোধ করি তাঁর মনে জাঁকিয়ে বসেছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু প্রিয়ব্রত কেন নিঃশব্দে মেনে নিল মায়ের সিদ্ধান্ত? সে কি সেই কৈশোর থেকে দীপমালাকে মনে মনে কামনা করে নি? সারা কৈশোর, যৌবন জুড়ে দীপমালা কি তার বুকের মধ্যে পলিমাটির মত একটু একটু করে জমাট বাঁধেনি? প্রিয়ব্রত ইদানীং একান্তে ভাবে। দীপমালার বদলে কনকপ্রভাকে গ্রহণ করবার যাবতীয় কারণ এখনও অবধি পরিষ্কার নয় তার নিজের কাছেও। এমনটা হতে প্যারে, লাবণ্যকে দুঃখ দিতে চায় নি সে। এমনও হতে পারে, রোগাক্রান্ত শরীরখানাকে সে আর বয়ে বেড়াতে পারছিল না, তিলতিল ক্লান্তি জমছিল তার শবীরে, মনে, নিজের অজান্তে বিশ্রাম চাইছিল সে। এই বিচরণশীল জীবন থেকে কায়মনোবাক্যে ছুটি চাইছিল। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, দীপমালার আপাত মমতা মাখানো দৃষ্টিতে কতখানি ভালবাসা ছিল প্রিয়ব্রতর জন্য, সেটাই তো বোঝা গেল না কোন দিনও। সেই কৈশোর থেকে কতই না ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাল দু'জনে, কিন্তু একদিনের তরেও কি প্রিয়ব্রত ইঙ্গিতেও জানাতে পেরেছে তার কামনার কথা। দীপমালা কি তাকে একদিনের জন্যও দিয়েছে তেমন এক চিলতে সুযোগ। লাবণ্য যদি জোর করতেন, খোকা, তুই দীপাকেই বিয়ে কর্। প্রিয়ব্রত কি দীপমালার সামনে তেমন প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে পারত? সম্ভবত পারত না। দীপমালা তার চারপাশে চিরকাল গড়ে রেখেছিল এমনই এক অদৃশ্য দেয়াল, যাকে অতিক্রম করা প্রিয়ব্রতর পক্ষে বাস্তবিকই দুঃসাধ্য ছিল। অন্তত এতাবৎকাল এমনটাই ভেবে এসেছে প্রিয়ব্রত। শুধু সাম্প্রতিককালে তার কেমন জানি মনে হচ্ছে, দীপমালাও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ছিল না তো? প্রিয়ব্রত কবে সেই কাঙ্খিত বাক্যটি উচ্চারণ করবে, তার জন্য দীপমালাও অধীর প্রতীক্ষায় ছিল না তো। সেই বাক্যটি

এমন উদাসীন নিস্পৃহতায় অনুচ্চারিত থেকে যাওয়ার অভিমান বুকে জমিয়ে নিঃশব্দে দূরে সরে গেল না তো দীপমালা! বিয়ের সময় দীপমালাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। লাবণ্য অবশ্য বারংবার বলেছিলেন। কিন্তু প্রিয়ব্রতই তেমন উদ্যোগ নেয় নি। উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। পাশে নববধূকে নিয়ে দীপমালার মুখোমুখি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু দীপমালার কাছে সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল যথা সময়ে। আর এমনই রহস্যময়তা ছিল তার চরিত্রে, তে-ভাগার লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গে যতবারই দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, খুব স্বাভাবিক গলায় সে খোঁজ খবর নিয়েছে কনকপ্রভার, কুন্তীর। এমন কি বাঁধগাবার লড়াইয়ের পর যখন জেলে গেল সে, দীপমালা তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রতিবারই শুনিয়ে এসেছে কনকপ্রভা এবং কুন্তীর কুশল সংবাদ। জেল থেকে ফিরে এসে প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে শুনেছে, দীপমালা এর মধ্যেই বার দু'তিন রাতের অন্ধকারে এসে দেখে গেছে কনকদের। এবং ভারি বিস্ময়ের কথা, কনকপ্রভা দীপমালাকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে। এমন কি, কুন্তীও দীপা পিসি বলতে অজ্ঞান।

দীপমালা বিষ্ণুপুরেই থাকে। সেলাই ইস্কুলের অন্তরালে সে পার্টির কাজে নিয়োজিত। বিয়ে-থা করে নি। সম্ভবত তেমন কোনও ইচ্ছেই নেই ওর। সিংহগড়ে শেষ এসেছিল মাস দুই আগে। কনকপ্রভা ওকে কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে..., কুন্তী তার কোল থেকে নামতে চায় নি এক মুহূর্তের জন্য। প্রিয়ব্রত ভাবে, শুধু দীপমালাকেই নয়, কনকপ্রভাকেও সে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারল না এতদিনেও। মাঝে মাঝে এমনটাও মনে হয় প্রিয়ব্রতর, কনকপ্রভাতে সে যে মন বসাতে পারল না আজীবনকাল, তার অনেক কারণের একটি কি দীপমালা নয়! গন্ধেশ্বরীর পাড়ে পড়ন্ত বিকেল জুড়ে বসে থাকা সেই কিশোরী কি তাকে আজীবনকাল এক দণ্ডের জন্য ছেড়ে থেকেছে! কনকপ্রভা কি প্রিয়ব্রতর মধ্যে দীপমালার এই পুঞ্জীভূত উপস্থিতি টের পায়! ঐ মেয়েটির জন্যই যে সে প্রিয়ব্রতকে একটি মুহূর্তের জন্যও তেমন করে পেল না, এমন অনুভূতির কাঁটা গলায় বিঁধিয়েই কি সে সুরের সাধনা চালায় ইদানীং!

দোতলায় একমনে গলা সাধছে কনকপ্রভা। প্রিয়ব্রত উৎকর্ণ হয়। সাত স্বরের আরোহ-অবরোহ, কনকপ্রভার গলায় অবিরাম খেলছে পোষা পাখির মতো। পাখিটাকে বড় দুঃখী মনে হয় প্রিয়ব্রতর। বড় বিদীর্ণ।

৫৭. শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

শেষ রাতে সামান্য ঘুম এসেছিল। তারই মধ্যে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছে প্রিয়ব্রত।

একজোড়া নদীর সংগমস্থলে আচমকা শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। চারপাশে কুনকি হাতির পালের মতো ছোট-বড় পাহাড়-ডুংরি, মধ্যিখানে গামলার মতো বিশাল দহ, শুকনো খটখটে। সেই দহর ঠিক মধ্যিখানে এক উঁচু টিকরার ওপর বসেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ।

প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে উঠেছিল,' বাবা, আপনি?'

শঙ্করপ্রসাদ মৃদু মৃদু হাসছিলেন। ইঙ্গিতে ডাকলেন কাছে। প্রিয়ব্রত গিয়ে বসল বাবার কাছটিতে। শঙ্করপ্রসাদ খুব আস্তে হাত রাখলেন প্রিয়ব্রতর পিঠে। আর ঠিক সেই সময়

প্রিয়ব্রত এক ধরনের মৃদু সৌরভ পেল হাওয়ায়। হালকা আতরের মতো সেই সৌরভ ভেসে বেড়াতে লাগল প্রিয়ব্রতর চারপাশে। শঙ্করপ্রসাদ খুব নিঃশব্দে হাত বুলোচ্ছিলেন প্রিয়ব্রতর পিঠে। বেশ আরামদায়ক উষ্ণ লাগছিল শঙ্করপ্রসাদের হাতখানি। শঙ্করপ্রসাদের হাতে এতখানি উষ্ণতা এলো কী করে। প্রিয়ব্রত আবাক মানে।

বাবাকে চিরকালই একতাল ঠাণ্ডা পাথরের মতোই মনে হত প্রিয়ব্রতর। যেভাবে সারাজীবন মুখ বুঁজে, সুদর্শন সিংহবাবুর জুলুম সয়ে গেছেন তিনি, কোনও রক্তমাংসের মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। অজ্ঞাতবাসের মাঝে মাঝে যে সময়টুকু সিংহগড়ে ফিরে আসত প্রিয়ব্রত, থাকত দু'চারদিন, ক্বচিৎ শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হত তার। প্রিয়ব্রত প্রায়শই লুকিয়ে থাকত অন্দরমহলেরও অন্দরে। শঙ্করপ্রসাদই তাকে খুঁজে বের করতেন। সে সময়টাতে তিনি স্পষ্টতই কাছে পেতে চাইতেন তাঁর একমাত্র আত্মজকে। শঙ্করপ্রসাদ তখন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার। খুব নিঃশব্দে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন তিনি। তারই মধ্যে যেটুকু সময় সিংহগড়ে থাকতেন, প্রিয়ব্রতর সান্নিধ্যের জন্য সর্বদাই উশখুশ করতেন। তখন পিতা-পুত্রে মিলন ঘটলে সময় কেটে যেত অবলা। কোনও কথাই বলতেন না শঙ্করপ্রসাদ। কেবল নিঃশব্দে হাত বোলাতেন প্রিয়ব্রতর পিঠে। কিন্তু সে হাতে কোনও উষ্ণতা টের পেত না প্রিয়ব্রত। বরফের মতো ঠাণ্ডা ছিল সে স্পর্শ। কিন্তু গেল রাতে স্বপ্নের মধ্যে শঙ্করপ্রসাদের হাতখানাকে আশ্চর্য রকমের উষ্ণ মনে হয়েছে প্রিয়ব্রতর।

হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় কথাও বলেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ। এবং কি আশ্চর্য, স্বপ্নভঙ্গের পরও সেসব কথার বারো আনাই হারায় নি।

শঙ্করপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তোর সবকিছু মনে আছে, খোকা? কিছুই হারাস নি তো?'

'কি কথা? কিসের কথা বলছেন?'

'তোর জীবনের সবকিছুর কথা? তোর ছেলেবেলার কথা?'

প্রিয়ব্রত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

'তুই যে রাতে জন্মালি, সেই দিনটার কথা তোর মনে পড়ে?'

প্রিয়ব্রত পুনরায় মাথা দোলায়।

'সে ছিল এক ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির রাত। হরিণমুড়ির দিক থেকে সোঁ-সোঁ ছুটে আসছে উদোম হাওয়া। আকাশে কড়াক্কড় বাজ চমকাচ্ছে। ঘন ঘন দাঁত কিড়িমিড়ি খাচ্ছে আকাশ। ঠিক তেমনি সময়ে বন্দিনী দেবকীর অষ্টম পুত্রের মতো ভূমিষ্ঠ হলি তুই। মনে আছে?'

প্রিয়ব্রত অতি ধীরে মাথা নাড়ায়।

'তারপর, যেদিন হাতে খড়ি হল তোর? মনে আছে? বাঁকুড়া থেকে রামখড়ি নিয়ে এল কৃষ্ণদাস, পদমদীঘির পাড় থেকে তালগাছের পাতা কেটে আনা হল, মুড়িভাজা খোলার পেছন থেকে ভুসা চাঁছা হল, চাল চুয়ানা হল... মনে আছে? তোর জন্য পেতলের চৌকো দোয়াত এল, কঞ্চির কলম কাটা হল, তুই স্নান করে দেশি তাঁতের ছোট্ট ধুতি কোচা দিয়ে পরলি, প্রথমে রাধামাধবের মন্দিরে প্রণাম সেরে তারপর একে একে প্রণাম করলি তোর দাদুকে, দিদাকে, আমাকে, তোর মাকে, তোর গুরুমশাই নলিনী পণ্ডিতকে, সেই সময় আমি খুব

সন্তর্পণে তোকে নৈঋত কোণের দিকে মুখ করে দাঁড় করাই। ফিসফিস করে বলি, খোকা ঐদিকে হাত জোড় করে দু'বার নম কর, ওদিকে তোমার আর এক দাদু-ঠাকুমা থাকেন। মনে আছে?

'তারপর তুই রাধামাধবের মন্দিরের দাওয়ায় বসে পাঁচ আঙুলে রামখড়ি বাগিয়ে ধরলি। তোর সামনে চৌকো করে মিহি বালি বিছিয়ে দেওয়া হল। নলিনী পণ্ডিত তোর হাতের মুঠোকে মুঠো করে ধরলেন, তারপর বালিতে রামখড়ির আঁচড় কেটে বড় বড় হরফে ক, খ, গ, ঘ, ঙ লেখালেন। পরপর তিনবার। তাতেই তুই ঘেমে নেয়ে উঠেছিলি। তৃতীয়বারের মসকো করা শেষ হতেই লাবণ্য তোকে তুলে নিল কোলে।'

প্রিয়ব্রত মাথা দোলাতে থাকে। মৃদু গলায় বলে, 'মনে আছে। হাতে খড়ি শেষ না হতেই সিংহগড়ের পুরোনো ঝি একাদশী পিসী বলে উঠেছিল, এর বেলায় আছে। টোলো পণ্ডিতের ছা-তো, আঁক কষতে বড় সুখ।'

এরপর শঙ্করপ্রসাদ একে একে শোনাতে লাগলেন প্রিয়ব্রতর জীবনের সন্ধিক্ষণগুলির কথা, যা তিনি জানতেন। প্রিয়ব্রতর উপনয়ন, ছাত্রবৃত্তি পাশ, বাঁকুড়ায় পড়তে যাওয়া, ম্যাট্রিকুলেশনে পাশ দেওয়া, এবং তারও পরে, কনকপ্রভার সঙ্গে তার বিয়ে, কুন্তীর জন্ম, লাবণ্যর মৃত্যু অবধি কিছুই বাদ রাখলেন না তিনি। প্রিয়ব্রত ভারি অবাক হয়ে শুধিয়েছিল, 'এত কথাও জানেন আপনি? এত কথাও মনে আছে আপনার? এমন কি আপনার চলে যাওয়ার পরও যা-যা ঘটেছিল, তাও?' শঙ্করপ্রসাদ নিঃশব্দে হাসতে থাকেন। বলেন, 'এবার তুই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কর্।'

'আমি? আমি আবার কি জিজ্ঞাসা করব আপনাকে? আমার কি জিজ্ঞাস্য রয়েছে?'

'কিছুই নেই? কিন্তু আমি যে সেইজন্যে এলাম তোর কাছে।'

প্রিয়ব্রত চুপ করে বসে থাকে। ভাবে। পাহাড়েব দিক থেকে বয়ে আসা হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ে উড়ে এলোমেলো হয়। এক সময় প্রিয়ব্রত খুব ম্রিয়মান গলায় বলে, 'এতখানি সইলেন কেন বাবা? কী করে সইলেন?'

প্রিয়ব্রতর প্রশ্ন শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন শঙ্করপ্রসাদ. কঠিন হয়ে উঠল মুখের রেখাগুলি। বললেন, 'জুলুম করবেন কি, তিনি তো আজীবনকাল ছিলেন তাঁর নিজস্ব যাতনায় অস্থির। তাছাড়া—।' সামনের পাহাড়ের গায়ে নিবদ্ধ হল দৃষ্টি। অনেকক্ষণ বাদে খুব নীচু অথচ স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'তাছাড়া, সইনি তো, কিছুই সইনি আমি। তুই ভাল করে ভেবে দেখিস, সিংহগড়ের প্রতিটি জুলুমের যথাযোগ্য জবাব আমি দিয়েছি।'

প্রিয়ব্রত তাকিয়েছিল শঙ্করপ্রসাদের দিকে। পাহাড়ের গায়ে দৃষ্টিখানি বিঁধিয়ে রেখে শঙ্করপ্রসাদ খুব দার্শনিক গলায় উচ্চারণ করেছিলেন, 'সকলের প্রতিবাদের ভাষা এক হয় না খোকা।'

ঠিক এমনই কথা বলেছিল দীপমালা। শঙ্করপ্রসাদ সম্পর্কে বলেছিল। যখন প্রথমবার সিংহগড়ে এল, শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলল, প্রিয়ব্রতকে একান্তে বলেছিল ঠিক এই কথাটিই, কে বলে তোমার বাবা দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন, তোমরা ওঁকে চিনতে পারো নি। ইনি হিম-

শৈলর মত। আসলে সকলের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধরন তো সমান নয়। তোমার বাবার পদ্ধতিটি স্বতন্ত্র। ইদানিং প্রিয়ব্রতর মনে হয়, বাইরে থেকে অসহায় শীতল স্বভাবের মনে হলেও শঙ্করপ্রসাদ ছিলেন ভেতরে ভেতরে খুবই দৃঢ়চেতা মানুষ। মনে হয়, কখনই কারুর কাছে সঠিক অর্থে হারেন নি তিনি, এমন কি নিজের কাছেও নয়।

শঙ্করপ্রসাদ জীবনে একবারও যান নি তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটেয়। কিন্তু প্রিয়ব্রত গিয়েছিল। সে ছিল এক অভিজ্ঞতা!

খুবই বিপদে পড়ে প্রিয়ব্রতকে যেতে হয়েছিল। খাতড়ার থেকে বাঁকুড়ার দিকে রওনা দিয়েছিল প্রিয়ব্রত আর পরীক্ষিত বাউরি। গভীর রাতে পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছিল রাস্তায়। তখন বাঁধগাবার লড়াই হয়ে গিয়েছে। হাজার খানেক বাছাবাছা কর্মীকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জা আর মানিক দত্তরা আশ্রয় নিয়েছে দুর্ভেদ্য সেনাপতির জঙ্গলে। প্রিয়ব্রত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পেছনে পরীক্ষিত রয়েছে ছায়ার মতো। পুলিশের তাণ্ডব শতগুণ বেড়ে গেছে। দিনে-রাতে গাঁয়ে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে ওরা। রাতের বেলায় টহল দিচ্ছে রাস্তায়। তেমনই এক টহলগাড়ির সামনে আচমকা পড়ে গেল প্রিয়ব্রত। বিপদের মুহূর্তে পরীক্ষিত বাউরির উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা নেই। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে এক হেঁচকায় প্রিয়ব্রতকে টেনে নিয়ে নেমে গেল নয়ানজুলিতে। দৌড় মারল মাঠ বরাবর। গাড়ি থামিয়ে পুলিশ বাহিনীও তাড়া করল পিছু পিছু।

শীতের রাত। ধান উঠে গিয়েছে মাঠ থেকে। খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে বহুদূর অবধি নজর চলে যায়। ছুটতে ছুটতেই পরীক্ষিত বাউরি সম্ভবত ভেবেছিল, এভাবে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দৌড়ুনো মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোনও মুহূর্তে ওরা পুলিশী রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসতে পারে। বাঁ'দিকে বিশাল কালো ছোপ। গাঁ। সহসা পরীক্ষিত বাউরি দৌড়ের গতি ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাঁ'দিকে।

গাঁয়ের মধ্যে তখনও সবাই ঘুমোয় নি। কোন কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল সমবেত টুসু গানের সুর।

নদীর ঘাটের ধারে
তিনটি সোনার পাখ চরে
আমার টুসু রগড় করে, দাওগো সোনার পাখ ধরে।

প্রিয়ব্রতর সহসা মনে পড়ে যায়, পৌষ মাস শেষ হতে চলল। এই সময়টা বাঁকুড়ার গাঁয়ে গাঁয়ে টুসু গানের আসর। রাত্তির জেগে গরীব মানুষের গান। এ গাঁয়ে কোনওদিন আসে নি প্রিয়ব্রত। চেনেও না গ্রামটার নাম। তবে, পরীক্ষিত বাউরির কাছে এ তল্লাটের প্রত্যেকটি গ্রাম হাতের তালুর মতো চেনা।

গাঁয়ের মাঝামাঝি এসে একখানা বাড়ির দরজায় অস্থির করাঘাত শুরু করেছিল পরীক্ষিত। ভেতর থেকে প্রশ্ন ভেসে এসেছিল, কে— ? পরীক্ষিত নিজের নাম বলার পর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গিয়েছিল।

'পরীক্ষিত, তুমি?' আশঙ্কায় কালো হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন একজন বয়স্ক মানুষ, 'আর, সঙ্গে ইটি কে?'

'উয়াকে তুমরা চিনবে নাই।' পরীক্ষিত রহস্যময় হেসেছিল, 'উয়ার ঘর চুয়ামসিনা।'

'চুয়ামসিনা।' চমকে উঠেছিলেন বয়স্ক মানুষটি। 'কার ঘর?'

'তুমরা অদের চিনবে নাই।'

ঘরের প্রায় সবগুলি প্রাণীই জেগে উঠেছিল। চুয়ামসিনা নামখানি কলকল করে বাজছিল সবাইয়ের মুখে। কুঠরিঘর থেকে এক থুত্থুরে বুড়ো চিল্লাতে লেগেছিলেন সমানে, আরে, চুয়ামসিনার কথা কি বলছু তুয়ারা? চুয়ামসিনা থিক্যে কে আঁইছে? কি খবর এনেছে?

আবেগে রোমাঞ্চে ওরা শতমুখে নিজেদের পরিচয় জানিয়েছিল প্রিয়ব্রতকে। চুয়ামসিনার সিংহগড়ে আমাদের ছেলে থাকে, ছেলের বউ, লাতি...।

এক সময় পরীক্ষিতই জানান দিয়েছিল প্রিয়ব্রতর পরিচয়। এই লাও, তুমাদ্যার লাতি।

সঙ্গে সঙ্গে যেন উৎসব লেগে গিয়েছিল সারা বাড়ি জুড়ে। ওরা যে প্রিয়ব্রতকে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে, ভেবে পাচ্ছিল না। শঙ্করপ্রসাদের বাবা, প্রিয়ব্রতর দাদু, তখন একেবারে অথর্ব, শয্যাশায়ী। প্রিয়ব্রতকে যখন নিয়ে যাওয়া হল ওঁর ঘরে, থুত্থুরে বুড়ো মানুষটির তখন নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। প্রিয়ব্রতকে দেখতে দেখতে তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে দুটি জলের ধারা গড়িয়ে পড়েছিল নিঃশব্দে।

পরীক্ষিত বাউরিই জানিয়েছিল, ওদের সঙ্কটের বৃত্তান্ত। প্রিয়ব্রত কয়েকদিন লুকিয়েছিল তার পিতৃপুরুষের ভিটেয়।

যে ক'দিন মশিয়াড়ায় ছিল প্রিয়ব্রত, দাদু-ঠাকুমা একবারের তরেও তাকে কাছছাড়া করেন নি। কত কথাই যে হল, কত স্মৃতি রোমন্থন, অতীত দিনের। তখনই প্রিয়ব্রত জেনেছিল, গোমস্তা কৃষ্ণদাস মাঝে মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে এলেও, শঙ্করপ্রসাদ কোনদিনও এখানে আসেন নি। এমন কি যখন তিনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার, সারা জেলা চষে বেড়াচ্ছেন, তখনও বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি একবারের জন্যও আসেন নি তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটেয়। শঙ্করপ্রসাদের বাবা কতই না অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'একটিবার এলে সিংহবুড়া জানতেও পারবেক নাই।' শঙ্করপ্রসাদ জবাব দিয়েছিলেন, 'যা কারুর সাক্ষাতে করতে পারব নাই, তা অসাক্ষাতেও করি না আমি।'

এই ছিলেন শঙ্করপ্রসাদ। এই ছিল তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার স্বরূপ। বাইরে থেকে তাঁকে শীতল, অপদার্থ লাগত বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। কেবল, তাঁর কাঠিন্যের ধরনটাই ছিল স্বতন্ত্র।

৫৮. সুদর্শনের জটিল যন্ত্রণা।

স্বপ্নটা নিয়ে আজ দিনভর অনেক ভেবেছে প্রিয়ব্রত। শঙ্করপ্রসাদের শেষ কথাগুলো মনের মধ্যে বারে বারে বাজিয়েছে।

'সকলের প্রতিবাদের ভাষা এক নয় খোকা।'

শঙ্করপ্রসাদের কথাগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে প্রিয়ব্রত। ওঁর সারা জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে অনুপুঙ্খ সহকারে সাজিয়েছে একের পর এক। এক সময় তার মনে হয়েছে শঙ্করপ্রসাদের প্রতিবাদের ভাষাগুলিকে বুঝি একটু একটু করে ধরতে পারছে সে।

যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী চেয়েছিলেন সুদর্শন সিংহবাবু। শঙ্করপ্রসাদকে সেই কারণেই এক অত্যাচারী জমিদার হিসেবে গড়ে তুলতে কোনও পথই বাদ দেন নি তিনি। তাঁকে লম্পট আর নারীলোলুপ করে তুলতে চেয়েছেন, পারেন নি। কথায় কথায় অপমান করেছেন, তাঁর গালে যখন তখন বসিয়ে দিয়েছেন হাতের পাঁচটি আঙুলের দাগ, কিন্তু কোনও ফল হয়নি তাতে। তাঁকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার বানিয়ে এলাকার রাজদণ্ডখানি নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন সুদর্শন, কিন্তু শঙ্করপ্রসাদ ক্ষমতার স্বাদ তিলমাত্র গ্রহণ করেননি। তিনি হাজার জনহিতকর কাজকর্ম নিয়েই মেতে রইলেন। দ্বিতীয়বারের ভোটে শঙ্করপ্রসাদকে দাঁড়াতে বারণ করেছিলেন সুদর্শন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও প্রায় অলৌকিকভাবে জিতে ফিরেছিলেন শঙ্করপ্রসাদ। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর ঔরসে জন্ম নিল এমনই এক সন্তান, যে কিনা সিংহগড়ের রীতিনীতিকে একদণ্ডের তরেও মান্য করেনি। স্বদেশী দলে নাম লিখিয়েছে, কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছে, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে জেল খেটেছে, বাউরি-বাগদিদের সঙ্গে একপাতে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে। তাকে নিয়ে সুদর্শনের তিলমাত্র ভরসাও অবশিষ্ট ছিল না। সব-মিলিয়ে সুদর্শন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ভালমতোই জেনে গেছেন যে তাঁর সাধের সিংহগড় একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছে।

সুদর্শন সিংহবাবুর মুখখানা অনেকদিন বাদে অচমকা মনে পড়ে প্রিয়ব্রতর। প্রবল প্রতাপশালী মানুষ ছিলেন তিনি। এলাকার ত্রাস। তাঁর দাপটে ছোটভাই প্রতাপলালও টুঁ শব্দটি করতে পারতেন না। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কেন জানি মনে হত, ঐ প্রতাপান্বিত, স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক মানুষটিরও অনেক পরাজয়ের জায়গা ছিল। জীবনের বহুক্ষেত্রে তিনিও ছিলেন নিতান্তই অসহায়, সর্ব অর্থে এক শোষিত মানুষ।

পরীক্ষিত বাউরি বলে, 'বাপেরও বাপ রয়েছে আইজ্ঞা। ব্যাঙ খায় পোকা-মাকড়, আবার ব্যাঙকে খায় সাপ। ব্যাঙের যেমন সাপ, সাপের তেমন ময়ূর। আর ময়ূরের রয়েছে যশোদা বাগ্দী, যে কিনা জঙ্গলের ময়ূর মেরে পালক বিক্রির ব্যবসা করে।'

—আর, যশোদা বাগ্দীর?

—যশোদার রয়েছে উয়্যার মহাজন, বিষ্টুপুরের কানাহিয়ালাল। সে সম্বৎসর ময়ূর পুচ্ছ কিনবার লেইগ্যে দাদন দিয়ে রাখে যশোদাকে। ব্যাঙ ভাবে, পোকামাকড়গুলান থাকু, সাপগুলান মইরে যাক। ময়ূর ভাবে, সাপগুলান থাকু, যশোদা বাগদির দল নিকাশ হয়্যে যাক। সারা দুনিয়া জুড়ে থাকে থাকে এ এক পাক্কা বেবস্তা।

পরীক্ষিত বাউরি বলে, 'পাহাড়ের মত হাতি আইজ্ঞা, উয়ার মাথার উপর বইস্যে অঙ্কুশ খুঁচাবার মাহুত থাকে। আবার মাহুতের মাথার উপর থাকে হাতির মালিক।'

সুদর্শন নামক পাহাড়ী হাতিটিরও মাহুত ছিল, অঙ্কুশ ছিল। ছিল, অঙ্কুশের ঘায়ে রক্তক্ষরণ। একফালা নয়, বহু ফালা ছিল সে অঙ্কুশ। এই মুহূর্তে সেটাই মনে হচ্ছে প্রিয়ব্রতর।

সেই কৈশোরে প্রিয়ব্রত সরলজ্ঞানে মাঝে মাঝেই শুধিয়ে বসত, 'দাদু, মানুষকে কষ্ট দিয়ে কী সুখ পাও?'

সামান্য চমক খেতেন সুদর্শন। সামলে নিয়ে জবাব দিতেন, 'লচেৎ উয়ারা যে খাজনা দিবেক নাই। মানবেক নাই।'

—খাজনা না দিলে কি হয়?

উত্তরপুরুষের মগজ ধোলাইয়ের উদ্যম নিয়ে সুদর্শন যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করতেন, 'উয়ারা খাজনা না দিলে আমি সরকারের ঘরে খাজনা দিতে পারব নাই।'

—খাজনা জমা না দিলে কি হয়?

—জমিদারী থাইক্‌বেক নাই।

—না থাকলে কি হয়?

জমিদারী না থাকলে কীকী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে তা অনেকখানি সময় নিয়ে নাতিকে বোঝাতেন সুদর্শন। বলতেন, 'জমিদারী না থাইক্‌লে এই প্রাসাদ থাকবেক নাই। ভাল ভাল খাবার-খাইদ্য, আরাম-ব্যসন, প্রতাপ-প্রতিপত্তি সব যাবেক।'

এখন প্রিয়ব্রতর মনে হয়, মানুষটি যাবতীয় জাগতিক সুখের কাছে ভারি অসহায় ছিলেন। তাঁর মনে নিরন্তর কাজ করে যেত পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে থাকা সুখ-বৈভবগুলিকে হারাবার নিদারুণ ভয়, আশঙ্কা, আতঙ্ক। সেই ভয়ে সর্বদাই প্রায় খরগোশের মতো শঙ্কিত ছিলেন তিনি। ভয়-শঙ্কা মানুষকে হিংস্র করে তোলে। সেই কারণেই কায়মনোবাক্যে একজন উত্তরপুরুষ চাইতেন, যে কিনা এই প্রবহমান ভোগের শকটটিকে সাফল্যের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারবে। এইখানেই হার মেনে গিয়েছেন মানুষটি। কাদম্বরী নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়পক্ষ সরযুবালার গর্ভেও কন্যা সন্তান হওয়াটা বোধ করি তাঁর অন্যতম প্রধান পরাজয়। সুদর্শন নিশপিশ করেছেন, অস্থির হয়েছেন, একজন যোগ্য উত্তরাধিকারীর জন্য ছটফট করেছেন আজীবনকাল। পাশের মহলে প্রতাপলালের ছেলে হরবল্লভ যতই বেড়ে উঠেছে, সুদর্শনের ভয়, শঙ্কা, অস্থিরতা ততই বেড়েছে। সেই অস্থিরতা তাঁকে বহু সময়েই হিংস্র, নিষ্ঠুর করে তুলেছে। নিজের রক্তজাত উত্তরাধিকারী না পেয়ে তিনি লাবণ্যের স্বামী হিসেবে একজন যথাযোগ্য পুরুষ খুঁজেছেন। নিজের বংশগত চরিত্রের বিরুদ্ধে গিয়েও অরিজিতকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন সিংহগড়ে। কিন্তু অরিজিতকে চিনতে তাঁর ভুল হয়েছিল। অবশেষে ঘর-জামাই হিসেবে সিংহগড়ে ঢুকলো শঙ্করপ্রসাদ। কিন্তু তিনিও সুদর্শনের মাপকাঠিতে শিবের বদলে বাঁদর একটি। কিন্তু সেটা যখন বুঝতে পারলেন সুদর্শন, তখন আর চারা নেই, হাতের তীর বেরিয়ে গেছে। ছুটিলে হাতের শর/ না বুঝে আপন-পর। তাও লাবণ্যর গর্ভে প্রিয়ব্রত এলে পর, সুদর্শন পুনরায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু প্রিয়ব্রতও তাঁকে সব দিক থেকে হতাশ করেছে। চোখের সুমুখে নিজ বংশের নিশ্চিত ধ্বংস এবং জ্ঞাতি-শত্রুর উত্থান দেখতে দেখতে অসহায় মানুষটি নিঃশব্দে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সুদর্শনের আরও এক কিসিমের অসহায়তা ছিল বলে প্রিয়ব্রতর মনে হয়। তিনি নিজেকে একজন কৃষিবর্গের মানুষ বলে মনে করতেন। মুখ ফুটে স্পষ্ট করে কোন দিনও প্রকাশ করেন নি সেটা, কিন্তু অনেক দুর্বল মুহূর্তে টুকরো মন্তব্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকত এক ধরনের অসহায়তার বীজ।

ততদিনে বিষ্ণুপুরে মারোয়াড়ি বেওসায়ীরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। তারা এলাকার যাবতীয় কৃষিজ পণ্য, অরণ্যজ কাঁচামাল, এবং কুটিরশিল্প, তাঁতের কাপড়, রেশমাদি সবকিছু

পাইকারি দরে কিনে নেয়। পরিবর্তে, চিনি, কেরোসিন, তেল-মসলা, দামি কাপড়চোপড়, কাটা পোষাক, পশম ইত্যাদি পাইকারি দরে বেচে। বিষ্টুপুর, বাঁকুড়ায় ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছিল ওরা। কোলকাতা তো প্রায় দখল করেই ফেলেছিল। ওদের হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বিশাল বিশাল হাভেলি। সোনা বাঁধানো দাঁত। মকরমুখো হাসি। ব্রিটিশরা ওদের সমীহ করে। কংগ্রেসী নেতারা ওদের তোয়াজ করে। গান্ধী মহারাজও নাকি ওদের কথায় ওঠেন বসেন। সুদর্শন এসব নিয়ে বড় একটা আলোচনা করেন না কারো সঙ্গে। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটি কথায় তাঁর অসহায় বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ত। সিংহগড় থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান, মুগকলাই, বিরিকলাই যেত বিষ্টুপুরে। জঙ্গলের আমলকি, হত্তুকি, বহেড়া, মউল...। মারোয়াড়িদের আড়তে পাইকারি দরে বেচে দিয়ে নগদ টাকা নিয়ে ফিরে আসত কৃষ্ণদাস। কিংবা ঐ টাকার একাংশ দিয়ে তেল-ঘি, আটা-ময়দা, সুজি, মসলাপাতি, কাপড়-চোপড় কিনে ঐ গাড়িতেই চড়িয়ে নিয়ে আসত।

কোনদিন কৃষ্ণদাস ফিরে এসে বলত, 'ধানের দাম কমে গেছে। মুগকলাই, বিরিকলাইয়ের দাম কমে গেছে।'

সুদর্শন শুধোতেন, 'কেন?'

কৃষ্ণদাস এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারত না।

কোনদিন ফিরে এসে জানাত, 'আটা-ময়দা, তেল-মসলার দাম বেড়ে গেছে।'

সুদর্শন শুধোতেন, 'কেন?'

কৃষ্ণদাস সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারত না।

বিড়বিড়িয়ে সুদর্শন বলতেন, 'অদেরই তো দিন! যখন খুশি দাম কমাচ্ছে, যখন খুশি বাড়াচ্ছে। গাঁয়ের মাইন্‌ষের কথা কে ভাবে।' মনে মনে ফুঁসতেন সুদর্শন। হিসহিসিয়ে বেরোতে চাইত এক অক্ষম, অসহায় ক্রোধ, 'অরাই দেশটাকে গিলে খাবেক।'

মাঝে মাঝে শিশু প্রিয়ব্রতকে তিনি শুধোতেন, 'দাদুভাই, তুমি বড় হয়ে কি হবে?'

—কি হবো?

—তুমি বড় হয়ে মারোয়াড়ি হবে। ইয়াব্বড় ভুঁড়িঅলা মারোয়াড়ি।

এখন প্রিয়ব্রতর মনে হয় সুদর্শনের সেই কথাগুলো নিছক ঠাট্টা ছিল না। শহুরে ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা পোষণ করতেন।

শহর থেকে কংগ্রেসী নেতারা সিংহগড়ে এলে, সুদর্শন সর্বদাই 'গাঁয়ে পড়ে রয়েছি, চাষ করি, ভাত খাই, আর সরকারকে খাজনা দেই, আমাদ্যার আর কতটুকু দাম, আমরা হ'ল্যাম গাঁইয়া লোক।' গোছের অনুযোগ করতেন। ওই সব মুহূর্তে, প্রিয়ব্রতর এখন মনে হয়, সুদর্শন নিজেকে তাবৎ গ্রামীণ কৃষিজীবীর সঙ্গে 'এক পুকুরের মাছ' বলে বিশ্বাস করতেন। একই পুকুরে বন্দী ছোট-মাঝারি-বড়, কুলীন-ব্রাত্য নানান শ্রেণীর মাছ। সকলেই মৎসভুকদের সেবায় নিয়োজিত, নিবেদিত-প্রাণ। সেই মৎসভুকদেরই মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়াতেন তিনি। কখনও তাঁর মনে হত ইংরেজরাই সেই মৎসভুক, কখনও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীরা, কখনও বা শহরাশ্রয়ী এদেশীয় শাসকগোষ্ঠী। মোট কথা, সুদর্শনের মনেও বন্দীত্ববোধ ছিল।

অনেকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, গোরারা এদেশ ছাড়বে। দেশ স্বাধীন হবে।

সুদর্শন শুনে ব্যঙ্গ করতেন, 'বেল পাইক্‌লে কাগের কি? এখনও খাজনা দিঁই, তখনও দিব। কানাহিয়ালাল ধানের দাম কমাবেক, মেনে লিব। তেল-মশলা, কাপড়-চুপোড়ের দাম বাড়াবেক, মেনে লিব।

শোনা যাচ্ছিল, গোরারা চলে গেলেই নাকি জমিদারীপ্রথাও লোপ পাবে। সুরাবর্দী মন্ত্রীসভা ইতিমধ্যেই তে-ভাগার যৌক্তিকতা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে। শোনা যাচ্ছিল, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্যও একটি বিল পাশ হবে শিগ্‌গির।

সুদর্শন বলেন, 'গেলে, যাবেক। আমরা তো সার্কাসের পুতুল বৈ লয়। একজন রেখ্যেছে, আছি। আর একজন হটাই দিবেক, চইলে যাব।'

দাদুর কথাবার্তায় সেই ছেলেবেলাতেই প্রিয়ব্রতর মনে হত, দাদুর মতো প্রতাপশালী মানুষের ওপরেও এমন কেউ রয়েছে, যে কিনা ওঁর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ভাগ্যবিধাতা, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের নির্ধারক। প্রশ্ন করে কোনদিনও সুস্পষ্ট জবাব পায় নি প্রিয়ব্রত। কখনও সুদর্শনের আঙুল তাক হয়েছে ব্রিটিশের দিকে, কখনও বা পুঁজিপতি বেওসায়ীদের প্রতি, কখনও বা শহরবাসী শিক্ষিত এদেশীয় নেতাদের দিকে যারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে কিছু কিছু স্বায়ত্তশাসনের স্বাদ। যাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই এসে গেছে শাসক-শাসক ভাব। গোরারা চলে গেলে যারা হবে পুরোপুরি শাসক এবং সারা দেশের ভাগ্য নিয়ামক। যারা লিখে-পড়ে, বিলেত গিয়ে, সুটবুট পরে এখনই আধা-সাহেব। 'ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক' বলে তাদের যতই ব্যঙ্গ করুন সুদর্শন, প্রিয়ব্রত এখন তার পরিণত ভাবনা দিয়ে বোঝে, ওদের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ মালিক ও ভাগ্যনিয়ন্তাকে।

শহুরে শিক্ষিত মানুষজনদের মধ্যে থাকলে সুদর্শন স্পষ্টতই এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতেন, এ বিষয়ে প্রিয়ব্রতর মনে কোনই সন্দেহ নেই। গ্রামীণ পরিমণ্ডলে তাঁর সেই প্রতাপশালী রূপখানি শহরে গেলে একেবারেই ম্লান হয়ে যেত। শহুরে মানুষদের বেশভূষা, হাঁটন-চলন, কথাবার্তা ও সপ্রতিভতার কাছে একেবারে ম্রিয়মান হয়ে যেতেন তিনি। তাদের সঙ্গে তুলনায় সুদর্শনকে পোশাক-আশাকে, চোখের তারায়, গায়ের চামড়ায় একটু যেন মলিন, ভোঁতা, পিছিয়ে থাকা বলে মনে হত। বিষ্টুপুরের কংগ্রেসী নেতা অন্নদা চক্রবর্তীর বাড়িতে সুদর্শনের সঙ্গে বেশ কয়েকবারই ছেলেবেলায় গিয়েছে প্রিয়ব্রত। সেখানে অনেক গণ্যমান্য মানুষ, অনেক এম-এ , বি-এ পাশ মাস্টার-প্রফেসরদের আনাগোনা ছিল। মারোয়াড়িদের গদ্দিতেও গিয়েছে দু'একবার। তখনই সে লক্ষ করেছে, সুদর্শন ওদের সামনে কেমন গুটিয়ে থাকতেন সারাক্ষণ। রাঢ়ভূমের গ্রামীণ ভাষায় অভ্যস্ত জিহ্বা প্রাণপণে শহুরে শিষ্ট বাংলা বলার চেষ্টা চালিয়ে বারংবার হোঁচট খেত। এমন কি বাঁকুড়ায় ঐ সার্কাস দলের ম্যানেজারের সামনেও তাঁর ছিল ম্রিয়মান, অপ্রস্তুত, খাটো খাটো ভাব। যত আস্ফালন, পরে। গরুর গাড়িতে উঠে যখন পুরোপুরি গ্রাম্যপথ ধরলেন, চারদিকে ঝোপ, জঙ্গল, টিলা-ডুংরি, ক্ষেত-জলা, ডাঙা-ডিহর... এমন সব অনুষঙ্গ যতই বাড়তে লাগল, ততই যেন তিনি নিজেকে ফিরে পেতে লাগলেন একটু একটু করে। তারপর সোনামুখী, কিংবা হেড়েপর্বতের জঙ্গলে ঢুকে, জঙ্গলের আদিম ঘ্রাণ নিতে নিতে এক সময় তিনি হয়ে উঠলেন এক পরিপূর্ণ সাবালক বাঘ। তখন বাঘের ঝাপট নিতে লাগলেন কথায় কথায়, গাড়োয়ান, লগদি, পেয়াদা, কর্মচারীদের ওপর।

আচরণের এই দুস্তর ফারাকটা সেই কিশোর বয়েসেও নজর এড়ায় নি প্রিয়ব্রতর। শঙ্করপ্রসাদের কথাই হয়ত বা ঠিক। সারাটা জীবন সুদর্শন সিংহবাবু নামের মানুষটি তাঁর নিজস্ব যন্ত্রণায় কাবু হয়ে ছিলেন, বাইরের মানুষের নজরে কদাচিৎ পড়ত সেটা।

অনেকদিন বাদে আজ বিকেলে পরীক্ষিত বাউরি এসেছিল। অনেক শুকিয়ে গেছে লোকটা। সারা শরীর জুড়ে অজস্র অনিয়মের ছাপ। কিন্তু মুখের অপাপবিদ্ধ হাসিটি আজও অমলিন।

সারা সকাল, দুপুর, বিকেল ঐ স্বপ্নটা নিয়ে মশগুল ছিল প্রিয়ব্রত। নিজের শরীরের তাবৎ যন্ত্রণার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। পরীক্ষিতকে স্বপ্নটার কথা বলে প্রিয়ব্রত। পরীক্ষিত নিবিষ্ট মনে শোনে।

প্রিয়ব্রত বলে, 'আচমকা এমন স্বপ্ন দেখল্যাম কেন, পরীক্ষিতদা? এর মানে কি?'

পরীক্ষিত বেশ ধন্ধে পড়ে যায়। বলে, 'স্বপনের মাথামুণ্ডু খোঁজা আমার কম্ম লয়। আমি মুরুখ্যু মানুষ। তেবে বাপের কথা খুব ভাইব্‌তে লেগেছ নির্ঘাৎ। শুইনেছি, যার কথা বেশি ভাইব্‌বে, উ স্বপনে দেখা দিব্যেক।'

প্রিয়ব্রত ঘনঘন মাথা নাড়ে। ইদানিং কালে শঙ্করপ্রসাদের কথা বড় একটা ভাবনায় আসে নি। তার চেয়ে ঢের বেশি ভেবেছে লাবণ্যর কথা, কনকপ্রভাব কথা, জলডুবি আন্দোলনের কথা...।

'তেবে আমি লাইর্‌ল্যাম।' পরীক্ষিত বলে, 'তেবে, যে জায়গাটায় বুইস্যে বাপ-ব্যাটায় কথা বইল্‌লে, উ জায়গাটাকে আমি চিনি।'

প্রিয়ব্রত দু'চোখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে পরীক্ষিতের দিকে।

পরীক্ষিত বলে, 'কংসাবতী আর কুমারীর সঙ্গম উট্যা। চারপাশে পাহাড়-ডুংরী... মধ্যিখানে বিশাল গামলার,মতোন দ'। তুমরা বইসেছিলে উই দহের মধ্যিখানে...। কুনোই সন্দ নাই ইয়াতে। কিন্তু—।'

কথাগুলো কেমন রহস্যময় ঠেকে প্রিয়ব্রতর কাছে। বলে. 'তা কি করে হয়? উই বিশাল দহের মধ্যে কোনও গ্রাম ছিল নাই, ফসলের ক্ষেত ছিল নাই, মানুষজন ছিল নাই... শুধু অন্তহীন ন্যাড়া ভুঁই... পাহাড় দিয়ে ঘেরা।'।

পরীক্ষিতের সারা মুখ থমথম করছিল। অনেকক্ষণ নির্বাক বসে থাকে সে। এক সময় গলাটা ভীষণ খাদে নামিয়ে বলে, 'তুমি বোধ লেয় অনেক আগাম দেইখে ফেলছ দহটাকে।'

পরীক্ষিত বাউরি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা আবার ফিরে আসে। এখন স্বপ্নের গায়ে অন্য একটি মাত্রা যোগ হয়েছে। পরীক্ষিত বাউরিই মাত্রাটি যোগ করে গেছে। তার মতে, গোরাবাড়ির নির্মীয়মাণ জলাধারের মধ্যিখানেই শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে প্রিয়ব্রতর। কেন এমন হল? এর অর্থ কি? নাকি এটা পরীক্ষিত বাউরিরই কল্পনাপ্রসুত। স্বপ্নের অনির্দিষ্ট দহকে গোরাবাড়ির জলাধার বানিয়ে সে কি প্রিয়ব্রতকে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেল!

৫৯. অসফল ওড়াউড়ি

রক্ত কি কোনও নির্ধারক? মানুষের শরীরে রক্তের কি কোনও রকমফের হয়? বর্ণভেদ? সাধন বৈরিগী গেয়েছিল, সেই প্রিয়ব্রতর ছেলেবেলায়, একটা গান, বাইরে যতই

ভেদাভেদ কর না কেন, সবাইয়ের শরীরে একই রক্ত বইছে এবং সে রক্তের রঙ লাল। সুদর্শন সিংহবাবু প্রিয়ব্রতর চিবুক নাড়িয়ে দিযে বলেছিলেন, 'তাই কখনো হয় দাদুভাই? সবাইয়ের রক্তের রঙ কখনো এক হয়? কারও রক্ত লাল, কারও বা নীল। নীলরক্ত যাদের শরীরে বয় উয়ারা দুনিয়া শাসন করে।'

—নীলরক্ত! ঐ বয়েসেও প্রিয়ব্রত অবাক মানে। তাই আবার হয় নাকি!

—হয় বৈকি। এই ধর না, এইমাত্তর সনাতনের হাঁটু থেঁতল্যে যে রক্ত বারাল তার রঙ লাল। পাঁঠা বলির সময়ে দেখ্যেছ, উয়াদ্যার রক্তও লাল। কিন্তু তুমার, আমার,—আমাদ্যার সক্কলের রক্ত নীল।

প্রিয়ব্রত অবিশ্বাসী চোখে তাকাতেই সুদর্শন পুনরায় ওর চিবুক ছোঁন। বলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে নাই তো? কি কইর্‌লে বিশ্বাস হব্যেক তুমার? কেইট্যে তো দেখাতে পারি না। বাইরের থেকে দেখ।' বলেই সুদর্শন প্রিয়ব্রতর সুমুখে মেলে ধরেন তাঁর ডান হাতখানা। মুঠো করেন হাত। প্রিয়ব্রত দেখতে পায়, সরু দড়ির মতো শিরাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে দাদুর হাতে। এবং সুদর্শনের টকটকে হলুদ-ফর্সা শরীরে ওগুলোর রঙ খুব সুস্পষ্ট ভাবেই নীল।

সুদর্শন বলেন, 'এই দ্যাখ, ভিতরে নীল রক্ত বইছে।'

প্রিয়ব্রত বিস্মিত নয়নে দেখতে থাকে দাদুর নীল রক্তবাহী শিরাগুলি। মুহূর্তের মধ্যে সে কল্পনা করে নিতে পারে, দাদুর সারা অঙ্গে কাচের সরু সরু নলের মতো শত শত স্বচ্ছ শিরা-ধমনী, আর ওদের মধ্য দিয়ে অবিরাম বইছে, সত্যি সত্যিই, গাঢ় নীল রঙের বক্ত।

সুদর্শন বলেন, 'তোমার শরীরেও নীল রক্ত বইছে, দাদুভাই। ডান হাতখানা জোরসে মুঠা কর।'

কচি শরীরে অত সহজে শিরাগুলো ফোটে না। তাও প্রিয়ব্রত টের পায়, তার শরীর জুড়ে নীল-শিরার অস্তিত্ব। অথচ সনাতনকে সে বার বার হাত মুঠো করিয়ে দেখেছে তার শিরা-ধমনীর রঙ ঘোর কালো।

সুদর্শন বলেন, 'ঘন লাল রঙের রক্ত বইছে সনাতনের শরীরে। এতটাই ঘন যে মনে হয় ঘন খয়েরি, অথবা বলা যায় কালোই। সাধে কি আর শালাদ্যার 'কালাপিঠে' বলে!'

কৈশোরে বিস্ময়বোধটা থাকে ঢের বেশি। সবকিছুকে বিশ্বাস করে নেবার প্রবণতাও। প্রিয়ব্রত ঐ বয়েসে যা শুনত, বড়দের থেকে, তাই বিশ্বাস করে বসত। সুদর্শনের সেদিনের কথাগুলোও তার মনের মধ্যে এমনিতরো এক বিশ্বাসের জন্ম দিল যে, মানুষ-ভেদে রক্তের রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং নীল রক্তের অধিকারী মানুষরাই দুনিয়া শাসন করে থাকে। পরবর্তীকালে, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পড়াকালীন সে দেখেছে, রাজা-জমিদার বাড়ির ছেলেগুলোর গায়ের রঙ ফরসা এবং তাদের শিরাগুলি নীলরঙের। বাঁকুড়ার মিশনারি কলেজের গোরা প্রিন্সিপ্যাল সি-এফ-বল, ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল বেলি সাহেবের শরীরের শিরা-উপশিরা কী ভীষণ রকমের নীল। সেই কারণেই বুঝি গোরা সাহেবরা সারা পৃথিবী শাসন করছে। ওদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। এমনটাই ভেবেছিল প্রিয়ব্রত তার কৈশোরের দিনগুলিতে।

এখন প্রিয়ব্রতর মনে হয়, সুদর্শন পুরোপুরি ঠিক ছিলেন না, পুরোপুরি ভুলও নয়। রক্তের অবশ্যই বর্ণভেদ হয়। লাল এবং নীল উভয় রঙের রক্তই বইছে মানুষের শরীরে।

তবে কারো রক্তের রঙ নীল, কারো বা লাল,— সুদর্শনের এমন সিদ্ধান্ত, প্রিয়ব্রতর মতে, ঠিক নয়। আসলে, প্রতিটি মানুষের শরীরেই লাল ও নীল রক্তের সহাবস্থান। রুদ্র শিকারিকে দেখেছে প্রিয়ব্রত, কালো শিকারিকেও, সিংহগড়ের ডজন ডজন লগদি-পাইকদেরও। নীচু সম্প্রদায়ের মানুষ ওরা সকলেই, নিঃস্ব, পদানত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহগড়ের হুকুমে প্রজা নিপীড়নের কিংবা পরনারী লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে, ওই পদানত মানুষগুলোই কী বিষম পরিমাণে নিষ্ঠুর এবং প্রভুত্বপরায়ণ। অসহায় মানুষের ওপর জুলুম চালানোয় ওরা কী পরিমাণে উৎসাহী ও করিতকর্মা, প্রিয়ব্রতর সামনে তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আসলে প্রত্যেক মানুষই অন্তরে ভোগী ও ক্ষমতালোলুপ। সামান্য অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রতিটি মানুষের শরীরেই বুঝি নীল রক্ত নেচে ওঠে। এমন কি, সম্ভবত, প্রিয়ব্রতও তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রিয়ব্রত কি জীবনে ভোগ করতে চায় নি? আরাম, বিলাস, প্রভুত্ব তারও কি একেবারেই কাম্য ছিল না? তা সত্ত্বেও যে আজীবনকাল এগুলোর থেকে মুখ ফিরিয়ে রইল তার কারণ, সম্ভবত, তার শরীর ও মনের মধ্যে এক কিসিমের জলাতঙ্ক রোগ। জলাতঙ্কের রোগীরা প্রচণ্ড তৃষ্ণা সত্ত্বেও জল খেতে পারে না। তাতে ওদের তৃষ্ণা শতগুণ বেড়ে যায়। প্রবল তৃষ্ণা অথচ জল খেতে পারছে না, এই অবস্থায় জলের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জমে, আক্রোশ। জল থেকে পালাতে চায় সে। প্রিয়ব্রতরও সম্ভবত হয়েছে সেটাই। সিংহগড়ের হাজারো বিলাস-ব্যসন, ক্ষমতা-প্রভুত্বের মধ্যে থেকেও সে এক মুহূর্তের তরেও ভোগ করতে পারে নি তা। এতে করে সিংহগড় এবং তার সবকিছুর প্রতি তিলতিল আক্রোশ জমেছিল বুকে। প্রিয়ব্রত শুনেছে, দাদু সুদর্শন সিংহবাবু তাঁর উপনয়নের সময়ে আমন্ত্রিতদের জন্য রান্না করা মাছ, মাংস এবং তাবৎ আমিষ ব্যঞ্জনে সবার অলক্ষ্যে লবণ ফেলে দিয়েছিলেন। অতিথি অভ্যাগতরা কেউ মুখে তুলতে পারে নি সে সব। সুদর্শন এমনটা করেছিলেন এই কারণেই যে তিনি স্বয়ং ছিলেন উপবাসী এবং পরবর্তী কয়েকদিন ব্রহ্মচারী হিসেবে নিরামিষ চরুভোজী। সেই আক্রোশেই তিনি ভুরিভোজের যাবতীয় খাদ্যকে অখাদ্য করে তুলেছিলেন। যার অর্থ, আমি যা খেতে পেলাম না, কেউই তা পাবে না।

সিংহগড়ের সুখ-ঐশ্বর্য, আভিজাত্যে আর প্রভুত্বের উত্তাপ কি প্রিয়ব্রতকে আকৃষ্ট করত? প্রিয়ব্রতর মনে হয়, করেছে। খুব সংগোপনে সেটা টেরও পেত প্রিয়ব্রত। কিন্তু সেই সুখ-ঐশ্বর্যকে ভোগ করা গেল না তিলেকের তরে। সেই ছেলেবেলা থেকে কোকিলের ছানা-টানা বলে এমন হল্লা তুলল চারপাশের মানুষজন, নিজেকে সিংহগড়ের একজন বলে ভাবতেই পারল না প্রিয়ব্রত। ভোগে তার তিলমাত্র সুখ ছিল না তাই। প্রভুত্বে শ্লাঘাও নয়। ফলত ঐ আক্রোশ, আমি যা ভোগ করতে পারলাম না, কাউকেই তার স্বাদ পেতে দেব না। ঐ টানেই তো সে আকাশ জুড়ে রণভেরী বাজানোর আয়োজন চালিয়ে গেল আজীবনকাল। সিংহগড়ের গাম্ভীর্যকে ভেঙে খানখান করে দিল পদে পদে।

কিন্তু কি লাভ হল তাতে? স্বদেশী আন্দোলন, তেভাগার লড়াই, বিড়ি শ্রমিকদের লড়াই, উদ্বাস্তুদের লড়াই,... জেলার যাবতীয় লড়াই ওর শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। প্রিয়ব্রত সেই স্রোতে ভেসে, সাঁতার কেটে কাটিয়ে দিল তার জীবনের মহার্ঘ সময়গুলি। আজ

মনে হয় খুব এলোমেলো ভেসেছে সেই স্রোতে। তেমন কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না সেই ভেসে যাওয়ায়। কেবলই একটা ক্রোধ। অসহায় ক্রোধ। খাঁচায় ছিল একটা পাখি। আচমকা তার রাগ হল, ঘৃণা জন্মাল, খাঁচাটার প্রতি। নিদারুণ আক্ষেপে খাঁচা ছাড়ল সে। ডানা ঝাপটে ওড়াউড়ি করল যতক্ষণ না অবশ হয়ে আসে। এক সময় সে উপলব্ধি করল, খুব এলোমেলো উড়েছে। কেবলই একটা ঘৃণা, অসহায় ঘৃণা, খাঁচার প্রতি। স্রোতের টানে কেবলই ভেসে গেল, ডুবতে পারল না কিছুতেই। হাওয়াব টানে উড়ে বেড়ালো, ডিম পাড়তে পাবল না কোনও দিনও। ভাসন্ত মানুষ তল পায় না নদীর, উড়ন্ত পাখি ডিম পাড়তে পারে না। এমন অনির্দিষ্ট ভাসাভাসিতে কোনও ক্রোধেব আগুনই নেভে না। এমন অশান্ত ওড়াউড়িতে কোনও ঘৃণার অবসান ঘটে না। কেবল মহার্ঘ সময়টুকু বুঝি তিলতিল ঝরে পড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে। তবুও, ডানা যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে উড়তেই হয়। অতল জলে যাকে নামতে হয়েছে তাকে তো স্রোতের টানে ভাসতেই হয। আজীবন ওড়াই তার নিয়তি। আজীবন ভাসাই তার ভবিতব্য। এর থেকে তার বুঝি এ জীবনে কোনও নিষ্কৃতি নেই।

ক' দিন ধরে মনে হচ্ছিল, আবাব তার ওড়া প্রয়োজন। আবার সময় হয়েছে ভাসবার। সিংহগড় নামক খাঁচাটি তার প্রাণবায়ুর জোগান দিতে অপারগ। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। সম্ভবত কোনও গভীর মতাদর্শগত কারণে নয়, তাকে উড়তে হয়, ভাসতে হয়, সিংহগড় থেকে পালানোর স্বার্থেই। এই উড়তে গিয়ে, ভাসতে গিয়ে, সিংহগড়কে ঘৃণা করতে গিয়ে, শরীরে যদি হাল্কা পলিব মতো কিংবা পাতলা কুয়াশার মতো জমে যায় মতাদর্শ জাতীয় কোনও স্নেহপদার্থ, সেটুকুই এক অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

পরীক্ষিত বাউবি বলে, দুনিয়ার সব প্রাণীরই একটা শক্তি রয়েছে। শুধু জানা দরকার, কার শক্তি কোথায় থাকে। হাতির শক্তি শুঁড়ে, বাঘের শক্তি থাবায়, কুমীরেব শক্তি লেজে, গণ্ডারের শক্তি নাকে, ষাঁড়ের শক্তি শিং-এ, কচ্ছপের শক্তি মুখে, কাঁকড়ার শক্তি দাঁড়ায়.. । প্রিয়ব্রতর শক্তিটা ঠিক কোথায়? প্রিয়ব্রত ঠিক বুঝতে পারে না। কেবল একরাশ ক্রোধ আর ঘৃণা। ক্রোধ আর ঘৃণা কি কোনও শক্তি হতে পারে? সে তো বিষ। শুধু আকণ্ঠ বিষকে সম্বল করে কি কোনও লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে মানুষ! বিষ কি কোনও শক্তি হতে পারে? সাপের মুখে বিষ, কাঁকড়া-বিছের ল্যাজে বিষ, বেড়ালের নখে বিষ, মশার হুলে বিষ... মানুষের বিষ বুঝি চারিয়ে থাকে তার সর্বাঙ্গে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে। পরীক্ষিত শুনে হাসে। বলে, শুধু বিষটাই দেইখলেন আইজ্ঞা? এ দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যে কুথাও না কুথাও মধুও আছে। খুঁজে লিতে হবেক। ফুলের মধু তার বুকে, মৌমাছির মধু মুখে, চিংড়ির মধু মাথায়, দারচিনির মধু ছালে-বাকলে, আর যষ্টিমধুর মধু সর্বাঙ্গে। প্রিয়ব্রতর মধুটা তবে কোথায়? সিংহগড়ে নেই। কনকপ্রভায় নেই। কৈশোরে নেই, যৌবনে নেই। ভেসে বেড়ানোতে নেই, উড়ে বেড়ানোতেও নেই।

তবুও তাকে পুনরায় উড়তে হবে, অনির্দিষ্ট আকাশে। মনটা এখন কেবলই উড়তে চায়। উড়ে উড়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে যেতে চায় ডানাদুটি। প্রিয়ব্রত বুঝি সত্যিই এক পাখি। এক কোকিল পাখি। কোকিল বুঝিই সত্যিই কোথাও বাসা বাঁধতে পারে না। বাসা তার সহ্য হয় না।

৬০. কনকপ্রভা গাইছে

সেই সন্ধ্যায় ফের হ্যাজাক জ্বলল সিংহগড়ের দোতলায়। জলসা বসল।

এবং সেই জলসায়, কি আশ্চর্য, কনকপ্রভার গলা শোনা গেল। গান ধরেছে কনকপ্রভা। পুরবী রাগে গাইছে।

কতদিন বাদে গান গাইল কনকপ্রভা। কতদিন বাদে। প্রিয়ব্রত কান পেতে শোনে কনকপ্রভার গান। শুনতে শুনতে সে রোমাঞ্চিত হতে থাকে। কনকপ্রভার গলায় মীড়ের কাজ, সাত সুরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাকে ক্রমশ মুগ্ধ, আচ্ছন্ন করে দেয়।

সেই মুগ্ধতার কথাটি কনকপ্রভাকে বলতেও ইচ্ছে করে প্রিয়ব্রতর। কনকপ্রভার সুমুখে, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, খুব অকপটে কথাটি বলতে চায়। খুব সাবলীল, আন্তরিকভাবে। কোনও অসূয়া থাকবে না সে বন্দনায়।

কনকের প্রতি কোনও অসূয়া রয়েছে কি প্রিয়ব্রতর মনে? প্রিয়ব্রত তার মর্মের গভীরে আঁতিপাতি সন্ধান চালায়। যেটুকু অসূয়া রয়েছে তা ওপরের স্তরে, কিন্তু একেবারে মর্মমুলের সুগভীর স্তরে, যেখানে দীঘির জলের অতল স্তরের মতো হাওয়ার কাঁপন পৌঁছোয় না, সেখানে কনকপ্রভার জন্য তিলমাত্র অসূয়া জমা নেই প্রিয়ব্রতর। সেখানে, এমন একটি মধুর গান শোনার পর, কনককে একটি সপ্ততার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কনক যেন এক আশ্চর্য বাদ্যযন্ত্র। যার থেকে কোনও অদৃশ্য আঙুলের ছোঁয়ায় ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে সুর।

বাদ্যযন্ত্রের ওপর কি রাগ থাকে মানুষের।

আসলে কনককে তো মনে মনে ভালবাসে প্রিয়ব্রত। তাকে অনুভব করে সঠিক নিরীখে। কনকের এই আপাত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সবটাই তার অস্থির রক্তের ঝনঝন আওয়াজ নয়। অনেক অপ্রাপ্তিজনিত অজস্র ব্যথা হয়ত তাকেও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অহরহ। সেও হয়ত অবিরাম পালাতে চায়, প্রিয়ব্রতর মতোই। মানুষ, পৃথিবীর তাবৎ জীব যে প্রাণপণে পালাতে থাকে, সে তো আত্মরক্ষার তাগিদেই।

সারা সন্ধে চলতে থাকে জলসা। রাত ক্রমশ গভীর হতে থাকে। কনকপ্রভা একের পর এক গাইছে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে প্রিয়ব্রত। গেল রাতের স্বপ্নটা সারাক্ষণ মগজের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। কংসাবতী ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলে বসে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে রাতভর কথা বলেছেন শঙ্করপ্রসাদ। অন্তত পরীক্ষিত বাউরি তেমনটাই তীরের মতো বিঁধিয়ে দিয়ে গেছে প্রিয়ব্রতর মগজে। গোরাবাড়ির নির্মীয়মান জলাধারটিকে নাকি আগাম দেখে ফেলেছে প্রিয়ব্রত। কেন দেখল এমন দৃশ্য, প্রিয়ব্রতর বুকখানি হাহাকারে ভরে যায়, হাজার হাজার মানুষের প্রতিরোধ চলছে যেখানে, প্রিয়ব্রতর স্বপ্নে কেন দেখা দিল তার বিপরীত ছবি।

হরিণমুড়ির দিক থেকে হু-হু করে বয়ে আসছে উদোম হাওয়ার দল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে প্রিয়ব্রতর ঘরে ঢুকে পড়ছে বর্গীর মতো। ওর গায়ের পাতলা চাদরখানিকে বারবার উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

এটাও প্রিয়ব্রতর কাছে অর্থবহ বলে মনে হয়।

প্রিয়ব্রত সরিয়ে দেয় গায়ের চাদর। বিছানায় উঠে বসে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে কপালের রগগুলি। বুকের মধ্যে কফ জমেছে জমাট পাথরের মতো। ফাঁপা কলসির ভেতর থেকে যেন ঠাঁই-ঠাঁই আওয়াজ বেরোচ্ছে কাশির দমকে। দু'হাত দিয়ে মাথার রগ টিপে ধরে বসে থাকে সে। বসে বসে দ্রুত স্থির করে নেয় তার ভবিষ্যত।

বাইরের বারান্দায় পাকা চাতালের ওপর অগ্নি ঘুমিয়ে কাদা। প্রিয়ব্রত বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। টলমল করছে পা। ঐ অবস্থায় সে দ্রুত গুছিয়ে নেয়। একখানি কাপড়ের ব্যাগে ভরে নেয় সামান্য কিছু কাপড়-চোপড়, নিত্য ব্যবহার্য টুকিটাকি...। জ্বলন্ত লণ্ঠনখানি তুলে ধরে আয়নায় শেষ বারের মতো দেখে নেয় নিজের মুখ। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। ঘুমন্ত অগ্নির পাশ দিয়ে নিঃশব্দে পেরিয়ে যায় বারান্দা। অন্দর মহলের ঘেরা উঠোনের মধ্যিখানে পৌঁছে ক্ষণেকের তরে থমকে দাঁড়ায়। দোতলায় হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলো। কনকপ্রভা আলাপ সেরে বিস্তারে পৌঁছেছে। তার গলার মিহি সুর, রেণু রেণু হয়ে মিশে যাচ্ছে নৈশ বাতাসের শরীরে। নওলকিশোরের তবলায় বোল উঠেছে তুখোড়। বেহালায় রমনীয় ছড় টানছে পান্নালাল। কনকপ্রভা গাইছে।

হয়ত বা এই গভীর রাতে, এতক্ষণ অবধি জেগে নেই কুন্তী। শোবার ঘরে, নয়ত বা জলসার আসরের এককোণেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে সে। প্রিয়ব্রত মাঝ উঠোনে দাড়িয়ে দ্রুত এঁকে নেয় কুন্তীর ঘুমন্ত মুখের ছবিখানি।

উঠোনে দাঁড়িয়েই থাকে প্রিয়ব্রত স্তব্ধ পাথরের মতো। সিংহগড়ের রহস্যময় গন্ধ তাকে জড়িয়ে ধরে একান্তে। এক সময় পিছু ফেরে সে। নিঃশব্দে পেরিয়ে যায় ভেতর-উঠোন। সন্তর্পণে দরজার খিল খোলে। তাও যেটুকু ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয়, তা নিঃশেষে চাপা পড়ে যায় জলসার উতরোল শব্দে। কনকপ্রভা গাইছে।

গভীররাতে টলমল পায়ে নিঃশব্দে সিংহগড় ছাড়ে প্রিয়ব্রত। গোরাবাড়ি তাকে ডাকছে, কংসাবতী তাকে ডাকছে, একজোড়া নদীর সঙ্গমস্থলে পাহাড় ঘেরা বিস্তীর্ণ ধ্বস্তপ্রায় জনপদ তাকে অবিরাম অকরুণ হাতে টানছে। গেল রাতের বিফল স্বপ্নটিকে মুছে ফেলবার তাগিদে এবং আগামী রাতের একটি সফল স্বপ্নের তাড়নায় সে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে নৈশ বাতাসকে ছিন্নভিন্ন করে। পেছনে ধেয়ে আসে গানের কলি, তবলার বোল, বেহালার রোদন...।

কনকপ্রভা গাইছে।

— ০ —